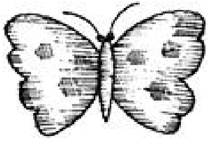
সমরেশ বসু

প্রজাপতি



প্রজাপতি



সমরেশ বসু

আনন্দ

আনন্দ প্রকাশনা

প্রকাশক
সিতাংশুকুমার দাশগুপ্ত

প্রকাশকাল
১৯৬৭ (শারদীয় দেশ ১৩৭৪)

প্রচ্ছদ
সুনীল শীল

---না, আমি একটা কথা জানতে চাই, রাজনীতির দল না-হয় একটা মন্দিরের মত—যেমন কেষ্ট বা বিষ্টু বা কালী, দুর্গা, যা হোক, আর লোকেরা তো তাদেরই চায়—মানে দেবতাকে—মানে আসল পাওয়া যেটা, কিন্তু পূজারীগুলো যেমন ভাব দেখায়, দেবতারা সব ওদের হাত-ধরা, ওদের চাল-কলা দিতে হবে, ওরা ঘণ্টা নাড়লেই ঠাকুর চোখ মেলে তাকাবে, তা-ই ওদের পুষতে হবে, ওদের কথা শুনতে হবে—অথাৎ দেবতা মানেই সসলা গজুরাম হরেরাম পূজারী। সে-ই সব। এইসব পূর্ণেন্দু, কেশবরাও তা-ই যেন। যেমন পূজারীই মন্দিরের মালিক, সে-ই সব পাইয়ে দেয়, এ খচ্চরগুলোও সেই রকম, ওরাই যেন দলের সব। পূজারীর মন্দিরের মত দলটাও ওদের দখলে, ওরা যেমন মন্দির চালাবে, তেমনি চলবে। স্‌সাহ্‌, গোপালঠাকুর!

আবেদন

নুক্‌, কিন্ডেল, কবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে) ইত্যাদি প্রথম দিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

সমরেশ বসুর প্রজাপতি

শারদীয় দেশ (১৯৬৭) প্রকাশিত হবার পরেই অশ্লীলতার দায়ে নিম্ন ও উচ্চ আদালতে অভিযুক্ত হয়ে, সতেরো বছর পর সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে ১৯৮৫ সনে মুক্ত।

আমার কথা

বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে, আমি আমার কোনো উপন্যাসেরই ভূমিকা লিখিনে। 'প্রজাপতি' যখন প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল, তখনও ভূমিকা লেখার প্রয়োজন মনে করিনি। এবারও যে খুব একটা প্রয়োজনের তাগিদে ভূমিকা লিখছি, তা না। বস্তুতপক্ষে এটিকে "ভূমিকা" বলা চলে কিনা, সে-বিষয়েও আমি মন স্থির করে উঠতে পারছিনে।

'প্রজাপতি' অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিল, এবং দীর্ঘকাল বাদে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে, সম্প্রতি অশ্লীলতার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়েছে, বাঙালী অবাঙালী সংবাদপত্র পাঠক মাত্রেই তা অবহিত আছেন।

কুসংস্কার বা যা-ই ভাবা হোক, আমাদের দেশে, সমাজে ও পরিবারে এখনও একটি ধারণা আছে, কোনো মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ার মানেই হল, জীবনে ও সংসারে একটি অশুভ ঘটনা। আমি এ ধারণা থেকে মুক্ত নই। বিশেষ সেই মামলায় যদি আবার নিজের ভূমিকা হয়, ফৌজদারী ভাষায় যাকে বলে আসামি। ধারণাটির মুকুরে মানুষের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতাই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। মামলা লড়তে গিয়ে, বহু ধনপতির গৃহেও ঘুঘু চরেছে, ভিটে মাটি চাটি হয়ে, সর্বস্বান্ত হতে হয়েছে। অতীত ও বর্তমানের আবালবৃদ্ধবনিতা তা জানেন। অতএব, প্রথম যখন শুনেছিলাম, 'প্রজাপতি' উপন্যাসের জন্য আমাকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে, স্বভাবতঃই আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম মামলা মানেই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। লেখাই আমার একমাত্র জীবিকা। বাঙালী মাত্রেই অনুমান করতে পারেন, এই জীবিকা অবলম্বন করে, সংসারযাত্রা নির্বাহ করা কতো কঠিন। তার ওপরে যদি মামলা কাঁধে চাপে, তা হয়ে ওঠে একটি গভীর উদ্বেগের কারণ। আমার সেই উদ্বেগের কথা, 'দেশ' পত্রিকার তৎকালীন সহযোগী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষকে না জানিয়ে পারিনি।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরে, এ বিষয়ে আমার যা বলার ছিল, তা পত্রিকা মারফৎ বলেছি। তবু, আর একবার বিষয়টি সংক্ষেপে উল্লেখ করে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছিনে। এ কৃতজ্ঞতা, বিশেষ করে, তৎকালীন 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক, অকালে প্রয়াত অশোককুমার সরকারের প্রতি। তার সঙ্গে মামলা ও আমার উদ্বেগের বিষয়ে কথা হয়েছিল, শ্রীসাগরময় ঘোষের (সাগরদা)। জবাবে স্বর্গীয় সরকার মহাশয়ের মূল কথা ছিল তিনটি।

১। লেখককে আমরা লিখতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি, তিনি লিখেছেন।

২। আমরা সেই লেখা ছেপেছি।

৩। এখন সেই লেখা যখন অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে, তখন তার যাবতীয় দায় দায়িত্ব আমাদেরই।

পাঠক মাত্রেই অনুমান করতে পারেন, এ কথাগুলো শোনার পরে, আমার মনে কী প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে। কিন্তু আমি তার পুনরুল্লেখ করে, আজ আর সেই প্রতিক্রিয়ার স্বস্তি ও শান্তি তেমন অনুভব করতে পারছিনে। সুপ্রিম কোর্ট অবধি যাবার সিদ্ধান্ত ছিল অশোককুমার সরকার মহাশয়ের। কেন, সে-কথায় পরে আসছি। আপাততঃ অনিবার্যভাবেই আমার মনে হচ্ছে, তিনি বেঁচে থাকতে যদি এই রায়ের কথা শুনে যেতেন, তাঁর সিদ্ধান্তের জয়ে তিনিও নিশ্চয় সুখী হতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে বঞ্চনাই আমাদের ভাগ্যে জুটলো।

অশোকবাবু কেন সুপ্রিম কোর্ট অবধি যেতে চেয়েছিলেন? ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধে তার আভাস ছিল। তিনি কেবল মাত্র একটি মামলা যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে যাননি। চেয়েছিলেন, সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর, সাহিত্যে অশ্লীলতার বৃটিশ আইনের বিষয়টি যাতে কেন্দ্রীয় সরকার, আইনজ্ঞ, বুদ্ধিজীবী ও লোকসভার প্রতিনিধিদের পর্যবেক্ষণ ও আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। ভারতীয় চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণার পক্ষে সেই আইনটির সঙ্গত অস্তিত্ব আর প্রয়োজন আছে কিনা, সুধীগণ তা ভেবে দেখবেন। কিন্তু রায় 'প্রজাপতি'-এর পক্ষে এলেও, অশোকবাবু যা চেয়েছিলেন, তা ঘটলো না। তবে এ প্রশ্ন তোলার সময় নিশ্চয় এসেছে, আইনটি নিয়ে নতুন করে ভাবনা

চিন্তার সময় কি আসেনি?

আমি জানি, বহু বিদগ্ধ সাহিত্য রসিক ব্যক্তিগণ, আইনের দ্বারা সাহিত্যের শ্লীলতা অশ্লীলতার বিচারের বিষয়টিকে আদৌ মূল্য দিতে চান না। মানতেও চান না, আইন দিয়ে সাহিত্যের শ্লীলতা অশ্লীলতার বিচার চলতে পারে। এটি অনেকের কাছে বিতর্কিত বিষয় মনে হতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, গ্রীসের সেই কোনও দূর অতীতকালের যা আমাদের সংহতি যুগের পরবর্তী পুরাণের কালে নারীর সতীত্ব যাচাইয়ের মতোই, সাহিত্য শিল্পের বিষয়ে শ্লীলতা-অশ্লীলতার বিতর্কও বহুকালের। আজিও এর মীমাংসা হয়নি। দেশ কাল জাতি ভেদে, এ বিতর্ক সহজে মিটবে বলেও মনে হয় না।

সম্ভবতঃ পাঠকের রুচি, শিক্ষা, পরিবেশের বিভিন্নতাই, সাহিত্যের শ্লীলতা অশ্লীলতার বিচারের ও দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতাও নির্ভর করে। আইনের ভূমিকা যদি কেউ অগ্রাহ্য করতে চান, পাঠক সমাজের এ ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করা যাবে না। সেই কারণেই বিতর্ক চলতেই থাকবে। কারণ আমার বিশ্বাস লেখকরা তাঁদের লেখার বিষয়বস্তু ও তার শিল্পরীতি সম্পর্কে নিরন্তর নতুন পথের সন্ধানে থাকবেন। তবুও রাষ্ট্র তার অধিকার ছাড়বে না। কোনো না কেনো আইন দিয়ে, সাহিত্য শাসনের ব্যবস্থা বলবৎ রাখবে। এবং এই সূত্রেই, পৃথিবীর মানুষের মনে এখনও প্রশ্ন জাগতে পারে, ইংল্যাণ্ডে 'লেডি চ্যাটার্লির প্রেমিক' উপন্যাসটির ওপর থেকে অশ্লীলতার অভিযোগ নেওয়া সত্ত্বেও ইংল্যান্ডবাসী পাঠক সকলেই কি আইনের রায় মন থেকে মেনে নিয়েছেন?

আমাদের ভারতে, সাহিত্যে অশ্লীলতার যে-আইন বর্তমান আছে সেই আইন মোতাবেক কোনো সাক্ষীই অভিযুক্ত সাহিত্যকর্মের পক্ষে কোনো ধর্মীয় পুস্তকের তুলনা দেবার অধিকারী নন। রামায়ণ, মহাভারত, গীতগোবিন্দ বা বৈষ্ণব পদাবলী ইত্যাদির কোনো অংশ তুলেই আত্মপক্ষ সমর্থন করা নিষেধ, কিন্তু কবি কালিদাস থেকে শুরু করে, বহু কবির রচনা ধর্মীয় পুস্তক নয়। কেউ যদি মনে করেন, সেই সব কাব্যের কথা তুলে আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন, বিচারক তাঁর বিচার অনুযায়ী তা তৎক্ষণাৎ বাতিল করে দিতে পারেন। কারণ, আমাদের এই আইনটিতে তিনিই সর্বেসর্বা। জুরিগণের উপস্থিতির কোনো প্রশ্ন নেই।

যাই হোক, আইন চলুক তার পথে। পাঠক চলুক তাঁর মতে। 'প্রজাগতি' উপন্যাস লেখার সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমি বিশ্বাস করি, 'প্রজাপতি -এর অতীত ও এযুগের নতুন পাঠকবর্গ বিশ্বাস করবেন। উপন্যাসের নায়ক সুখেন বা অন্যান্য নারী পুরুষ চরিত্রগুলো সমাজে ভূঁইফোড়ের মতো গজিয়ে ওঠেনি। সমস্ত চরিত্রই আমাদের সমাজের সৃষ্ট। এতে যদি আমার কোনো অংশ থেকে থাকে, আমি কী করেই বা একজন লেখক হিসাবে নিশ্চিন্তে বসে থাকবো? আমার মন যদি পীড়িত হয়, তখন আমি লেখা ছাড়া নিরুপায় বোধ করি।

তখনই প্রশ্ন উঠবে, উপন্যাসটির রচনাভঙ্গি ও তার কিছু ভাষা নিয়ে।

আমি প্রায় বাইশ তেইশ কি আরও দু-এক বছর বেশি হতে পারে, 'পরিচয়' মাসিক পত্রিকায়, স্বর্গত শ্রদ্ধের নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি গল্প পড়েছিলাম। গল্পটির বিষয়বস্তু ছিল, কোনো মন্ত্রীর পোষা একজন সমাজবিরোধী গুন্ডা, উত্তমপুরুষে, মন্ত্রীকে সম্বোধন করে অনেক অভিযোগ জানাচ্ছে। 'স্যারকে' অথাৎ মন্ত্রীকে তার বক্তব্য, মন্ত্রী মশায়ের প্রয়োজনে ও স্বার্থে সে কতো অন্যায় ও পাপ করেছে। কতো লোকের প্রতি কতো অবিচার করেছে। কিন্তু প্রতিদানে সে কী পেয়েছে? এবং মন্ত্রী লোকটি যে আসলে একজন প্রতিক্রিয়াশীল খারাপ চরিত্রের লোক, আর সেই লোকের কথায় সে যে মানুষের প্রতি অন্যায় করেছে, এবং এখন থেকে সে বিপরীত পথেই চলবে, গল্পটির মোটামুটি বক্তব্য ছিল এইরকম। অন্ততঃ আমার যতোদূর মনে আছে। তাই ব্যক্ত করলাম।

গল্পটি পড়ে, সেই সময়ে খুব ভালো লেগেছিল। তারপরে আমি যখন 'প্রজাপতি' লিখলাম, তখন পরিবেশ অনেক বদলে গিয়েছে। এবং লিখতে গিয়ে, প্রথমেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই গল্পটির কথা আমার মনে পড়েছিল। তখনই মনে হয়েছিল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সৃষ্ট সমাজবিরোধী গুন্ডাটি, আদ্যন্ত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

ভাষাতেই তার কথাগুলো বলেছিল। এবং আমার কাছে মনে হয়েছিল, ওটা অস্বাভাবিক। অনেককালের পুরনো স্মৃতিও আমার মানসপটে ভেসে উঠেছিল। তা হল, কালীপ্রসন্ন সিংহের, হুতোম প্যাঁচার নকশা।' ভাষা ও রচনারীতি বিষয়বস্তুর 'অনুগামী হওয়া উচিত, এই যুক্তি আমার মনে এসেছিল। বিশেষতঃ, যে-ব্যক্তি উত্তমপুরুষে আত্মকথা বলে, সেই ব্যক্তিকে তার বাস্তব রূপ দিতে গেলে, তার মুখের ভাষা, চিন্তার ভাষা, আচার আচরণকে একেবারে ত্যাগই বা কী করে করা যায়? অবশ্যি একথাও স্বীকার্য, বাঙলা সাহিত্যে সেটা ছিল আমার একটা নতুন একসপেরিমেন্টেরও বিষয়। যার ফলে, অপবিত্রতার গন্ধে কেউ কেউ রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠেছিলেন।

কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় জমা জঞ্চালের দুর্গন্ধে যদি কেউ উত্যক্ত হোন, তাঁর তো পৌরসভার মেয়রের কাছেই নালিশ নিয়ে যাওয়া উচিত, তাই না? না কি, তিনি সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফার বা প্রতিবেদককে আক্রমণ করবেন, ঐ জমা জঞ্জালের কথা লেখা ও ফটো প্রদানের জন্য? (বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিকের একটি মন্তব্যকে স্মরণ করেই, এই তুলনাটি মনে এলো।)

আমি সুখেনের স্রষ্টা নই। পাঠকরাও চিন্তাশীল অনুসন্ধিৎসু মানুষ। সুখেনের স্রষ্টাদের আপনারা নিশ্চয়ই চিনে নেবেন। আমি সুখেনের অন্যতর এক সত্তার সন্ধানী মাত্র। যে-সত্তার মধ্যে ছিল প্রেম ও উত্তরণের আর্তি !

সমরেশ বসু
২-১১-৮৫

প্রকাশকের নিবেদন

নিম্ন আদালত 'অশ্লীল' বলে রায় দিলেন, উচ্চ আদালতেও সেই রায় বহাল রইল। অবশেষে সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি' গেল সর্বোচ্চ আদালতের দরবারে। আঠারো বছর ধরে নিষিদ্ধ 'প্রজাপতি' অবশেষে মুক্ত হলে এই সেদিন, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে।

বিদেশের যে-সব গ্রন্থ ঘিরে একদা এইরকমই উঠেছিল সুনীতি-দুর্নীতির তুমুল ঝড়, তার অনেকগুলিই পরবর্তী কালে পেয়েছে সসম্মান স্বীকৃতি। আদালতের রায়ে যেমন পাঠকের মনেও তেমনই— সসমাদর পুনবার্সন। 'প্রজাপতি'ও আজ সেইসব ঐতিহাসিক গ্রন্থের পাশে স্থান করে নিল। ভারতবর্ষে কোনও একটি উপন্যাস নিয়ে এ জাতীয় আলোড়ন এর আগে ওঠেনি।

এই আঠারো বছরে পাঠকের মনে ‘প্রজাপতি' নিয়ে জেগেছে নিরন্তর কৌতূহল। প্রকাশক হিসেবে আমাদের কাছে অনেকে এসেছেন। শুধু বইটি কেমন একবার চোখে দেখবেন, কেন এই অভিযোগ একবার তা যাচাই করে দেখবেন। আমরা তাঁদের ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি।

আজ ‘প্রজাপতি' সসম্মানে অভিযোগ-মুক্ত। নতুন করে পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা গৌরবান্বিত।

মূল গ্রন্থটি তো ছাপা হলই, সেইসঙ্গে এই সংস্করণে যোগ করা হল আদালতের বিচার, বুদ্ধদেব বসু ও নরেশ গুহর মতো কবি-সাহিত্যিকের ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের বিবরণ ও সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বয়ান। সর্বোপরি লেখকের নিজস্ব একটি নতুন ভূমিকা।

'প্রজাপতি' ও তার যাবতীয় বিচার-বিতর্ককে কেন্দ্র করে চিরকালীন পাঠকের কৌতূহল এর ফলে যদি সামান্যও তৃপ্ত হয়, তাহলেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থক হবে।

'মেরো না, পায়ে পড়ি—।'

'মারব না। সা— ! - - 'তবে রুমালটা দিয়ে ওরকম ঝাপ্‌টা মারছ কেন। মরে যাবে যে।'

'আরে না, মরবে না। ওকে পেড়ে ফেলব শুধু। আয়, আয়, সা—।'

'আহ্, উহ্, ইস্ ! গেল, গেল এবার। এত সুন্দর প্রজাপতিটা.....।'

'হ্যাঁ, পাশের বাড়ির চিনু যে রকম কালো বোম্বাই প্রিন্ট শাড়িটা পরে, ঠিক'

'তোমার মাথা! কী রকম চক্‌চক্ করছে দেখছ, বেনারসী সিল্ক নীলাম্বরী হলে যেরকম হয়, ঠিক সেরকম রঙ। তার ওপরে রুপোলী ছাপের বুটি। কী সুন্দর। দোহাই –।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার সেই রুপোলী বুটি বেনারসী নীলাম্বরীটার মত, তাই না? কে যেন প্রেজেন্ট করেছিল?"

'দাদা। কিন্তু—।'

'কোন্ দাদা? আহ্, এইবার।'

'ইস্, গেল গেল !'

'যাত্তেরি, কেটে পড়ল। কোন্ দাদা, বললে না?'

'কোন্ দাদা আবার, যে-দুই দাদা আছে।'

'ওরা তো, মায়ের পেটের বোনটিকে বেনারসী সিল্ক কিনে দেয় না। ওরা তো লাফাঙ্গা'

'সেটা আবার কী!'

'যার ফেমিনিন জেণ্ডার লাফাঙ্গী। হেই সা—!'

'তার মানে কী?'

'যাদের বাটপাড়ের ভয় নেই।'

'তার মানে, ল্যাঙটা?'

'নটি আমার ! বুঝতে পেরেছ দেখছি। হুই সা—।'

'অসভ্য ! আচ্ছা, দাদাদের তুমি ওরকম বল কেন।'

'বলি— '

'আহ্ ইস্, মরেছে?'

'নাঃ পারিনি। প্রজাপতিটা খচ্চর আছে, ওই কড়িকাঠের কাছে উঠে গেছে। তোমার সেই শাড়িটার দাম বেশী, তাই বলছিলাম। কে দিয়েছে, বললে না? তোমার কেশবদা নাকি?'

'যাঃ।'

'তবে, ঘুরঘুরে পাকা, সেই র্যাশন ইনস্পেকটরটা, তোমার অনিলদা?'

'কী যে যা তা বল-না, ওরা দেবে কেন। কিন্তু ও কি, ও কি করছ?'

'কী করছি।'

'পালকের ঝাড়নটা নিলে কেন?'

'তা নইলে ওটাকে কাবু করতে পারছি না।'

'ছেড়ে দাও না, আহ্ ! কী বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'কেন?'

'তোমার চোখগুলো টকটকে লাল হয়ে উঠেছে, খুনীর মত।'

'তা হবে। এই, এই, মার্ স্ সা -।'

'আহ্—উহ !'

'তবু হল না।'

'তুমি ঘেমে উঠেছ।'

'তা উঠেছি।'

'তার উপরে তোমার ওই দোনলা পাইপ প্যাণ্ট—!'

'স্‌লা একে কাপটি, তায় এখন ঘামে জেবড়ে গেছে। যেন পা টেনে ধরছে মাইরি।'

'ব্লাউজের মত বিচ্ছিরি সার্টটাও তো গায়ে লেপটে গেছে। এবার ক্ষান্ত দাও না।'

'দেবো, ধরি আগে। প্রজাপতিটা মদ্দা না মাদী বল তো? '

'তা আবার বোঝা যায় নাকি। আহা, বেশ হয়েছে এবার, কড়িকাঠে গিয়ে চুপ করে বসে আছে।'

'বসাচ্ছি। এটার ভাব দেখেই বোঝা যাচ্ছে, মাদী। জব্বর খাটাচ্ছে। খুব হাততালি দিচ্ছ, না?'

'দেবই তো—কিন্তু ও কি, ও কি করছ সুখেনদা।'

'দেশলাই ছুঁড়ে মারছি। ওড়াবো ওকে, তবে—এইবার! উড়েছে। আয় আয়...।'

'আহ্‌ কী করছ, দিদি জামাইবাবুর বিয়ের ছবিটা দেয়াল থেকে পড়ে যাবে যে।'

'পড়বে না। তাছাড়া তোমার দিদি জামাইবাবুর তো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। কিন্তু এটা নির্ঘাত মাদী, দেখছ, লাল লাল ফুটকিও রয়েছে।'

'তোমার মুণ্ডু। ওটা মোটেই লাল না, মেজেণ্টা। কিন্তু ছবিটা তুমি ঠিক ভাঙবে।'

'না। আহ্‌ এবার, স্‌সা ঝেড়েছি কিন্তু—!'

'ইস্‌, ছি, কী করলে বল তো। একদিকের পুরো পালকটা খসিয়ে দিলে?'

'কী করব, ওর ফরফরানির জন্যেই তো। কিন্তু দেখেছ্‌, একটা পালকেই এখনো ওড়বার চেষ্টা করছে!'

'ছি ছি, তুমি জান প্রজাপতি মারতে নেই!'

'কী হয়?'

'ওরা বিয়ের দেবতা না?'

'সেই যে নেমন্তন্নর চিঠিতে লেখা থাকে, প্রজাপতয়ে নমঃ।'

শিখা কোন জবাব দিল না। এক ডানা ভাঙা প্রজাপতিটা তখন দেওয়াল ঘেঁষটে নিচে পড়ছে। শিখার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। ও তখন আমার দিকেই চেয়ে রয়েছে। ঠোঁট দুটো ফোলানো, যেমন রাগ বা অভিমান করলে হয়। চোখের চাউনিও সেই রকম, একটু বাঁক খাওয়া। কালো তারা দুটো যেন একটু বেঁকে গেছে। আর সকালবেলাই কাজল পরেছে। ঠিক মনে হয়, সিনেমা সিনেমা। ভাল লাগে বেশ দেখতে।

কিন্তু আবার মনে হয়, এটা সত্যি না। সত্যি কি প্রজাপতিটার জন্যে ওর কষ্ট হচ্ছে। মনে হয় না। মনে হয়, ও যেন দেয়লা করছে। সিনেমা সিনেমা ভাব। এতক্ষণ বলে বলে, এইরকম করতে হয়। অথচ ওকে দেখে মনে হচ্ছে, প্রজাপতিটাকে বাঁচাবার জন্যে ও-ও লড়ছিল। সেই রকমই কি মনে হচ্ছে না, ওর গোলাপী আঁচল খসা দেখে। চুলের আলগা খোঁপা খুলে পড়েছে। আর ডোরা কাটা কাটা ব্লাউজটা তো দারুণ—ভাবলেই নিজের হাতটা চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে।

খেতে হবে না। দু' হাত পাইপ প্যাণ্টুলের পকেটেই পুরে দিই। কিন্তু, সত্যি, ওর ব্লাউজের নীল, লাল, হলদে রঙের ডোরাগুলো কাঁধের কাছ থেকে নামতে নামতে এমন ঠেলে উঠেছে, অদ্ভুত! আর কেমন, উঠেছে যেন ঢেউ দিয়ে, নেমেছে গোল হয়ে। বুকের দু' দিকের কোন দিকেই কাপড় নেই। বোতাম পাটিতে বোতাম নেই, ঠিক উচ্চিংড়ের মত দুটো সেপটিপিন লাগানো। যেন চেয়ে আছে। গোটা আঁচলটা বাঁ হাতের ওপরে। ব্লাউজের নিচে ও আর কিছু পরেনি। পরলে ঠিক বোঝা যেত। আর ওগুলো পরলেই আসল জিনিস সব এমন ঠাস বুনোট খোঁচা পাথরের মতন লাগে—বিচ্ছিরি!

তবে এটাও ঠিক, শিখার আছে। এদিক ওদিক করে যা-ই খাক, শরীরটা বেশ ভাল আছে। ওকে দেখলে কেন জানি না, ভোরবেলার তাজা শিশির পড়া কপি পাতার মতন লাগে। ঠিক সেই রকম ডাঁটো, একটু একটু পাউডার লাগানো, আর নরম। ওরকম পাতার চচ্চড়ি যে খেয়েছে, সে-ই জানে কেমন লাগে। একটুও ছিবড়ে হয় না, সবটুকু খেয়ে ফেলা

যায়।

ওকে সেই রকম লাগছে। আরো লাগছে এখন জামাটা পরেছে বলেই। ডোরাকাটা জামাটার কেমন টলটলে আলগা আলগা ভাব—ভাবলে মনে হয় হাতের মাথা খেয়ে ফেলি। কেননা, বোঁটা ছেঁড়া বেল কুঁড়ির কথাও মনে পড়ছে। কিন্তু ও এত এলোমেলো হয়ে পড়েছে, জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে আর ঘেমে উঠেছে, যেন প্রজাপতিটাকে বাঁচাবার জন্যে ও-ও লড়ছিল।

পকেটে হাত দুটো থাবড়ে থাবড়ে, গোড়ালির নালি দিয়ে একটু হাওয়া ঢোকাতে চাইলাম। উরে স্‌সা—কী গরম লাগছে। একটা প্রজাপতি ধরতে হাঁপিয়ে গিয়েছি।

শিখা দেওয়ালের কাছে সরে গিয়ে, ডানা ভাঙা প্রজাপতিটাকে দুই আঙুলে তুলে নিল। আর একটু দূর থেকে ভাঙা ডানাটা কুড়িয়ে আনল। কীরে বাবা, প্রজাপতিটার কি মরণ নেই! শরীরের সংগে লাগানো ডানাটা এখনো নাড়িয়ে চলছে। উড়তে চায় নাকি। কোথায় যেতে চায়, বিয়ে করতে? তা তো না, প্রজাপতি হল—কী যেন বলে, এই স্‌সা-প্রজাপতি-প্রজাপতি—হ্যাঁ "প্রজাপতির সনির্বন্ধে" বলে। কী তার অর্থ, কে জানে। মোটের ওপর প্রজাপতি বিয়ে দেয়। তাহলে বিয়ে দিতে যেতে চায় বোধ হয়।

কিন্তু না, আমি ওটাকে সত্যি মারতে চাইনি। ধরতে চেয়েছিলাম! ধরে গিয়ে মারলাম—মারলাম মানে, নিজেই মরলো। এত ফরফর করবার কী ছিল, ছেউটি ছুঁড়ির মত। যেন গায়ে হাত দিতে গেলেই সুড়সুড়ি লেগে যায়, কাতুকুতু লাগে, আর এঁকেবেঁকে ছটফটিয়ে মরে। তখন কোথায় লাগতে কোথায় লাগে, পাঁজরায় না বুকে। তারপরে নাও, 'উহ্ সুখেনদা, নিশ্বাস ফেলতে পারছি না, কী রকম লাগিয়ে দিলে।' স্‌সা—যত্তো ঝামেলা। সেই যেমন হল একবার, পিকনিকে যাওয়া হল, এখানকারই একটা কারখানা স্টাফের সঙ্গে। কারখানার স্টাফ মানে, মজুর বা কেরানী না, সব বিলকুল সাহেব, সবাই ইংরেজীতে—ইংরেজীতে না, স্‌সা ইনরিজিতে কথা বলে, 'বাউ' মারে, রপোট কত! থাকে সব কোম্পানীর পাঁচিল ঘেরা কোয়ার্টারের মধ্যে। রঙীন মোজাইক টাইলস্‌-এর মেঝে, প্লাস্টিক পেইণ্ট দেয়াল। সব মাথা-ভারি পোস্টের লোক থাকে সেখানে, তারা সবাই সাহেব, বউয়েরা মেমসাব, মেয়েরা মিসিবাবা, ছেলেরা সব বাবা। সব বাঙালীর বাঙ্ আর ইংরেজের রেজ—যাকে বলে বাঙ্‌রেজ।

আমাকে কি আর ওদের পিকনিকে নিয়ে যাবার কথা। না কি, কোয়ার্টারে গিয়ে যে মাঝে মধ্যে দিলালি করে আসি, তা ওদের খুব ভাল লাগে। মোটেই না। দাঁতে দাঁত চিবিয়ে মরে, তার নামই হাসি। চোখের নজর দেখলেই বোঝা যায়, মনে মনে কী গালাগাল দেয়। এত খারাপ যে, আমিও বোধহয় লজ্জা পেয়ে যাব। তবু আমাকে খাতির করতে হয়। আমার নাম সুখেন, সুখেন্দু—সুখ যুক্ত ইন্দু, স্‌সুখেন্দু—বাপের নাম ভুলে যাবে সব, এমন না শুনলে। এর পরে কেউ বলবে না, আমি ব্যাকরণ জানি না। আমি সুখচাঁদ। অবিশ্যি সবাই বলে সুখেন গুণ্ডা। সামনে না, আড়ালে। জানে সবাই। কারখানার স্টাফ, ম্যানেজার বল, লেবার এ্যাটভাইসার বল, সিকিউরিটি অফিসার বল, তারাও তা-ই জানে। আর সেইজন্যেই খাতির করে। তবে কিনা, আমি তো আসলে ভদ্দর লোকেরই ছেলে, সেইজন্যে একেবার গুণ্ডার মত দেখে না। তেতোর ওপরে একটু মিঠে পলেস্তরা, যেন সামাজিক মেলামেশা।

তা তো দেখাতেই হবে। আমার না হয় ঢাক ঢাক গুর গুর নেই, দু' কান কাটা। ওদের তো আর তা না। এই শহরের একটা গুণ্ডার সঙ্গে ওরা কি করে মেলামেশা করবে। ওরা যেন জানেই না, আমি কে, আমি কী। ভাবখানা, এমনি একটা তাজা প্রাণের দুঃসাহসী যুবক। এ ডেয়ার ডেভিল নাইস্ ইয়ংম্যান। একথা বলে আবার চোপরা, কারখানার ম্যানেজার। লেবার এ্যাডভাইসার মিত্তিরও বলে। স্‌সালা, এখন হাসি পায়, রাম খিস্তি করতে ইচ্ছা করে। তার ওপরে আবার যখন দেখি, ওদের বউয়েরাও ওরকম বলে। তোদের কত্তারা বলে, তার না হয় কারণ আছে। তোরা কেন বলিস। কুটকুটুনি, না? সত্যি, দেখলে মেয়েলোক বলতে ইচ্ছা করে না, মাগী বলতে ইচ্ছা করে। আর মনে হয়, মাগীগুলোর কস্মিনকালে গা ঘামে না, গায়ে

পোকা। খাওয়া আছে, খাটুনি নেই। নরম নরম বিছানায় খালি থলথলিয়ে চিত্তির দিয়ে পড়ে থাকা।

তাছাড়া খাটাবে বা কে, সে রকম পুরুষই বা কে আছে। চোপরা বল, মিত্তির বল, ওরা তো আর মানুষ নেই। ওরা কেবল ম্যানেজার আর লেবার এ্যাডভাইসার। ওতে মেয়েমানুষ ম্যানেজ করা যায় না, লেবার করানোও যায় না। তা-ই দেখ গিয়ে, মেমসাবেরা শেদে যাওয়া চুলে কালো রঙ মেখে, বুক থেকে কপাল অবধি রঙ পালিশ দিয়ে, কাতলা মাছের পেটিওয়ালা বুক, নিজের মেয়েটির মত বানিয়ে, খাই-খাই করে বেড়াচ্ছে। 'হ্যালো সুখেন' 'ও সুখেন'—যেন সুখেন ছাড়া প্রাণ বাঁচে না। সুখেন তোমাদের পীরিতের ইয়ে। ঠিক সময়ে বিয়োলে সুখেনের থেকে বড় ছেলে তোমার হত, সে খেয়াল নেই। চোপড়ার বউটা আবার বলে, আমি নাকি 'হ্যাণ্ডসাম'। মিত্তিরের বউটা গায়ে আঙুল টিপে বলে, 'তোমার শরীরটা সাংঘাতিক শক্ত, গড়নটাও সুন্দর।' আরে, ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারের বউটা পর্যন্ত, যার চুল দাঁত কিছুই বোধ হয় আসল না, চোখ ঘুরিয়ে বলে, 'তোমার চুলগুলো সুন্দর কোঁচকানো, হিরোদের মত।' স্‌সা—! তোরা কেন, ওসব বলবে তোদের মেয়েরা। তবে জানি, মায়েরা যা বলে মেয়েরা মনে মনে তা-ই গুন গুন করে, চোখে মুখে সান্‌ সান্‌ মারে।

আসলে ওদের কত্তারা তো ভাবে, আমি একটা কাঁচা-খেকো হাউণ্ড। তারই নাম ডেয়ার ডেভিল নাইস ইয়ংম্যান। জানে, এই গোটা মফস্বল টাউনটা, আমার হাতের কবজায়। দরকার হলে, এক কথায় আগুন লাগিয়ে দিতে পারি। রক্তে ভাসিয়ে দিতে পারি। তা-ই ভয়ে ভক্তি, ভরসাও। একটু হাতে-টাতে রাখতে চায়। তার জন্যেই খাতির বেরাদারিম, আদতে পোষা কুকুরের ওপর নেক নজর। কিন্তু ওরাও জানে না—না না, জানে ঠিকই, ওদের আমি এক একটা শুয়োরের বাচ্চা ছাড়া কিছুই মনে করি না। আমি ভাবি, মেমসাবরা কী ভাবে। সেই কুকুরটাকে খেলায় আর আদর করে, না কী? উরে স্‌সাহ্‌, আমার সেই ছবিটির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, সে-ই ইংরেজি খিস্তি ছবির বইটা, যার মধ্যে মেয়েমানুষ আর কুকুরের ছবি ছিল। কী কাণ্ড রে বাবা! ঝকঝকে ছাপানো ছবি। ইংরেজীতে সব লেখা। নিশ্চয়ই প্রেসেই ছাপানো, লেখাপড়া জানা লোকদেরই লেখা। যারা কেনে, পড়ে, তারাও কিছু কিঞ্চিত লেখাপড়াও জানে। নইলে পড়বে কেমনে করে। শুধু কি কুকুর নাকি। এখন কোন জন্তু জানোয়ার নেই, যাদের সঙ্গে মেয়েমানুষের ছবি ছিল না। হাতী ঘোড়া ষাঁড়...স্‌সাহ্‌ অদ্ভুত কাণ্ড। কী করে ওসব ভাল লাগে, মজা পাওয়া যায়, আমি সত্যি বুঝি না। আমার তো মনে হয়, আমার সামনে কেউ ওরকম কাণ্ড করলে, আমি দুটোকেই পিটিয়ে মেরে ফেলব। জন্তুটাকে আগে মারব। তারপরে মেয়েমানুষটাকে।

আসলে ওসব সত্যি না। কেবল বদমাইসি। তবে, একবার মহাভারতে না কিসে পড়েছিলাম, অশ্বমেধের ঘোড়া যখন ফিরে আসে, অর্থাৎ জিতে ফিরে আসে, তখন বলি দেওয়া হয়। তার তারপরে, রাজার যে আসল রানী, পাটরানী, তাকে তার সঙ্গে ওই সব করতে হয়। সেই বইটার ছবির মত। সত্যি ওরকম করত নাকি, কে জানে। নাকি খালি গুলবাজাকি। কিন্তু রামায়ণ মহাভারতে কি মিথ্যা কথা লেখে। কী জানি, আমি ওসব ভাবতেই পারি না। আরে, শত হলেও সেটা একটা ঘোড়া তো! একটা প্রকাণ্ড জানোয়ার! ধূ—র, যাচ্ছেতাই। আর বাঙ্‌রেজ আর পাঞ্জরেজ—মানে পাঞ্জাবীর পাঞ্জ আর ইংরেজের রেজ, পাঞ্জরেজ মেমসাবরা আমাকে সেরকম একটা কুকুর ভাবে নাকি। মারব মুখে লাথি। আমি থু থু দিই শুয়ারিগুলোর গায়ে।

শিখা পিছন ফিরে কী করছে, বুঝতে পারছি না। ওর খোলা চুলগুলো ঘাড়ের পাশ দিয়ে এমনভাবে এলিয়ে পড়েছে, পিছন ফিরে, মাথা নামিয়ে কী করছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। ডানা খসা প্রজাপতিটার সঙ্গে কথা বলছে নাকি, ‘প্রজাপতিঠাকুর, আমি তোমাকে মারিনি, আমার একটা ভাল বিয়েতে বাগরা দিও না, দোহাই ‘...না বাবা, জোরে হাসব না। শিখার পিছনটাও দারুণ, না? একটু একটু লম্বা ঘাড় আর কাঁধটার ঠিক মাঝখানে, স্লাইট উঁচু লাগছে। যেন ওখান থেকেই পিঠটা নেমেছে একদিকে। আর মাথাটা নিচু বলে, মনে হচ্ছে, ঘাড়টা নেমে গেছে আর-একদিকে। আর খুলিটার নিচে, ঘাড়ের ওপর কুচো কুচো চুলগুলো, দেখলেই মনে হয় ওখানটা খেয়ে দিই। জামাটাও এমন, পিঠের অনেকখানি দেখা যায়। দেখেই মনে হয়, পিঠটা খুব মিহিন একটু রোঁয়া রোঁয়া ভাবের। জামার নিচেটা আলগা হয়ে রয়েছে। হাত দিলেই ঢুকে যাবে। এখন ওর জামার ডোরাগুলোকে মনে হচ্ছে যেন শিকের গরাদের মত। তার নিচে, আবার সেই পিঠ, শিরদাঁড়াটা একটু একটু ফুটে আছে। সকালবেলা তো এখন, চানটান করেনি। শায়াটা আলগা আলগা, গোলাপী রঙের মোটা শাড়িটা কোনরকমে গোঁজা। তার জন্যেই কোমরের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। শিরদাঁড়ার হাড়টা সেখানেই একটু দেখা যাচ্ছে। তারপরেই পিঠটাকে চিরে, ঠিক যেন একটা সরু নালি। ওর নিশ্চয় খেয়াল নেই, শায়াটা অত ঢিলে হয়ে গেছে। পিঠের যেখানে শেষ, আর কোমরের যেখানটায় সুরু, সেই সরু জায়গাটা ছাড়িয়ে, নিচের চওড়া দিকে বেশ খানিকটা দেখা যাচ্ছে। আর একটু নিচেটাই কেমন, আমি জানি। স্‌সাহ্‌ আমার হাত দুটো যেন কেঁই কেঁই করে ওঠে হ্যাঙলা কুকুরের মত।

কিন্তু, শিখা কী করছে। ওকি এদিকে ফিরবে না। আমি তো সত্যি বলছি, প্রজাপতিটাকে মারতে চাইনি। ধরতে চেয়েছিলাম। একবার অবিশ্যি খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল। পালকের ঝাড়নের ছপটিটা দিয়ে পিটিয়ে ছিঁড়ে কুটে দিতে ইচ্ছা হয়েছিল। বিরজুর জুয়ার আড্ডায় একদিন যেমন বিপিন হারামজাদাকে দিয়েছিলাম। একটা ছপটি দিয়ে, চোরটাকে প্রায় তুলার মতই ধুনে দিয়েছিলাম। তারপরেও ও কেমন করে বেঁচেছিল, জানি না। প্রজাপতিটার ওপর যখন রাগ হয়ে গিয়েছিল, তখনই শিখা বলেছিল আমাকে নাকি খুনীর মত দেখাচ্ছে।

তা দেখাতে পারে। আমার ব্যাপারে, সেটা একেবারে আশ্চর্যের কথা না। তবে প্রজাপতিটার ওপর আমার একবারই রাগ হয়েছিল। যখন কড়িকাঠের গায়ে গিয়ে বসেছিল। আসলে ওর ফরফরানির জন্যেই ও মরলো। ঠিক যেন ছেউটি ছুঁড়ির মত ছটফটিয়ে ওঠা। সেই -- যে কথা বলছিলাম, একবার যেমন হল পিকনিক করতে গিয়ে কারখানার স্টাফ উইথ ফ্যামিলি সব। ওরকম কিছু হলে, আমার ডাক পড়বেই। কেন পড়ে, তাও জানি। যদি কোন বিপদ আপদ হয়; আচ্ছা গুণ্ডাটাকে নিয়ে যাওয়া যাক, এই আর কী। কারখানারই এক কন্ট্রাকটারের গ্রামের দিকে বাগানবাড়িতে পিকনিক হয়েছিল। স্‌সাহ্‌, পিকনিক নাকি ওর নাম। নিজেরা যত লোক, তার থেকে বেশী চাকরবাকর বেয়ারা বাবুর্চি। গাড়ি গিয়েছিল সাতটা।

কিন্তু সে যাক্‌গে, কথা হল মেয়েগুলোকে নিয়ে। মেয়েগুলোর মধ্যে কে যে চৌদ্দ, আর কে যে চব্বিশ, কারুর বাপের বলবার ক্ষমতা ছিল না। সাজগোজ আর পোশাকের বাহার কী। যেমন ওদের খাই-খাই ভাব, তেমনি যারা দেখবে, তাদেরও খাই-খাই ভাব। তার সঙ্গে মায়েদের রেস্‌ তো ছিলই। স্টাফের মধ্যে আবার ক’টা ছিল আইবুড়ো। বয়সের হিসাব চেয়ে লাভ নেই, ওরা সব খোকা কার্তিক। বিয়ে যখন করেনি, ওদের বয়সও হয়নি। ওদের সব বৌদিরা তো ছিলই, ভাইঝিরাও ছিল। বৌদিদের সঙ্গে খালি কথা, কথা তো না, কথার রসবড়া। চোখ ঘুরিয়ে ঢুলু ঢুলু করে, কেবল কথার রসের গাঁজলা। কিন্তু বৌদিরা যতই হ্যাঁচকা দিক, মোচড় মারুক, ঠাকুরপোদের হাত্তা সব অন্যদিকে।

চ্যাটার্জি কী কাণ্ডটাই না করছিল। ওদিকে তো সালোয়ার কামিজের বুক পাছা ফেটে

যাবার যোগাড়, কিন্তু খুকীটির কাকু কাকু বলে আদর কাড়বার কী ঘটা! এই বুক চেপে চেপে জড়িয়ে ধরে, নয় তো উরত চেপে কাকুকেই কাইচি মেরে হুড়োহুড়ি করে ফেলে দিতে চায়। কী? না, খুকি কাকুর সঙ্গে একটু হুড়যুদ্ধ করছে। আর কাকুটিও তেমনি। যা তুলে নেবার, তা তুলে নিচ্ছে। কখনো গাল টিপে দেয়, ঠোঁটে একটু টোকা মেরে দেয়, ঘাড়ে হাত দিয়ে ঝাঁকানি দিয়ে দেয়। কিন্তু একটু দূরে দূরে, একেবারে দঙ্গলের মাঝখানে না। উ-ই বিচুলির টিবিটার কাছে, পুকুরটার আমবাগানের ছায়ায়, ঝোপঝাড়ের আশেপাশে।

কিছু বলতে যাও, তা হলে সুখেন নোংরা ইতর। 'তোর মত একটা ছোটলোক গুণ্ডা ভাল কিছু দেখবে কী করে রে। তুই তো সব কিছু ওরকমই দেখবি?' হ্যাঁ, আমি তো খারাপই দেখব। দেখব—দেখব, তা বলে কি বলতে যাব নাকি। মাথাখারাপ! আমিও যা তুলে নেবার, তাই নেব। আমি তো আর কাকু না, সুখেনদা। কারখানার স্টাফও না, একটা গুণ্ডা। মতলব, স্‌সাহ্‌, লগে লগেই ভাইজা ফালাইলাম। একটু দূরে গিয়ে, হাত তুলে চেঁচিয়ে বললাম, 'কে কে খেতের কড়াইশুটি খাবে চলে এস।'

বলা মাত্রই, 'আমি আমি' করে এক দল দৌড় মারলো। আমার লক্ষ্য, হয় চোপরার মেয়ে না হয় মিত্তিরের। দেখলাম, সে দুটোই আসছে। সত্যি অড়হর, আর তার মধ্যে বড় বড় এক একটা হলদে চাদর বিছিয়ে রাখার মত ফুল ফোটা সর্ষের খেত—লোকে যে বলে সর্ষে ফুল দেখছে, মোটেই সেরকম মনে হয়নি, খুব সুন্দরই লাগছিল, আর উঁচু উঁচু আখের খেত, আর নীল ঝকঝকে আকাশ-শীতকাল তো, সবটা একেবারে দারুণ। তার মাঝখান দিয়ে মেয়েগুলো যখন ছুটে আসছিল, ঠিক রঙ-বেরঙের প্রজাপতির মত লাগছিল।

আমি কিন্তু ঠিক ছুটছিলাম। যাতে, ওদের ছুটিয়ে নিয়ে, বেশ দূরে চলে যাওয়া যায়। আর ওদিকে ঠিক লক্ষ্য রাখছিলাম, কাকুরাও আসে কি না; নাহ, খোকা কার্তিকদের ওদিকে তো ঝোলা নেমে গেছে, অতটা ছোটাছুটি পোষাচ্ছিল না। সব বুড়ো মাকড়সা, বসে আছি পথ চেয়ে, যা আসবি তা থাবায় চলে আয়! নড়াচড়া পোষাবে না। তবে ডাকাডাকি করলো অনেক, 'যেও না, যেও না।' কে কার ঝাড়ে বাঁশ কাটে। সব ছুটতে ছুটতে ততক্ষণে আমার কাছাকাছি।

আরে বাপু, কোয়ার্টার কম্পাউণ্ডের মেসিনে-ছাঁটা ঘাসের মাঠ তো না। টেনিস লনও না। ধাপে ধাপে আল, থেকে থেকে ধানকাটা মাঠ, তার ওপর দিয়ে ওরা কি সেরকম ছুটতে পারে। মিত্তিরের মেয়ে, নামটা ছিল জিনা—উহ্‌ রে স্‌সা—কী নাম, একেবারে রণরণানো। আমি ওর হাতটা ধরে ফেললাম, 'পড়ে যাবে, আমার হাত ধর।

হাত না একেবারে ডানাটা চেপে ধরলো। ব্যস, কাকুর পাওয়ানা সুরু হয়ে গেল, আমিও তখন চ্যাটার্জি কাকু। কনুইটা ওর শরীরের সঙ্গে লাগিয়ে ছুটলাম। তারপরে একটা মটরশুটির খেত দেখে, ঠিক পঙ্গপালের মত ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

অন্যদিকেও আমার লক্ষ্য ছিল ঠিক। চাষীরা দেখলেই লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে। এই এক কেলাসের লোক বাবা। বাড়িতে থাকলে, কিছু নিয়ে যাও। মাঠে গিয়ে হাত দিয়েছ তো, পেদিয়ে খাল খিচে দেবে। তা সে নিজের পাড়ার লোক, ভাই-বেরাদার হলেও মাপ নেই। আর, এদের কাছে বাবা ওসব সুখেন গুণ্ডা-টুণ্ডা চলবে না। ষাঁড়ের থেকেও গোঁয়ার। 'শহরের লোক, শহরে গিয়ে বীরত্ব ফলাও, এখেনে একেবারে পুতে ফেলে দেব।'

তবে আমি ঠিক করে রেখেছিলাম, হাত জোড় করে কত্তাটত্তা বলে মেয়েগুলোকে দেখিয়ে বলব, 'এরা তো কিছু বোঝে না কত্তা, দোষ করে ফেলেছে। নাও, দুটো টাকা নাও।'

সেটি হবে না। তুমি দিতে চাইলেই, অমনি একেবারে ল্যা ল্যা করে নিয়ে নেবে, তা পাওনি। 'কেন, আমি কি দোকান খুলে বসেছি, না হাটে এসেছি বিক্রী করতে?' এইরকম বলবে। তারপরে হয় ক্ষ্যামা, নয় তো গালাগালি দিয়ে ভাগানো। আর যদি কত্তা তুষ্ট হন, তবে একেবারে দেবতা। 'তা নেন, পয়সার কথা বলেন কেন, ছেলেমানুষ সব, দু-চারটে মটর বৈ তো না! তবে, অপুরুষ্ট্ ছিড়বেন না, পুরুষ্ট্ গুলোন খান।'

আমার ভাগ্যি ভালো, পঙ্গপালগুলোকে কেউ তেড়ে আসেনি। জিনা আমার পিঠের

ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে মটর তুলছিল। মটর তো তুলছিল না, গাছ টেনে ছিড়ছিল। আর খালি বলছিল, 'সুখেনদা, আমাকে দাও। তুমি খালি নিজেই নিচ্ছ।'

অথচ একটাও নিইনি। আমার হাত থেকে ও-ই থাবা দিয়ে নিচ্ছিল। আরে, আমার তখন গাছের মটরে নজর ছিল নাকি। আমার যা পাবার ঠিকই পাচ্ছিলাম। আর কচি কচি মটর দানা ওর মুখে পুরে দিচ্ছিলাম। দিতে গিয়ে দু-একবার আদর করে গালটা টিপেও দিচ্ছিলাম। আর ও, সেই যে এক বুলি শিখেছে, খালি লাভলি লাভলি বলে, আমার পিঠের ওপর ধামসাচ্ছিল। দে দোল দোল, ধামসা। খুব ধামসা। এদিকে ধামসানি, ওদিকে কচি মটরের রসে মুখ ভরপুর। তখন হাতটা দু-একবার বেমক্কা এদিক ওদিক করলাম। ব্যস, বুঝে নিলাম, পুরোপুরি চ্যাটার্জি কাকু হয়ে গেছি। কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, 'জিনা, চল আমরা আখের খেত থেকে আখ খেয়ে আসি।'

অমনি চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। মুখে হাত চাপ দিয়ে থামিয়ে বললাম, 'খবরদার, ওদের বলো না, বেশী লোক গেলে ফসকে যাবে। তুমি আর আমি যাই চল।'

তৎক্ষণাৎ রাজী। ওর হাত ধরে অন্য দিকে ছুটতে আরম্ভ করলাম। বাকী মেয়েগুলো ঝাঁক বেঁধে কলকল করে উঠলো। আমি বললাম, 'তোমরা থাক, আমরা এখুনি আসছি।'

জিনা বেশ মজাই পেল তাতে। উরে স্‌সাহ্‌, এক চোখ বুজে, চোখ মারল আমাকে। আমি তো ওর হাত ধরেছিলাম। তখন হাত দিয়ে, প্রায় বগলদাবা করে নিলাম। মাইরি, আমার যেন মনে হল, আদুরে খুকিটি শিখার থেকে বড় বড়। অথচ, জিনার বয়স তো না কি চৌদ্দ। চৌদ্দ! কিড়! কাকুরা তো তাই বলে, কিডি'। আর শিখা তো একুশ না বাইশ। শিখাকে সবাই যত বাড়াতে পারেনি, খুকিটিকে দেখছি, চ্যাটার্জি তার থেকে অনেক বেশী বাড়ন্ত গড়ন করে তুলেছে।

স্‌সাল্লা! হলুদ রঙের সরষে খেতটা পেরিয়ে, ওকে প্রায় শূন্যেই তুলে নিলাম। ও খিল খিল করে হাসলো। হাত দিয়ে আমার ঘাড়টা আঁকড়ে ধরলো। কসম! মনে হলো, সত্যি সরষে ফুল দেখছি।

না না, সরষে ফুল কী। আমার ঠিক মনে হল, আমি ক্ষ্যাপা ষাঁড় হয়ে গেছি। লাল রঙ দেখা ষাঁড়। কিছুটা দূরেই আখের খেত দেখে রেখেছিলাম। ওকে নিয়ে সেখানে গেলাম। আড়ালে গিয়ে খেতের ধারে দুর্বাঘাসওয়ালা একটা ছোট জায়গায় ওকে নামালাম। সেখান থেকে কেউ আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে দেখে নিলাম। খাসা! দরজা বন্ধ করা ঘরেও এত নিরিবিলি আর ফাঁকা মনে হয় না। বাঁ দিকে ঘন বাঁশবন। ডান দিকে আর পেছনে, খালি ধান কাটা মাঠ, অড়হর মটর সর্ষে আখের খেত। একটা মানুষ কোথাও নেই, মাথার ওপরে তো খালি আকাশ। সামনে লম্বা আখের খেত। দুর্বাঘাসের ওপর প্রজাপতিটা আমার বুকের কাছে।

জিনা তখনো হাসছিল ঘাসের ওপর পড়ে। আমিও ওর পাশে, ঠ্যাঙ ছড়িয়ে দিয়ে, একটা হাত ওর কোমরের ওপর রেখে খুব হাসছিলাম। ওকে হাসি বলে নাকি। মাতলামি বলে, সত্যি, কয়েক পাত্র চড়ালে যে রকম হয়, ঠিক সেইরকম মনে হচ্ছিল। মাথায় কিসসু ছিল না, প্রজাপতিটার শরীর ছাড়া। ওকেই বোধহয় নেশা চড়ে যাওয়া বলে। হাসতে হাসতেই, আমি ওর দুই বিনুনি দুদিকে ছড়ানো, ঘাড়ের মাঝখানটায় হাত দিয়েছিলাম। আঙুল দিয়ে ওখানে একটু বিলি কাটতেই, 'উহ্‌' বলে একেবারে চিত হয়ে পড়েছিল। বলেছিল, 'সুড়সুড়ি দিও না সুখেনদা।'

সুড়সুড়ি লাগবেই তো। কিন্তু ও চিত হয়ে পড়তেই আমি একটা হাত ওর বুকের নিচে,পেটের ওপর রেখেছিলাম। সালোয়ার কামিজের সঙ্গে যে উড়নিটা থাকে, সেটা রেখেই এসেছিল। কামিজটা ছিল বোধহয় কটস-উলের। বেগনি রঙ, তাতে আবার ফুল ফুল ছাপ। কিন্তু ফেটে যাবার যোগাড় যে! মিসেস মিত্তির, আমার মিত্তির বউদিরও যে এত না। বলেছিলাম, সুড়সুড়ি দিই নি তো ' বলেই হাতটা বুকের ওপর তুলে দিয়েছিলাম। তারপরে যেন খুবই মজা করছি, এমনিভাবে আমার মুখটা চেপে দিয়েছিলাম ওর কাঁধের কাছে।

আমনি কোমরটাকে ঢেউ দিয়ে তুলে, হিসহিস করে হেসে উঠেছিল। ঘাসের ওপর পা দাপিয়ে, ঘাড় গলা কুঁকড়ে বলেছিল, 'উহ্হ, সুখেনদা, কাতুকুতু লাগছে।' আমার নেশা তখন চরমে। বলেছিলাম, 'মুখে কী মেখেছ বল তো, ব্রিলিয়ান্ট গন্ধ।' বলেই ঠোঁট দুটো ওর গালে চেপে দিয়েছিলাম। প্রজাপতিটা হাসতে হাসতে কাত হয়ে পড়েছিল। পড়লে কী হবে, দাঁতাল কখনো ওসব মানে! আমার যেখানকার হাত সেখানেই ছিল। আমার হাত তো না, চ্যাটার্জি কাকুর হাত। তার হাতে যেমন স্নেহ, স্নেহ না, স্তেহ বল, আমার হাতেও তখন সেইরকম। বড্ড স্তেহ, বাঘের যেমন মাংসে। বা হাতটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম ওর ঘাড়ের নিচে দিয়ে। গালে ঘষতে ঘষতে, ওর ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপেছিলাম। যেমন ছেলেমানুষকে আদর করতে হয়। ছেলেমানুষ তো।

তবে জিনা কিন্তু বড় মেয়েদের মত করেনি। এরকম অবস্থায় শিখারা হলে যা করতো। এমনভাবে তাকাতো আর এমন দু-চারটে কথা বলতো, ব্যস, তুমি কত। তাতে যেন আরো নেশা, আরো চড়া। সেখানে ধমকই ঠমক। জিনা কিন্তু হাত পা ছোঁড়াছুড়িই বেশী করছিল। হাসছিল, আবার উহ্ আহ্ করছিল। কাত হয়ে, উপুড় হয়ে,চিত হয়ে, মাদী বিড়ালের মত ওলট-পালট খাচ্ছিল।

খাক না, আমার কাজ আমি করে যাচ্ছিলাম। অন গড বলছি, তখন যদি কোন লোক এসেও পড়তো-না, আমি মানতাম না। কুকুরগুলোর যেমন অবস্থা, আমি সেই রকম হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবলে খুব জঘন্য লাগে, কিন্তু কী করব, আমার মধ্যে বোধহয় একটা কুকুরও আছে। অবিশ্যি আমার থেকেও খারাপ অবস্থা অন্য লোকের দেখেছি। জীবনে প্রথম দেখা একটা ঘটনার কথা তো কোনদিনই ভুলিনি, ভুলবও না। নিজের সঙ্গে ন্যাকামি করে লাভ নেই, আসলে আমি চেষ্টা করলেও বোধহয় আর কখনো ভুলতে পারব না। মেয়েদের সঙ্গে আমার কিছু ঘটলেই, মানে শুটিং গেম যাকে বলে না, সেই কথাই বলছি, সেই প্রথম দেখা ঘটনাটার কথা মনে পড়বেই পড়বে। কেন, আমি বুঝতে পারি না। বিভূতি আমার বন্ধু, যে এখন একটা শহরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে, আর নয় তো গিরিন, যে এখন ঘাড়ে গদানে মোটা হয়ে গেছে—কী জানি ছাব্বিশ বছরেব একটা ছেলে, কী করে ঘাড়ে গদানে ওরকম মোটা হয়ে যায়, চশমা পরে, পাঞ্জাবী গায়ে দেয় আর কোঁচা ঝুলিয়ে বুলডগ মার্কা মুখ করে ইস্কুলে পড়াতে যায়, যে দু'জন আমার সঙ্গে ঘটনাটা দেখেছিল, তাদের নিশ্চয় ওসব কথা মনেই নেই আর।

কিন্তু আমি ভুলতে পারিনি। তখন কত আর বয়স হবে, আট-নয়, বড় জোর দশ। এই সন্ধ্যে প্রায় হয়ে আসে, শীতকাল, মাঠ থেকে ফিরছিলাম! ফেরার সময় হিসাবে একটু দেরীই হয়ে গিয়েছিল। বেলা থাকতে থাকতেই ফেরবার কথা। তখনো যুদ্ধ শেষ হয়নি। কিসের ছাই যুদ্ধ, কিছুই জানতাম না। শুনতাম মহাযুদ্ধ চলছে। ব্ল্যাক আউটের কথা একটু একটু মনে আছে, আর মিলিটারিদের যাতায়াত। বড় বড় ট্রাক, জীপ সব সময়েই দেখতাম, আর যততো শাদা আর কালো আমেরিকান, সাহেব আর নিগ্রো। আমাদের শহরের বেশ্যাপাড়ায় প্রায়ই তারা আসতো। কোনদিন দেখিনি, ইস্কুলে সবাই বলাবলি করতো। একটা ছেলে ছিল গণেশ মোদক, পাড়াটা ওদের বাড়ির কাছে। ও বলতো, কাল মিলিটারিরা মাগী পাড়ায় এসেছিল। তখন কিন্তু খুব লজ্জা লাগতো, একটা থ্রি ফোরে পড়া ছেলে, মাগী পাড়া বলে কী করে। এখন বুঝতে পারি, ওর বাপ মা যা বলতো, ও-ও তাই বলতো। ওর বাপ মা'র কথা পরে অনেকবার শুনেছি তো।

আমরা ফিরছিলাম, আর ফেরবার পথে, সেই পাড়াটার পাশ দিয়ে আসতে হত। আরে স্‌সাহ্, দেখি কিনা, পাড়াটার মোড়ের কাছেই যে নর্দমা ঘেঁষে দেওয়ালটা, তার গায়ে একটা মেয়েমানুষকে ঠেসে ধরেছে একটা শাদা মিলিটারী। প্রথমটা তো ভেবেছিলাম, মেয়েমানুষটাকে বুঝি সাহেবটা মারছে। আমরা তিনজনেই দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। মাতাল আমেরিকানটা কী যে করছিল, প্রথমটা বুঝতে পারিনি, যেন একটা খুনের মত কিছু করবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তার হাতের মুঠোয় কয়েকটা দশ টাকার নোট দেখা যাচ্ছিল।

মেয়েমানুষটা হাত দিয়ে সাহেবটাকে ঠেলে দিতে চাইছিল, কিন্তু চীৎকার করছিল না, কেবল বলছিল, 'আহ্ মরণ, কুকুর না বেড়াল গো। মাতালটা ঘরে না গিয়ে এখানেই চেপে ধরেছে। এই ঘরকে চল, চল।' ততক্ষণে ব্যাপারটা সব এমন স্পষ্ট দেখা গেল, আর কী একটা যে বুঝলাম, তখন ঠিক জানতাম না। এই আর কি, যেন একটা খারাপ অথচ অদ্ভুত কিছু। আমরা এমনিতেই পালাতাম, কিন্তু তার আগেই, ভিখিরির মত একটা লোক কোথা থেকে তেড়ে এসে, খেকিয়ে উঠেছিল, 'এ্যাই ছোঁড়ারা, বাপের সাঙা দেখছিস, অ্যাঁ? পালা বলছি।'

তাড়া খেয়ে দৌড়ে পালিয়েছিলাম। পালিয়ে, বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে তিনজনে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে কথা বলছিলাম। কী কথা বলেছিলাম, সে সব কি আর এখন মনে আছে। সেই ব্যাপারটা নিয়েই কথা বলেছিলাম, খানিকটা ভয়ে ভয়ে আর একটা খারাপ খারাপ ভাব নিয়ে। খালি এই কথা মনে আছে, গিরিন বলেছিল, 'বাড়িতে এ সব বলিস না যেন, মারবে।' সত্যি, গিরিন মাস্টার হবে না তো কে হবে। কিন্তু তা আর বলতে হবে না, সে জ্ঞানটি টনটনে। বাড়িতে বলা চলবে না। তবে সেই ব্যাপারটা আমি কোন দিন ভুলতে পারিনি, কোন দিন পারব বলেও মনে হয় না। ওটা একটা এমন ব্যাপার, যেন আমার গায়ে কেউ কলকে পুড়িয়ে ছাপ দিয়ে দিয়েছে। গায়ে মানে মনে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আর ইস্কুল মাস্টার, তাদের নিশ্চয় মনে নেই ও সব, কারণ ওরা তো খারাপ না, আমার মত হয়নি। কিন্তু আমার যে কেন মনে গেঁথে গেল, কে জানে। এমন কি, যখন একলা থাকি, তখন যদি সেই ব্যাপারটা মনে পড়ে যায়, অমনি শরীরটা গরম হয়ে রণরণ করে ওঠে। আর কোন মেয়ের সঙ্গে যখন খেলি, তখন একবারের জন্যে হলেও মনে পড়বে। শুধু তাই না, আমার ওরকম করতেও ইচ্ছা করে, ঠিক সেই মিলিটারিটার মত। কেন, তা বুঝতে পারি না। ও ব্যাপারটা মনে করা মানেই, ঝাঁঝালো নেশা করার মত। ঠিক একটা ম্যাজিকের মত, চট করে চড়ে যায়।

অথচ ব্যাপারটা কুকুর-টুকুরের মতই তো। খুবই জঘন্য, অথচ কী একটা নেশা, কোন তাল জ্ঞান থাকে না। কেন, বাবার ব্যাপারটা কী। আমার মা দেখতে তো দারুণ সুন্দরী ছিল। আমার তেরো বছর বয়সে মা মারা গেছে। আমার পরিষ্কার মনে আছে, মায়ের রঙ ছিল কি রকম একটা সোনালী সোনালী ফরসা। সাহেবদের যেমন একটা লাল মুলো ভাবের ফরসা আছে, সেরকম না। চোখ দুটো দেখতে বেশ ছিল। বড় বড় ঠিক না, অথচ এমন একটা ভাব ছিল চাউনির মধ্যে, আর কেমন একটা ঢুলুঢুলু ভাব, কেমন আদুরি-আদুরি, মরবার কয়েকদিন আগেও মা'র চোখে কাজল ছিল। ওই সেই মিত্তিরের বউ বা চোপরার বউয়ের মতই অনেকটা ভাবভঙ্গি মায়েরও ছিল, কিন্তু ওদের যেমন গা না-ঘামানো পোকা পড়া ভাব, মায়ের সেরকম ছিল না। ঠাকুর চাকর ঝি থাকলেও মা দু'বেলা রান্না করতো। সংসার চালানোর ভার বইতে হত কিছু, তা হলেও, মায়ের একটা কি ভাব ছিল, হয়তো তার নামই সখী সখী ভাব। কী রকম বলব, একটা সুন্দর পুতুলের মত। সব সময় খালি লাল ঠোঁট দুটো যেন ফুলেই আছে। কাজকর্ম সব কিছুর মধ্যেই একটা পড়ি পড়ি মরি মরি গা টিস টিস ভাব।

ওসব সবই বাবার জন্যে হয়েছিল, আমার মনে হয়। বাবা কালো, চেহারাখনিও বেশ দশাসই। এই প্রায় আমার মতই অনেকটা, তবে, তবু যা হোক, আমার গায়ের রঙটা ঠিক বাবার মত হয়নি, মায়ের মতও না, মাঝামাঝি, আর চোয়াল চিবুক ঠোঁটটোটগুলো মায়ের মতই হয়েছে। বড়দাটা ঠিক মায়ের মতই হয়েছে, অবিকল, আর মেজদাটা বাবা বসানো। ছোট বোনটা দু' বছর বয়সেই মরে গিয়েছিল, থাকলে মায়ের মতই হত, আর তারপরে এতদিনে তেইশ চব্বিশ বছরের হত, উরে স্সা, তা হলে আর দেখতে হত না, শহরের ছোঁড়ারা টোপ ফেলে ফেলে অস্থির করতো, রপোটের জ্বালায় টেকা যেত না। দেখছি তো সব চারদিকে, একটু চোখ লাগবার মত হলেই হল, ছিনে জোঁকের মত সব লেগে থাকে সেই মেয়ের পিছনে। আমি নিজে লেগে থাকতে পারি, আর আমার বোনের পিছনটা কি কেউ ছেড়ে দিত। অত্‌তো না।

মাকে আমার এমনিতে খারাপ লাগতো না, একমাত্র বাবার বন্ধুদের সঙ্গে কথাবাত বলার

ভাবভঙ্গি ছাড়া। মা যে দেখতে বেশ, আর বাবার বন্ধুরা যে বাবার কেলে হুমদো মুখখানি দেখতে আসতো না, মায়ের কাছে মদ্দা পায়রাগুলোর মত পেখম ছড়িয়ে ঘুরঘুর করতো, তা আমি ছেলেবেলাতেই বুঝতে পারতাম। লোকগুলোর চোখের দিকে তাকালে স্রেফ শুয়োরের বাচ্চা বলে মনে হত। মায়ের আদুরি আদুরি ঢঙঢাঙ দেখেও এমন রাগ হত, মনে হত, মাকে একেবারে কামড়ে খামচে ছরকুটে দিই, মাইরি। আর রাগ হত, যখন দেখতাম, বাবা মা রোজ একটা আলাদা ঘরে শুতে যেত। ছ' বছর বয়স থেকেই তো আমাকে দাদাদের সঙ্গে আলাদা ঘরে শুতে যেতে হত। বাবার মত লোককেই স্ত্রৈণ বলে কি না জানি না, তবে সেই যে একটা কথা আছে না, মাগের আঁচল ধরে থাকা, বাবার ঠিক তাই ছিল। বাবাকে মনে হত, মা-খোর। তার ওপরে, ভদ্রলোকের মেজাজটা এমন রাগী ছিল, বড় চাকরির অহঙ্কার ছিল, যেন আমরাও কেরানী চাকর বেয়ারা। আদর-টাদর করতো, কিন্তু চোয়াড়ে ভাবভঙ্গি দেখলে কাছে যেতে ইচ্ছা করতো না। বড় চাকরি, প্রচুর ঘুষ, মেলাই তেল দেবার লোক, সব মিলিয়ে লোকটাকে স্‌সাহ্‌ দারুণ ক্রুয়েল মনে হত! যেন একটা বাঘের মত। মার কম খেয়েছি নাকি! রেগে গেলে, এমন মারতো, মারাত্মক—ওই হাতের এক একখানি থাপ্পড় খেলে আর কাউকে দেখতে হত না। আর রেগে গেলে চোখগুলো এমন জ্বলজ্বল করতো, শরীর হিম হয়ে যেত। আর সেই লোককেই এখন দেখ গিয়ে।

তা সে যাক্‌গে, মা-ই ছিল বাবার ওষুধ। আমি কোন দিন মনে করতে পারি না, মায়ের দিকে যেভাবে তাকাতো, আমাদের দিকে কোন দিন বাবা সেরকমভাবে তাকিয়েছে কি না, সেইরকম মিঠে মিঠে হাসি-হাসি ভাবে। সে সব তবু একরকম মেনে নেওয়া যেত, সব থেকে রাগ হত, যখন দেখতাম, দুজনে আলাদা শুতে চলে যেত। বাবার ওপর তখন কী ঘেন্না যে হত না, সমান সমান হলে বোধ হয় লড়েই যেতাম। দু-একদিন যদি আমাদের ঘরে মায়ের একটু দেরী হত, তা হলেই ঘরের বাইরে বাবার স্যাণ্ডেলের ফটর ফটর শোনা যেত। তার মানে, 'থাকতে পারছি না, কিছু মানব না, তোমাকে আসতেই হবে।' এখন অবিশ্যি বুঝতে পারি, ফাদারের তেমন দোষ ছিল না। ওটা বাঘের খিদে, বাঁধাধরা, একেবারে টাইমলি। আর তো কোন নেশা ছিল না, মদ না, অন্য মেয়েমানুষ না। নেশা ছিল বউ, ঘুষ, লোকের ত্যালানি।

তা হলেই বোঝা যাচ্ছে, আমি জিনাকে নিয়ে যেভাবে তখন আখের খেতের ধারে সাপটে পড়েছিলাম, কেউ এসে পড়লেও মানতাম না, তার থেকে এসব লোকের অবস্থা ভাল ছিল না। মোটেই না। এরকম অনেক মানুষের কথা আমি বলতে পারি, অনেক ঘটনা, যা চোখের সামনে ভাসছে। আমাদের এই শহরেরই অনেক নামী লোকের কথা জানি, কেউ নেড়ি, লুকিয়ে লুকিয়ে, কেউ বাঘা বাঘা ভাবে, লক্ষ্য ঠিক এক দিকে, ঝাঁপিয়ে পড়বেই, কোন কিছু মানবে না। আমিও মানিনি, মানতামও না। চ্যাটার্জি কাকুর কাজ আমার হাত করে যাচ্ছিল, প্রজাপতিটা তেমনি ওলট-পালট ছটফট করে যাচ্ছিল, আর হাসতে হাসতেই উহ্‌ আহ্‌ করছিল। আমার তখন সালোয়ার কামিজের ওপর এমন রাগ হচ্ছিল, প্রায় ঘেন্নাই বলতে হয়। শায়া শাড়ি তার চেয়ে অনেক ভাল, কোন ঝামেলা নেই। আমার আর তখন হাসি ছিল না। হয়তো শিখা থাকলে বলতো, সুখেনদা, তোমাকে খুনীর মত দেখাচ্ছে। আমার চোখের সামনে সেই ছেলেবেলার দেখা আমেরিকান আর বেশ্যাটার চেহারা ভাসছিল। আমি সালোয়ারের ফিতেটা খুঁজে টানাটানি করছিলাম। জিনা এঁকেবেঁকে গড়িয়ে তখন প্রায় আখ খেতের মাটিতে গিয়ে পড়েছে, সুখেনদা, প্লীজ, হি হি হি, প্লী—জ, ভীষণ কাতুকুতু—হি হি হি—উহ্‌ উহ্‌?

কিন্তু সালোয়ারের দড়িটা খুঁজে পাইনি। শেষটায় প্রায় জিনা চীৎকার করেই উঠেছিল, ব্যথা লাগলে বা হঠাৎ চোট লেগে গেলে যেরকম কেঁদে চেঁচিয়ে ওঠে, সেই রকম শব্দ বেরিয়েছিল ওর গলা দিয়ে, আর আচমকা এমন গুটিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল যে, আমি থমকে গিয়েছিলাম। তবে বিশ্বাস করিনি, সত্যি কিছু হয়েছে বলে, মেয়েদের ওসব ন্যাকরা আমার জানা আছে। তবু যেন কেমন একটু মনে হয়েছিল, তাই উঁকি দিয়ে ওর মুখ

দেখেছিলাম। দেখেই আমার চিত্তির উলটে গিয়েছিল, প্রায় ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। জিনার মুখটা যন্ত্রণায় বেঁকে গিয়েছিল, মুখের রঙ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, যেন নিশ্বাস ফেলতে পারছিল না। মরেছে, স্সাহ্ অক্কা পেয়ে যাবে নাকি। কী বিচ্ছিরি হয়েছিল মেয়েটার গোটা চেহারা, মুখটা মনে হয়েছিল, একটা বয়স্ক মেয়েছেলের মুখ, খুকীর ভাঁজও ছিল না। তার ওপরে বুকটার চেহারা এমন বদলে গিয়েছিল, দু'টো মালসার মত ছড়িয়ে গিয়েছিল। ওর দুটো হাতই বুকের নিচে পাঁজরের কাছে চেপে ধরা ছিল, কোনরকমে ফিসফিস্ করে বলেছিল, 'ভীষণ লেগেছে। তখনো ঠিক পুরোপুরি বিশ্বাস করব কি না বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু ছেউটির মুখটা যেরকম হয়ে উঠেছিল, নীল নীল ভাব আর চোখের পাশ দিয়ে গাল অবধি একটা শিরা যেন তিরতির করে কাঁপছিল। তখন জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোথায় লেগেছে? তার কোন জবাব দেয়নি জিনা। একেবারে কাঠ হয়ে পড়েছিল। আর আমার তো চোরের মন, ভেবেছিলাম, লোকে বোধ হয় একেই সেই ধর্ষণ বলে। অথচ আমি তো তা করিনি। তখনি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলাম, মরে গেলে, আখের খেতের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলে দিতে হবে। দিয়ে তারপরে ভালমানুষের মত সকলের কাছে গিয়ে বলব, 'জিনা তো অনেকক্ষণ আমার কাছ থেকে চলে এসেছে, আমি তো অন্য দিকে চলে গেছলাম। ও এখনো ফেরেনি? তা হলে তো খুঁজে দেখতে হয়।

তা বললে কি হয়, ঠিক কী করব তা-ই বুঝতে পারছিলাম না। সত্যি সত্যি আমি তো আর চ্যাটার্জি কাকু নই, তার হাতের কাজ-কারবার অন্যরকম। তখন যা মাথায় এসেছিল, তাই করেছিলাম। পাঁজরার যেখানটায় ও হাত চেপে রেখেছিল, সেখানটা আস্তে আস্তে ডলে দিয়েছিলাম। কী কুগ্রহ রে বাবা। জিনা ঠোঁট নেড়ে জল চাইছিল। সেখানে জল কোথায়। একমাত্র বাঁশ ঝাড়টার কাছে একটা ডোবা দেখা যাচ্ছিল। কোন রকমে সেখান থেকে রুমাল ভিজিয়ে নিয়ে এসে ওর চোখে মুখে একটু দিয়েছিলাম। তাইতেই আস্তে আস্তে চাঙা হয়ে উঠেছিল যাক বাবা, স্বস্তি। এদিকেও না, ওদিকেও না, মাঝখান থেকে খুনী হয়ে পড়ছিলাম আর কী। আখ ভেঙে খাইয়েছিলাম ঠিকই, আর স্নেহও করেছিলাম তারপরে। তখন ওর মুখ দেখে আমার আবার কী রকম কষ্টও হচ্ছিল, এক এক সময় হয়-না, কারুর কষ্ট দেখলে বুকের মধ্যে কী রকম টনটন করে সেই রকম করছিল। মনে হয়েছিল, আমি যেন ওর দাদা, আমার ছোট বোন ও, আর দাদাদের মনটা বোধহয় ছোট বোনের জন্য এরকমই টাটায়—কী জানি, জানি না ছাই। আসলে ওই চ্যাটার্জি শুয়োরটার ওপর হিংসায় আর রাগেই বোধহয় ওরকম করেছিলাম, তবে জিনাকেও কি ভাল বলা যাবে! কাকুর আদর খেয়ে খেয়ে তো বারোটা বাজিয়ে বসে আছে। যাক গে, তখন আর সুড়সুড়ি কাতুকুতু হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি কিছুই ছিল না। কিন্তু স্নেহেও অরুচি, মেজাজ একদম খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ওসব চ্যাটার্জি কাকুরই পোষায়, চল্লিশ পঞ্চাশের খোকা কার্তিকের, মাংসের তাল নিয়ে খানিকটা রগড়ারগড়ি। ওদের দম আর কত হবে!

এই প্রজাপতিটাকে দেখে, সেই কথাই আমার মনে পড়েছে। চাইলাম ধরতে, তা একবার ছটফটানিটা দেখ। নিজের ইচ্ছায় মার খাওয়া না এ সব! ধরে তো খেয়ে ফেলতাম না। প্রজাপতিটা কখন ঘরে এসেছিল, আর আমার কাছেপিঠেই উড়ে বেড়াচ্ছিল। শিখা চোখ বড় বড় করে বলেছিল, কী সুন্দর প্রজাপতিটা। তখনো আমার তেমন কিছু মনে হয়নি। তারপরে প্রজাপতিটা প্রায় একবার আমার কাঁধের কাছে এসে বসেছিল। শিখা চোখ ঘুরিয়ে হেসে বলেছিল, 'সুখেনদা, প্রজাপতিটা তোমার গায়ে বসেছে, তোমার এবার বিয়ে লাগবে। আহ্ কী সুন্দর!'

তখনই আমি হাত বাড়িয়ে, রঙচঙে পোকাটাকে ধরতে চাইছিলাম। প্রজাপতি হলেও পোকাই তো ওটা। শিখার কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল, প্রজাপতিটা ওর গায়ে বসলেই ভাল হত। আমার যে আবার কী রকম বিয়ে হবে, তা কি ও জানতো না। মেয়ে আমি অনেক দেখেছি, ঘেঁটেছি যাকে বলে, হাড়ে মাংসে দেখা আছে। বিয়ের কথা কোন দিন চিন্তা করিনি। তবে হ্যাঁ, যদি কোন দিন কিছু করতেই হয়, বিয়েটিয়ের মত, তা হলে শিখাকে আমি ছাড়ব না। তা ওকে যত লোকই চাক, আর যতই ওর পেছনে পেছনে ঘুরুক, ওকে আমি ছাড়ব না। জানি সবই, কে কে ওকে চায়। আমার দুই দাদাও ওকে চায়। বড়দা আর মেজদা। আরও অনেকের টাক আছে, তাল মারবার লোকের অভাব নেই। আরও মেয়েমানুষ যাকে বলে, বাব্বা, যত দেখবে সবাই তাকে তালতোল্লাই দিচ্ছে, ততই রঙে রঙে উঠবে। তার ওপরে যদি সেই মেয়ের আবার একটু খেলুড়ি মেজাজ হয়, তা হলে তো কথাই নেই। খেলোয়াড়ির সঙ্গে যদি আবার একটু অভাব অনটন, আর যদি জানতে পারে, একটু খেললে পরে, সে-সব মিটবে, উহ্রে ফাদার, তাকে আর দেখতে হবে না। আমার তো মনে হয়, তারা বেশ্যাদের থেকেও মারাত্মক। আর এই রকম মেয়ে আজকাল এত হয়েছে-না, যেখানেই যাবে, গাদা গাদা। বেশ্যাদের বুঝি বাপু, ঘাটে কড়ি দাও, খেয়া মেরে চলে যাও। বুঝেছি বাওয়া, এ নদী এখন তোমাকে পার হতেই হবে। ব্যস, সাফ সুরত ব্যাপার, ধোলাইয়ের নাম পেটে খাওয়া।

কিন্তু এই মেয়েগুলো কী। তারা সব রকম করবে, অথচ, বেশ্যা না। শিখাও অনেকটা সেই জাতের। বাপটি স্‌সাহ্ ফেরেববাজ, কলোনী ঘেষে এই আট কাঠা জমিটা কীভাবে বাগিয়েছে, কেউ বলতে পারে না। তার সঙ্গে এই পুরনো একতলা বাড়িটাও। বাড়িটা এককালে এক মুসলমানের ছিল। শুনেছি, পঞ্চাশ সনের দাঙ্গার সময়, শিখার বাবা এই বাড়িটা দখল করেছিল। তারপরে, কীভাবে কীভাবে একেবারে মৌরসী দলিল করে নিয়েছে। খচ্চর-বাজ লোক একেবারে। দলিলে কাউকে সই করাতে ভোলেনি। মুসলমানের সম্পত্তি তো, ভাগীদার অনেক। বলে, টাকাও নাকি দিয়েছিল তাদের। কোথেকে বাবা! টাকা বানাবার কল ছিল তোমার ঘরে! রেজিস্ট্রি অফিসে দলিল লিখে তো খেতে, আর একটি ক্ষমতা ছিল, এনতার ছেলেমেয়ে করেছ। তাও পাঁচটার বেশী বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি। মানুষ যা করেছে, সে তো দেখাই যাচ্ছে। বড় বড় ছেলে দুটো ঘস্টে ঘস্টে কোনরকমে ইস্কুল ফাইনাল পাশ করেছিল। তাও কত বছরে কে জানে বলে, কেরানীর চাকরি করে, আমার স্‌ সাহ তাও বিশ্বাস হয় না, দেখ গিয়ে হয়তো বেয়ারা পিওনের কাজ করে। তবে নেহাত ভদ্রলোকের পরিচয়টা দিত হবে তো, তাই বোধহয় বলতে হয়। বড় মেয়েটার-শিখার দিদি বেলার কোথায় একটা বিয়ে দিয়েছিল! জানি না কার দোষ, সেও ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। বেলা তো এখন বাড়িতেই বেশ আসর জমিয়ে তুলেছে, তবে ওর ব্যাপারটা একটু আলাদা। আমাদের আবার বেলাদিদি তো, ওর ওখানে একটু বড় বড় দাদাদেরই আসর জমে। ডাক্তার, ব্যবসাদার, ইস্তক ভূড়োদাস প্রিয়চরণ মোক্তারও বেলা বেলা করে নালানি-ঝোলানি করে। বেলা বিশেষ বাইরে টাইরে যায় না। আসর যা কিছু বাড়িতেই। তবে আমার মনে হয়, ডাক্তার হরনাথ চক্রবর্তীই ওকে ঠিক জায়গায় কোপ বসিয়েছে। কেননা, ডাক্তার রোজ আসে—তায় আবার ডাক্তার তো—সব সময়ে হাতে থাকা ভাল। কিন্তু এই মাঝবয়সী বুড়ো খচ্চরগুলো কেউই

বেলাদিকে বিয়ে করবে না, আমি জানি। ওদিকে তো সব ধাড়িগুলোরই ঘরে একটি করে ইস্ত্রি আর এক পাল বাচ্চা রয়েছে।

বেলাদি মাঝে মাঝে আমাদের দিকেও নেক নজর হানে। আমরা, যারা শিখার পিছনে ঘুরঘুর করি। হানবেই তো, গতরে বিষ, মনেও কোন আশা নেই। মাঝে মাঝে, তা-ই বোধহয় মনে করে, ছোঁড়াগুলোকেই একটু চানকে দেখি। আ–র বেলাদি, ছোঁড়ারা কি আর সেই ছোঁড়া আছে যে তোমার বর্শার খোঁচায় বিধবে। আজকালকার ছোঁড়ারা সব পাঁকাল মাছ, গায়ে একটু ঝাপটা মারবে, তার পরেই পিছলে কেতরে বেরিয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, বুড়োদের পোটকা মাছের মত ঝাপটা না, সেটা একটু জোরেই লাগবে। তোমাকে জড়িয়ে নিয়ে কেউ যাবে না। তোমার তিরিশ বছরকে জড়াবার জন্যে ওদের পাখনা খেলবে না! তবে হ্যাঁ, জড়বার হিম্মত যদি কারুর থাকতো, তবে ছোঁড়াদেরই। এরকম এক-আধটা কেস এখনো আমাদের এই শহরে ঘটে না, তা বলব না। লাখে এক। বুড়ো বাঁদরগুলোর তো কেবল মিঠে মিঠে বুলি, তার সঙ্গে আবার একটু তত্ত্বকথা। আসলে স্বাদ বদলাবার তাল। কিন্তু বেশ্যা বাড়ি যাবে না। তা-ই কি যেতে পারে, আমন সব খাসা ভদ্দরলোক, আমন ঝকঝকে গতর। লোকে চরিত্রের দোষ দেবে না? রোগের ভয় নেই? তার চেয়ে বল, ওই বুড়োদেরই এক ব্যাটাকে একদিন ধরি, পাড়ার ছেলে-ছোঁড়াদের জড় করি, একটা হৈ-হুল্লোড় পাকিয়ে, তোমার সঙ্গে সাঙা লাগিয়ে দিই! আমার নাম সুখেন—সুখেন গুণ্ডা।

কিন্তু তা হবার নয়। বেলাদির জীবনটা এভাবেই কেটে যাবে মনে হচ্ছে। বেচারি! মাইরি বলছি, আমার খুব খারাপ লাগে, কষ্টও হয়। যে কারণে একবার নির্মল—আমাদেরই বন্ধু, বুক বাজিয়ে বেলাদির নামে খিস্তি করে বলেছিল, কবে ও বেলাদির সঙ্গে কী করেছে, শুনে গদাম করে মেরেছিলাম পাছায় লাথি। ব্যাপারটা অনেক দূর গড়াতো। নির্মল আমাকে মারবার জন্য পকেট থেকে ছুরি বের করেছিল! উহ্ রে স্‌সাহ্, কালকা যোগী, মাস্তানি দেখাতে এসেছ আমাকে। স্রেফ লিভারের উপর ঝেড়ে আর একটা লাথি কষিয়েছিলাম। আমার মেজাজ চড়ে গেলে, ক্ষমা নেই। সঙ্গে আরো দু-একজন বন্ধু ছিল। সবাই থামিয়ে দিয়েছিল। নির্মলের হাতের ছুরিটা ছিটকে পড়েছিল দূরে। সেটা তুলে নিয়ে, মুখ বন্ধ করে, আবার ওকেই ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।

তারপরে অবিশ্যি আমার মনে হয়েছিল, কেন মিছিমিছি ওকে মারতে গেলাম। আমরা সবাই-ই তো আমাদের কীর্তিকাহিনী নিজেদের মধ্যে বলাবলি করি, হাসাহসি করি। ওর কী দোষ। বেলাদিরই বা এত চুলবুলোনি কেন যে, আমাদের সঙ্গেও তাল দিতে হবে। তা ভাবলে কী হবে, তখন কী রকম মেজাজ চড়ে গিয়েছিল। নাঃ, সব ভাবলে পরে ঘেন্না ধরে যায়।

শিখার আবার এসব নেই। ওর ভাবভঙ্গি একটু আলাদা, অন্য রকম। ও তো আবার বছর দুয়েক কলেজেও পড়েছিল। অন্য রকমের ফষ্টিনষ্টি আছে, তবে সেসব আমার খুব খারাপ লাগে না। তা বলে সকলের সঙ্গেই করবে নাকি। কিন্তু দেখ গিয়ে, ওর ভাব সকলের সঙ্গে। আরে, র‍্যাশন ইনস্পেকটরটাও ওকে দেখলে কুকুরের মত গলে পড়ে, যেন ল্যাজ নাড়াতে আরম্ভ করে। স্‌লার আগমন কী কারণে? না, দাদাদের সঙ্গে খাতির। শহরে আর লোক পাওনি খাতির জমাবার, যত খাতিরের লোক হল শিখার দাদারা। ক’খানা কার্ড বাড়তি রাখতে দিয়েছ দাদা! হস্তায় হস্তায় ক’ কে জি চাল র‍্যাশন দরে শিখারা পায়! দাদাদের সঙ্গে খাতির দেখাচ্ছে। দাদারাও তো তা-ই বলবে। চার বেলা করে, এই বাজারে ভাত মারতে পারলে, বোনের ওপর দিয়ে যদি কেউ কিছু উশুল করে যায়, যাক। এদিক নেই, ওদিক আছে, দু ভাই আবার রাজনীতিও করে। তাও কি, দু’জনে একদলের না! এ একদল, ও আর-একদল। আমাদের বাড়ির মতই। আমার দুই দাদাও তো তাই-ই। দু’জনে দুই দল করে।

আমার দাদাদের কথা না হয় আলাদা, ওরা তো আর বোন দেখিয়ে চার বেলা ভাত মারে না। এদেরই বোধ হয়, সেই মেটে রঙ, দু-মুখো ঢামনা সাপ বলে। দেখেছি সাপগুলোকে, এত কুচ্ছিত দেখতে বোধ হয় কোন জীব হয় না। একে তো পচা ঘায়ের মত রঙ। লম্বায় বড় হয় না, বেঁটে আর মোটা। সামনে পেছনে বলে কিছু নেই। দুমুখ দিয়েই চলে। আর দুটো

মুখই একরকম। কোনটা মুখ আর কোনটা পাছা, কী করে বুঝবে।

শিখার দাদারা হল সেই রকম। ওর দুই দাদা, আমার দুই দাদারই সাকরেদ। আমার দুই দাদা এই শহরের দুই দলের নেতা, আর আমি গুণ্ডা। সাববাস! কিন্তু আমি ভাবি, দাদারা যা-ই হোক, শিখাও কেন ওরকম হবে। সেও নিশ্চয় জেনেশুনেই র‍্যাশন ইনস্পেকটরটাকে চা দেয়, হেসে ঢঙে কথা বলে। সকলের সঙ্গেই তো, যে একটু তাল দিচ্ছে, আমনি নাচছে—নাচছে মানে চোখ নাচাচ্ছে, ভুরু নাচাচ্ছে, শরীর নাচাচ্ছে। মেয়ে বড় ভাল, সকলের সঙ্গেই ভাব খাতির, সবাই বড্ড ভালবাসে, একেবারে উমচ্চু উমচ্চু! সবাই ভালবেসে যা দেয়, তা-ই নেয়, আহ্ কী ভালবাসা গো, একেবারে গড়িয়ে যায়। এদিকে শহরে তো কানপাতা দায়। আজ এর সঙ্গে, কাল ওর সঙ্গে, গল্প লেগেই আছে। সেরকম কাণ্ড কিছু আমার চোখে পড়েনি কোনদিন, যত রকম শোনা যায়। পড়লে কী হবে বলা যায় না। মেজাজ চড়ে গেলে, ভুকিয়ে ছেড়ে দেব, সে আমার নিজের দাদা হলেও খাতির নেই।

তবে এই মেয়েটার একটা কী আছে, অনেক ছেলেই ওর পেছনে লেগে আছে। আমার কথা বাদ, আমি তো একটা গুণ্ডা। আমার দাদাদের তো এই শহরে খুব নাম-ডাক আছে, বলতে গেলে শহরটা দু'ভাগে ওদের দু'জনেরই। অধিকাংশ লোকই দু দলে ভাগাভাগি। ওরা পর্যন্ত শিখার দিকে নজর রেখেছে। কেন, তা-ই আমার জানতে ইচ্ছা করে, শিখার কী আছে। একটা কী যেন আছে ওর। আমি তো বলছি, যারা বেশ্যাদের থেকেও খারাপ, ওকে আমার সেই জাতেরই মনে হয়, তবু কী যেন একটা আছে, যেটা আমি বুঝতে পারি না। এই যেমন, আমি-আমি তো গুণ্ডা সবাই জানে, তবু ও আমার সঙ্গে কথা বলে, মেশে। তার চেয়েও সাফ কথা, আমার সঙ্গে ওর আছে, মানে বেশ ভালই আছে। একটা ছেলেতে আর মেয়েতে যা থাকবার, সেই রকমই প্রায় সব আছে। সেটা আমি গুণ্ডা বলে ভয়ে কি না, জানি না। কিন্তু ভয়ে ভয়ে কিছু হলে সেটা বোঝা যায়। মানে, ইচ্ছে নেই, জোর করে কাউকে যদি চুমো-টুমো খেতে হয়, তার যে কী রকম কাঠ কাঠ ভাব, তা আমার জানা আছে। সে রকম কখনো দেখিনি। শুধু তা-ই না, আমি এলে যে শিখা রাগ করে, অসন্তুষ্ট হয়, সে রকম ভাবও বেশী দেখিনি। একেবারে হয় না, তা বলব না, তবে খুব কম। আমি এলেই তো, বাকী খচ্চরদের কাটবার পালা, এমন কি আমার দাদাদেরও। তখনো কিন্তু ও আমাকে চলে যেতে বলে না, রাগ করে উঠে চলে যায় না, মুখ গোমড়া করেও বসে থাকে না। তা-ই বা কেন, ইচ্ছে করলে গা ছেড়ে দেওয়া ভাবে আলগা আলগা কথাও বলতে পারে, কাটিয়ে দেবার তাল থাকলে অনেকে যেরকম করে। কিন্তু তা-ও করে না।

না না, এ আবার একটু বেশী ভাবছি আমি।

করে, দু-এক মিনিট একটু কেমন যেন হয়ে যায়, একটু হাসি-হাসি ঠাট্টা-ঠাট্টা, তার মধ্যে একটু জ্বালাও। হয়তো ঠাট্টার মত করে বলে, 'বলুন সুখেন্দুবাবু, আপনার জন্যে কী করতে পারি।' ওরকম কথা শুনলে আমার রাগই হয়, যেন ও সকলের জন্যে কিছু করতেই আছে। এতক্ষণ করছিল অন্যের জন্যে, এবার আমার জন্য করবে। খুব মেজাজ খারাপ থাকলে, আমি এক-আধটা খারাপ কথা বলি, খারাপ খিস্তি আর কি! হয় তো বলি, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে, আমার সঙ্গে শুয়ে পড়তে পার, আর কী পার? এরকম কিছু বললেই কিন্তু শিখা রেগে যায় না। এমন একরকম করে হাসে, যে হাসিতে যেন খানিকটা রাগ বা বিরক্ত ভাব থাকে, সেইভাবে হেসে বলে, 'বাড়িতে গঙ্গাজল আছে, এনে দিচ্ছি, মুখটা একটু ধুয়ে নিন।'

ওরকম করে কথা বললে, আমি আবার বিশেষ কিছু বলতে পারি না, আর তখন ও সপাসপ কথার ছপটি চালিয়ে যেতে থাকে, সব সময় সব জায়গায় একই কথা বলে বেড়াচ্ছ, না? মুখটা একটু ভাল করতে পার না, সব সময়ে নোংরা নোংরা কথাগুলো বলবার জন্যে যেন মুখিয়ে আছ।'

কিন্তু যে শুয়োরগুলো তার আগে বসেছিল, সে সময়ে ওদের শুয়োর ছাড়া আমার আর কিছু মনে হয় না—আমাকেও নিশ্চয় ওদের ওরকমই একটা কিছু মনে হয়–খচ্চর কুকুর যা হোক একটা, গুণ্ডা তো বটেই, ওদের কথা মনে করে তখনো আমার রাগটা মনের মধ্যে

জমেই থাকে, তাই আমি চুপ করেই থাকি। কোনদিন এদের কোন-কোনটাকে আমি হাড় ভেঙে দিতাম। শিখার জন্যেই পারি না, কী জানি কেন। ও ভাল না, আমি জানি, কথা তো সেইখানেই, তবু ওর মধ্যে কী একটা আছে। সে কথা হয়তো কেবল আমারই মনে হয়, একটি বোকচন্দরের মত ওসব ভেবে মরছি, বাকীরা তাওয়ায় রুটি যা সেঁকে নিয়ে যাচ্ছে, তাওয়ার মধ্যে কী আছে, তা ভাবতে তাদের বয়েই গেছে।

তা হতে পারে, আমার যা মনে হয়, আমি তা-ই বলছি, বোকচন্দর হই, আর যা-ই হই, ওর মধ্যে কী একটা যেন আছে, চোখের মধ্যে, কথার মধ্যে বুঝতে পারি না। অনেক সময় মনে হয়, সেইরকম নাকি, সেই বাবা বাইরে স্যাণ্ডেল ফটর ফটর করছে, আর মা আমাদের কাছে বসে আছে, তখন মাকে যেরকম লাগতো। ধূ-র, নাহ! মায়ের সঙ্গে ওর কী। হয়তো বেশ্যাদের চাল এরকম হয়—উঁহু, না না, ওদের আমার দেখা আছে। ওরা শিখা না। আসলে, এরকম অবস্থায়, শিখার যেরকম হওয়া উচিত ছিল রপুটে মেয়ে—শহরে আরো যে রকম আছে, সে তুলনায় শিখা কেমন যেন অদ্ভুত সহজ। এমন সহজ যে, ওর যেন তা হওয়াই চলে না। গলার স্বর বদলে, ভুরু তুলে, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, পাছা নাচিয়ে নাচিয়ে চলা এক ধরনের ছুঁড়ি আছে না, রাস্তায় কলেজে সবখানে যাদের দেখতে পাওয়া যায়, বুলির ধরন-ধারণ সবই একটু অন্য রকম, সেরকম একেবারেই না। কে জানে, সেসব আবার ছেলেমানুষি কি না, নাকি সেটাই ছেনালি, জানি না। কিন্তু ওসব মেকীপনার থেকে ওর সোজাসুজি ভাবের টানটা যেন বেশী। আরো কী মনে হয়, ও যেন একটা পাখী, ওর নিজের মনেই আছে। লাফাচ্ছে, পাখা ঝাপটা দিচ্ছে, উড়ছে, খুটে খুঁটে খাচ্ছে, মরদ এসে ঠোকরাচ্ছে, ঘাড়ে উঠছে, আবার ভয় পেয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, কোন বাচ্চা ছেলের গুলতির গুলিটা যেন ঠাস করে গায়ের কাছে পড়তেই সাঁ করে উড়ে যাচ্ছে, আর যে-ই না বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসছে, তখন কেমন একটা মন-মরা, যেন সেটাও এক ধরনের ভয় পাওয়া, কী যেন বিপদ চারদিকে.উরে স্সাহ্, লে লে সুখেন, অনেক ভেবেছিস। যা বোঝা যায না, তা নিয়ে এত ভাবার কোন মানে হয় না। মোটের ওপর, যা-ই থাক, ওর মধ্যে কী রকম একটা মায়া মমতার ভাব আছে। মায়া মমতা, সেটা যে ঠিক কী রকম, তাও ঠিক বলতে পারি না, ওই কথাটাই মনে এল, আর মায়া মমতা থাকলেই, কেমন যেন মনে হয় না, তার একটা কি দুঃখও বুঝি আছে।

দুঃখ! তাও আবার শিখার। ওর আবার দুঃখ কিসের। ওকে তো শহরের গণ্ডা গণ্ডা লোক—যাক্‌গে, আমার ওইরকম মনে হয়। আর তা-ই ও যখন বলেছিল, 'প্রজাপতিটা তোমার গায়ে বসেছে, তোমার বিয়ে লাগবে', সেটা যেন কেমন একরকম লেগেছিল। ঠাট্টা করেই থাকুক, আর যাই করুক, প্রজাপতিটা আমি ওকে ধরে দিতে চেয়েছিলাম। ওর গায়ে, দু'জনেরই গায়ে লেগেছে, দু'জনের এক সঙ্গেই হবে। মানে, ওর সঙ্গে আমার হবে। খচ্চর প্রজাপতিটা—না খচ্চরটা, কিছুতেই ধরা দিল না। এখন আমি জানি শিখা কী বলবে। ওর যে রকম কথা, ঠিক বলবে, 'তোমার একটা ডানা যদি কেউ ভেঙে ফেলে, তা হলে কেমন হয়।'...

কিন্তু শিখা যে ফিরেই তাকাচ্ছে না। পিছন ফিরে কী করছে এতক্ষণ ধরে। দেখতে হয়। আমি দেওয়ালের দিকে ওর কাছে গেলাম। ওর ঘাড়ের পাশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম। আশ্চর্য ব্যাপার, গায়ের সঙ্গে লাগানো আস্তে ডানাটা ধরে, শিখা ছেঁড়া ডানাটা যেন জোড়া লাগাবার চেষ্টায় আছে। আর প্রজাপতিটা এখনো ঝাপটাঝাপটি করছে, এক ডানাতেই ফরফর করছে। আর শিখাটা কী ভেবেছে, ও কি সত্যি ছেঁড়া ডানাটাকে জোড়া লাগাতে চায় নাকি। এসব দেখলে, ওকে কী রকম ছেলেমানুষ লাগে। একটা লেখাপড়া জানা মেয়ে যদি এরকম করে, আর এসব দেখলে, ওর যা নামডাক এই শহরে, মানে রেপুটেশন, স্সিখা মজুমদার, তাকে যেন ঠিক চেনা যায় না।

তবে প্রজাপতিটা, সত্যি সুন্দর, বিউটিফুল। শিখার আঙুলে প্রজাপতিটার পাখার কালো আর রুপোলি রঙ লেগে গেছে দেখতে পাচ্ছি। কেন এরকম হয়, কে জানে, প্রজাপতির গায়ের রঙটা যেন আলগা, এইমাত্র কেউ লাগিয়ে দিয়েছে, কাঁচা রঙ, তাই হাতে লেগে যায়। এর আগে, আমিও যতবার প্রজাপতির গায়ে হাত দিয়েছি, ঠিক রঙ লেগে গেছে। তা লাগুক গিয়ে; আমার নাকটা প্রায় শিখার এলিয়ে পড়া চুলের কাছেই। গন্ধ একখানি যা লাগছে না, মিষ্টি মিষ্টি, মনে হচ্ছে, নাক ডুবিয়ে গন্ধটা নিয়ে 'কপ করে খেয়ে ফেলি, মাইরি গন্ধ খাওয়া যায় না জানি, তবু মনে হয়, গপ করে গিলে ফেলি। বললাম, ওটা জোড়া লাগাচ্ছ নাকি।

শিখা নড়ল না, চড়ল না, জবাব দিল না, একইভাবে তুলতুলে নরম গায়ের সঙ্গে, ছেঁড়া পাখনাটা ঠেকিয়ে রাখল, আর প্রজাপতিটা ঠিক ছটফট করেই চলেছে, সামনের শুড় দুটো কাঁপিয়ে যাচ্ছে। আমি আর একটু ঝুঁকে উঁকি দিতে চেষ্টা করলাম। শিখার মুখটা প্রায় দেওয়ালের কাছে কি না। আমার মুখ বাড়িয়ে এতটা দেখবার উপায় নেই। কিন্তু যা দেখলাম না, তাতেই মেজাজটা একদম বেকায়দা হয়ে গেল। যা ভেবেছিলাম, ঠিক তা-ই, শিখা ব্লাউজের ভিতরে কিছু পরেনি। আর সামনের দিকে ঝুঁকে আছে বলে, ডোরা-কাটা-কাটা শিকের গরাদ জামাটা বেশ খানিকটা ফাঁক হয়ে পড়েছে। আর তার ভিতর দিয়ে, উহ্রে বাবা, হাতে একেবারে বিদ্যুৎ খেলে গেল। বলেছিলাম, সকালবেলার শিশির শুকিয়ে যাবার পরেই, নধর কপিপাতার মতন—ঠিক সেইরকম দেখাচ্ছে। তাতে আবার যেমন, কেমন একটা পাউডার লাগানো ভাব থাকে না, ঠিক যেন সেইবকম, একটা বেশ চোখ-জুড়ানো শ্যামলা শ্যামলা চিকচিকনো রঙ। মাঝখানের ফাঁক, আর দু' পাশে গোল হয়ে ওঠা ওটা—ওটাকে সত্যি আমার মাংসপিণ্ড বলতে ইচ্ছে করে না। মাংস ভাবলেই যেন এ জিনিস সে জিনিস থাকে না, সত্যি। মাংস বলে আমার মনেই হয় না, যেন অন্য কিছু, আর কিছু। ওই যে বইয়ে লেখে না, স্তন—আরো যেন কী সব বলে না—কী—-কী যেন—গুলি মারো, শিখার ওই বুক দুটোকে আমার স্তন বলতে ইচ্ছা করে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে, পীনপয়োধরা—নাহ, হাতটাকে এবার কামড়ে দেব, নয়তো ক্যাত করে একটা লাথি মারব।

আচ্ছা, ওরকম গোল হয়ে বেড়ে উঠেছে বলেই, ওখানকার চামডাটা কি ওরকম দেখায়, যেন খুব ছোট ছোট বিন্দু বুকে ছড়ানো। যেমন হয় না, গায়ে অনেক সময় কাঁটা দিয়ে উঠলে, গায়ে কী রকম কুঁড়ি কুঁড়ি ফুটে ওঠে, সেই রকম দেখাচ্ছে। আর ওখানটা—বুকের মাঝখানটা আর গোল বুক দুটো হাতমুখের রঙ থেকে বেশী ফরসা। এমন কি বাঁ দিকের জামায় এতটা ঢল খেয়েছে, বা দিকের সবটুকু প্রায় পুরোই দেখা যাচ্ছে। যেখানটা ইঞ্চিখানেক জায়গা যেন গোল করে খয়েরি রঙ লাগানো, ওখানটা যে কেমন, সবই আমার জানা। ওর গাটা তো আমার চেনা, সবরকম স্বাদই নেওয়া আছে, তবু একটা ভিখিরির মত হ্যাঙলাপনা, কিছুতেই আমার যেতে চায় না। কেন, আমি তাই ভাবি। ব্যাপারটা তো সেই একই। যতবারই কিছু করতে যাব, ঘুরে ফিরে সেই একরকমই লাগবে। অথচ মনে হয়, প্রত্যেকবারই যেন নতুন লাগবে। এই যেমন, এসব ভাবতেই মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে থাকতে পারছি না, ফুরিয়ে যাচ্ছে, এখনি হাতটা বাড়িয়ে দিই।

শিখার গায়ের ছোঁয়া প্রথম যেদিন পাই, সেই দিনটার কথা আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে। তখন আমার অনশন ধর্মঘট চলছে—উ রে স্‌সাহ্‌, মনে করে এখন আমার চিত হয়ে শুয়ে, ওপরে পা তুলে ভ্যাক ভ্যাক করে হাসতে ইচ্ছে করছে। আমি আবার অনশন ধর্মঘটও করেছি! কলেজে সেটাই আমার লাস্ট ইয়ার। বুঝেছিলাম, ডিগ্রি কোর্স-এর ডিগ্রি ডিঙনো আমার দ্বারা আর কোনদিনই হবে না। পড়ে-টড়ে পাশ করা, ওতে অরুচি। পড়লে কী হবে, মনেই থাকতো না। আর মনে না থাকার দোষ কী। কলেজে তো ধূমধাড়াক্কা রোজই লেগে ছিল। আজ এই কাল সেই, আর আমি তো দলের পাণ্ডা। এই যে আমি, এখনকার আমি, যাকে সবাই সুখেন গুণ্ডা বলে, তার হাতেখড়ি কলেজেই। দলাদলি আর মারামারি, তখন থেকেই, তা বলে, সবাই কি আর আমার মত গুণ্ডা হয়েছে। আমিই হয়েছি। আমার তখন সেটাই নেশা, কলেজের মাস্তান। আমার দলের বন্ধুরা আমার মাস্তানি খুব ভালবাসতো, আমি

তাদের হিরো—স্‌সাহ্‌ হিরো ছিলাম! চা সিগারেটের ভাবনা ছিল না, যখন যার কাছে চাইতাম, সে-ই খাওয়াতো! চাইবারও দরকার ছিল না, নিজে থেকেই খাওয়াতো অনেকে।

ও সবে আরো নেশা ধরে গিয়েছিল, স্যারদের জন্যে। বাইরে থেকে টের পাওয়া যেত না, কিন্তু ওহরে বাবা, আমাদের দলাদলির মধ্যে ওরা ছিল সর্ষের মধ্যে ভূতের মতন। অথচ সামনাসামনি স্যারেরা এমন থাকতো, হেসে গলে, 'এই যে কেমন আছেন ভাই যশোদাবাবু '—আর যশোদাবাবু অমনি, আর বলেন কেন বেণীবাবু, শরীরটা কিছুতেই.... এই রকম সব কথা বলতো, কিন্তু ভিতরে খোঁজ নিয়ে দেখ, একেবারে হিন্দুস্থান পাকিস্তান। দিনরাত্রিই হুঙ্কার দিয়ে আছে। লড়তাম তো আমরা। যশোদাবাবু আমাদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে কথা বলতেন, চা খাওয়াতেন, স্‌লা পরামর্শ দিতেন, চান্স পেলে কলেজেই দু-এক কথা ফিসফিসিয়ে বলে দিতেন। আর রেগে গিয়ে কখনো বলতেন, 'ওদের মেরে ঠাণ্ডা করে দাও তো।'

আবার কী চাই। স্‌সাহ্‌ যশোদাবাবু বলেছেন। তা ছাড়া, লম্বরটা মারতে হইবে তো। যশোদাবাবুর সাবজেকটে কোনদিন ফেল করিনি। আর কপালে থাকলে ফাইনালের সময়, যশোদাবাবুকে যে ক'দিন ইনভিজিলেন্সে পাওয়া যেত, সে ক'দিন মার কাটারি। ঝেড়ে যাও বাওয়া, এমন দিন কি হবে মা তারা! তেমনি আবার বুনো ওলের বাঘা তেঁতুল, যদি বেণীবাবু খচ্চরটা পড়ে যেত, সবাই তো যে-যার কোল সামলাচ্ছে। আমাদের যেমন যশোদাবাবু, অন্যদের তেমনি বেণীবাবু। এই দু'জন না খালি, দলাদলিতে অনেক স্যারেরাই ছিল। দল ছাড়া, স্যারদেরও উপায় নেই। সব স্যারেরাই দল করে। পিছনে স্যারেরা আছে, স্যারেরা খাতির করছে, ওটা অনেকটা খুঁটির জোরের মতন। লেগে যাও বাবা। আমার তো আবার একটু বেশী খাতির ছিল, কেননা, ঝাঁপিয়ে পড়লে, আমার আবার মিনমিনানি ভাল লাগে না। এসপার নয় ওসপার। সেইজন্যেই বন্ধুদের কাছে বল, আর স্যারদের কাছে বল, আমার খাতিরটা একটু 'ইসপেশাল'।

পালটা গ্রুপের মধ্যেও দাঙ্গাবাজ ছোঁড়া ছিল। তার মধ্যে তো এখন একটা আমারই সাকরেদ হয়ে গেছে, শুটকা যার নাম। স্‌লার নাম দেখ দেখি, ডাকনাম আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। ছেলেবেলাতে নাকি খুব শুটকো ছিল। আর এখনই বা কী হয়েছে, নধর গোপাল? না, ওকে গাল দেব না, আমার দলের লোক, আমাকে গুরু বলে ডাকে পালটা গ্রুপ দু'বার আমার মাথা ফাটিয়েছিল, দু'বারই সেলাই দিতে হয়েছিল। কিন্তু ওদের সাতটার মাথা ফাটিয়েছি। ঝাঁপিয়ে পড়লে আমার পেছন টান ছিল না। অথচ আমি যে আগের থেকেই হাতা গুটিয়ে থাকতাম, তা না। কী যে স্‌সাহ্‌ আমার ভাল লাগতো, তা জানতাম নাকি। জানতাম, পড়তে হবে, পাশ করতেই হবে, তারপরে তুমি চুল ছাঁটো গিয়ে বা ঘাস কাটো গিয়ে। মাইরি, আমি সত্যি কিছু বুঝতেই পারতাম না, কেন পড়ছি, কেন পাশ করতেই হবে, আর আমি কী হব! তা-ই কলেজের রঙবাজী বেশ লাগতো। ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং, নানান কথা শুনতাম। বুঝতে পারতাম, ওসব আমার দ্বারা হবে না।

বড়দা কেন ব্যবসায়ী হয়েছিল, মেজদা কেন চাকরী করতে গিয়েছিল, তাও যেমন বুঝতাম না, নিজেরটাও তেমনি বুঝতাম না। বাড়িতে আসছি, খাচ্ছি-দচ্ছি—মা তো ছিলই না, বাবা তখনো রিটায়ার করেনি, বরং একটা নেশা মরে গিয়ে, মায়ের কথা বলছি, বাবা কেমন একটু নেতিয়ে পড়েছিল। তবে সেটা টের পাওয়া যেত না তখন, ঘুষ ত্যালানি সমানই চলছিল, কাজ নিয়ে আরো ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তখন অবিশ্যি আমাকে একটু কাছে টানবার চেষ্টা করেছিল। কাঁচকলা! আমার ওসব ভাল লাগলে তো। মা মরে যাবার পরে, তবু যা হোক, কিছুদিন ডাকলে কাছেপিঠে যেতাম। একটু বড় হয়েই ওসব আর ভালো লাগতো না। তুমি থাকো গিয়ে তোমাকে নিয়ে, আমি আছি আমাকে নিয়ে। কী দরকার বাবা জ্বালাতন করবার। বড়দাটা একটু অন্যরকম ছিল, বাবার সঙ্গে কেমন যেন ওর একটু পোট খেত। মেজদার আবার অত না। অথচ একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, বড়দা যে বাবার কাছে গিয়ে বসতো, কথা বলতো, যেন ও কতই হোমরা-চোমরা দিগগজ হয়ে উঠেছে, সত্যি বড়দাটা

বরাবরই কীরকম, সাধু চোর হলে যেমন হয়, সেরকম মনে হত, কিন্তু বাবা ওকে সেরকম ঠিক আমল দিতে চাইতো না। ও ভারী ভারী গলায় পাকা কথা বলে যেত, আর বাবা, যেন শুনছেই না, ঠিক যেন বাবার কোন একটা ফ্যালসা সাবরডিনেট, স্যার স্যার করেই যাচ্ছে, আর বাবা নিজের মনে অন্যদিকে চেয়ে হুম হাম দিয়েই যাচ্ছে। যেন বাবা ভাবছে, 'আরে সে তো অনেক শুনেছি, কিছু আমদানি-টামদানি ঘটছে? অনেক সময় যেমন শুনতে পেতাম, সেই যে ওভারসিয়ার না কী, বোস না ঘোষ, শেয়ালের মতন চেহারা, স্‌সাহ্‌ কথাও বলতো যেন হুঙ্কাহুয়া করে, স্যার ওরা বলছিল, ব্যবস্থার কিছু এদিক ওদিক হবে না, বরাবর যা হয়ে এসেছে, সে তো হবেই, কিছু না হয় বেশীই ব্যাস, ফাদারের অমনি ভুরু টান হল, কোঁচকালো, তারপরে মুখ তোলা হল, 'অ, তাই নাকি।'

ওসব রমজানি অনেক দেখেছি, কারণ বাড়িটা তো ছোটোখাটো একটা অফিসই ছিল। বাবা থাকলে লোকজন সব সময়েই থাকতো। তবে সেসব হত কোন কারণে অফিসে না যেতে পারলে বা শরীর খারাপ হলে। মা মরে যাবার পর অফিসের কাজকর্ম বাড়িতে আর বিশেষ হত না। তা-ই বলছি, বাড়িতে আসছি যাচ্ছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি, আবার বেরুচ্ছি। তখন দলের বন্ধুবান্ধব নিয়ে থাকা ছাড়া করবারই বা কী ছিল। বড়দা মেজদা বাড়িতে থাকলে, ওরা নিজেদের ঘরে নিজেদের বন্ধুদের নিয়ে থাকতো। নয়তো একলা একলা। কাছাকাছি হলে দু'জনে তর্ক আর ঝগড়া। দলের ঝগড়া, এ বলে ওকে দালাল, ও বলে একে দালাল। আমাকে আবার দু'জনেই দু'জনের দলে টানবার চেষ্টা করতো, করছে এখনো, করেও যাবে। বড়দা যে ব্যবসা করে, আর মেজদা যে চাকরি করে, যেন সেসব আসলে কিছুই না। রাজনীতিটাই ওদের আসল কাজ! কলেজেও তো ওদের দল ছিল। ওরা সেই কলেজেরই ছাত্র ছিল, আর কলেজ থেকেই ওরা প্রথম ঝগড়া করতে আরম্ভ করেছিল। আর এখন তো এই শহরে, ওরা দু'জনে দুই দলের নেতা। ওরা যখন কথা কাটাকাটি করে, আমি তখন ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলি, "নারদ নারদ, লেগে যা, লেগে যা।'

অমনি ওরা আমার ওপর চটে ওঠে, দু'জনেই চীৎকার করে গালাগাল দেয়। একজন বলে, 'তুই তো একটা মূর্খ। আর একজন বলে, 'একটা গুণ্ডা।' 'একটা লম্পট।' 'একটা মাতাল।' আমি বলি, 'আর তোরা কী?' আসলে বয়স তো আমার থেকে কারুরই খুব বেশী না। বড়দা আমার থেকে সাড়ে তিন বছরের বড়। ও বলে চার বছরের। মেজদা বছর দুয়েকের। তা, আমার কলেজে পড়ার সময়, বাড়িতে প্রায় কেউই থাকতো না। আমার বাড়িতে ঢুকতেই ইচ্ছা করতো না। যতক্ষণ বাড়িতে থাকতাম, লেখাপড়া-টড়া করার জন্যে, বা যে কোন কারণেই হোক, আমার যেন সবই কেমন আলাদা আলাদা ছাড়া ছাড়া লাগতো। কথা নেই, যাঃ স্‌সাহ্‌, অসময়ে ঘুমোতে আরম্ভ করে দিলাম, নয় তো, রান্না হতেই খাবারের জন্য চীৎকার চেঁচামেচি, না পেলে ঠাকুরের পেছনে লাগা, ঝিকে গালাগাল দেওয়া। কী যে করব ঠিক ভেবেই পেতাম না। অনেকদিন এমনও মনে হয়েছে, ঘরদোরগুলো সব অগোছালো করে তছনছ করে দিই, বাবার টেবিলটা এলোমেলো করে রাখি, নয় তো ঘরের মধ্যে প্রস্রাব করে দিই। এসব যে একেবারে করিনি, তা না। বাবার সেক্রেটারিয়েট টেবিলের তলায় একদিন দিয়েছিলাম ছরছরিয়ে। ওহ, সে কী দুর্গন্ধ মাইরি। বাবা তো নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। আর কী চীৎকার, বাড়িটা ফাটিয়ে ফেলে আর কী। কিন্তু সব ভ্যাবাচক ভ্যাবাগঙ্গারাম হয়ে গিয়েছিল। কারণ এসব তো ভাবাই যায় না, কেউ এমন কাজ করতে পারে। আমি নিজেই তো অনেকবার ভেবেছি, "আচ্ছা, এই কাণ্ডটা করলাম কী করে। অবিশ্যি বাড়ির সকলের অবস্থা দেখে, বাথরুমে গিয়ে খুব হেসেছিলাম, উহ্রে সাবাস, কী হাসি আমার। তবু বাবার টেবিলের তলায় কী করে ওরকম একটা বিদঘুটে কাণ্ড করা যায়, আজও তা বুঝতে পারি না। অথচ ভাবলে, এখনো খুব হাসি পায়।

কিন্তু ওরকম, কোন কিছুর ঠিক নেই, সিনেমা দেখছি, চা-সিগারেট খাচ্ছি, আড্ডা মারছি, কলেজে যাচ্ছি, দলাদলি মারামারি করছি, মেয়েদের পেছনে লাগছি—কলেজটা কো-এডুকেশন তো। যেসব মেয়েরা আমাদের দলে ছিল, তাদের সঙ্গেও আড্ডা দিচ্ছি, দু তিনটে

স্পট ছিল, যেখানে গিয়ে একটু দিলালি করছি—প্রেম ঠিক বলা যাবে না, তখন আবার ওসব তেমন মনের মধ্যে জমে ওঠেনি। ওই আর কি, একটু সুহাগ যাকে বলে। তবে তার মধ্যে কয়েকজন ছিল, তারা রীতিমত হাত্তা চালাতো। দুটো জায়গা ছিল, সামনে চা আর খাবারের দোকান, ভিতরে অন্য ব্যবস্থা। ওখানে আবার দল বেঁধে নয়। পেয়ার পেয়ার। দোকানদারকে তার জন্যে কিছু মালকড়ি দিতে হত, ঘণ্টা কাবারি হিসাব। সেসব সকলের জানাজানি ছিল না। জানাজানি ছিল কেবল নিজেদের গুপের মধ্যে। সেসব জায়গা ছিল প্রেম করবার। তা ছাড়া দু'জনে দু'জনে সিনেমা দেখতে যাওয়া ছিল। সেটা একটু অসুবিধার ব্যাপার ছিল, শহরের মেলাই লোক, আর অনেকেই জানাশোনা। একবার তো, আমাদের গুপের একটা ছেলে আর মেয়ে সিনেমা হলে ধরাই পড়ে গেল। দু'জনে খুব মুচু মুচু চালিয়েছিল, আর দুটোকেই ধরে একেবারে প্রিন্সিপালের সামনে। স্‌সাহ্‌ রগড় কাকে বলে। ওরকম ব্যাপার ভাবতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে, এত ব্যাপার ঘটেছে। আর সিনেমায় না গেলে, গ্রামের দিকে মাঠে ময়দানে।

আমারও যে ওরকম দু' একটা জুটি জোটেনি, তা না। এখন ভাবলে তো আমার খুব অবাক লাগে, একটু-আধটু চুমো-টুমো খাওয়া ছাড়া কিছু করিনি। আসলে তখন আমার ঠিক সেরকম কিছু ইচ্ছা হত না। বোধ হয় যৌবনের ফুল ফোটেনি। সসত্যি? বল, ফোড় ওঠেনি। কিন্তু যা-ই হোক, মোটের ওপর তখন এরকম মাংস-খেকো বাঘ হইনি, এই কয়েক বছরের মধ্যেই যেরকম হয়ে উঠেছি। একবার খালি, অমিতা বলে একটা মেয়ে, স্‌সাহ্‌ আমন লিকলিকে, কালকুটি মেয়েটার নাম কোন বেয়াদপ যে অমিতা রেখেছিল, জানি না। যেমন তার খটং খটং চলা, তেমনি তার চিমসে পিছনের নাচানি। আমি নিজের কানে শুনেছি, শহরের রিকসাওয়ালাগুলো পর্যন্ত ধর ধর করে উঠতো। তার সঙ্গে একবার আমাকে দোকানের পিছনের ঘরে যেতে হয়েছিল। আহ্‌ একেবারে লিজ-এর মতন আমার মাথাটা বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। সুখেন ছাড়া সে কিছু জানে না, সুখেন ছাড়া বাঁচবে না। গৌর বিনা প্রাণ বাঁচে না, কী যন্ত্রণা....সেইরকম আর কী। ওর ওটা কী ভাই, বুক না তক্তা। অন্য জায়গার কথা আর নাই বা বললাম।

যাক্‌গে, তা-ই বলছি, এইসব করছি, বাড়ি আসছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি, তার মধ্যে দেড়শো টাকার মাস্টার মশাই ঠিক ছিল, ফাদারের সেদিকে নজর ছিল ঠিক, টাকা যতই লাগুক, খরচ করে ছেলেকে মানুষ করতেই হবে। একজন না, আবার দু'জন মাস্টার। কোথা থেকে টাকা আসছে, সে খোঁজে যেও না। মাস্টাররা ভাবছিল, চলুক চলুক, এমন দুধেল গাইয়ের মত ছেলে না থাকলে, চলে কেমন করে। বুঝতে পারছ তো? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? জবাব একেবারে রেকর্ড করা, "হ্যাঁ স্যার। ওদিকেও জবাব রেডি করা, 'ভেরি গুড? একেই বোধ হয় সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি বলে। আর ভাবতাম, বাবার টাকা আছে, আশা আছে, ছেলে ন্যাকাপড়া শিখবে, চালিয়ে যাও পানসি। এইসব মিলিয়ে আমার এক এক সময় কী রকম মনে হত, আমি যেন সেনস্‌-এ নেই। কীরকম একটা আলগা আলগা ভাব, গা ছাড়া, যেন হাওয়ার ওপরে চলছি। সত্যি, আমার সেরকমই মনে হত, কী করছি, কী করছি না, কিছুরই যেন ঠিক পাওয়া যাচ্ছে না। সেরকম অবস্থায় বাবার টেবিলের তলা যে নোংরা করে দেব, এ আর আশ্চর্য কী। আমার তো আরো অনেক কিছুই মনে হত। মনে হত, গোটা বাড়িটা চারিদিকে নোংরা করে দিই। বাবার টেবিলের কাগজপত্রে এমনভাবে আগুন লাগিয়ে দিই, যাতে কিছুতেই ধরতে না পারে, কী করে ওরকম কাণ্ড ঘটলো। না হয় মেজদার ঘরের বই-পত্র, বড়দার ঘরের দামী দামী জিনিসগুলো সব নষ্ট করে দিই। আমার তখন নিজেকে অনেকটা ভূতে পাওয়ার মতন মনে হত। সব সময়ে না, এক এক সময়। ওদের ওপর আমার কেমন একটা ঘেন্না ছিল, যেন ওরা যে যার নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত, দেশটা মাথায় করে চলেছে। হয় পড়ার কথা জিজ্ঞেস করবে, না হয় দু'জনে দু'জনের দলে টানবার চেষ্টা করবে। বড়দা চাইতো, কলেজে ওদের দলের ছাত্র গুপের সঙ্গে যেন আমি থাকি। মেজদাও তাই চাইতো। আমার অবিশ্যি কোন দলের ওপরেই কোন টান ছিল না। যেখানে আমার পোট

খাবে, মাস্তানি চলবে, আমি সেই দলেই যাব।

আমাদের কলেজে একটা সুবিধা ছিল। বড়দা মেজদাদের দল শহরের বেশ জোরদার হলেও কলেজে অন্য একটা দলের বেশ দখল ছিল। যশোদাবাবু আবার সেই দলের নেতা ছিলেন। কলেজে না, বাইরে। শুনেছি, সেই দলের তিনি বেশ হোমরাচোমরা, বাইরে সভা হলে বক্তৃতা করতেও দেখেছি। তবে যশোদাবাবুটিকে আমার কেমন একটু বেঁটে-সেটে মোটা মেটেরঙ দুমুখে ঢামনা সাপের মতন মনে হত। বয়স কত, পঞ্চাশ না ষাট, বুঝতে পারা যায় না। দাঁতগুলো সব নকল ঝকঝকে শাদা! কালো মুখটা ছিল আবার পাউরুটির মত ফুলো ফুলো। দেখলেই মনে হত, লোকটার রোগের শেষ নেই, আমাশা ডায়াবেটিস, তার ওপরে সব থেকে বেশী ছিল রগচটা গোছের। কিন্তু সেসব আমাদের সঙ্গে, যেন সব সময়ে একটা খেচোরাম ভাব। আমার মনে হত, ওসব লোকটার চালাকি, আমাদের কাছে খুব বড় কিছু একটা সাজবার চেষ্টা। সেই সেই যে বলে না—ধুত্তেরি, কথাটা যে কী—হ্যাঁ, যেন একটা জীনিয়স। আঙুল তুলে তুলে, ধবধবে শাদা কৃমি কৃমি রঙ চোখ পাকিয়ে গলার শির ফুলিয়ে খালি লেকচার মারতো। কিন্তু এমনভাবে আমাদের বুদ্ধি দিত, যেন আমরা কলেজে দুটো দলকেই এলিমিনেট করে দিতে পারি। তিসরি দল যাকে বলে, আমি ছিলাম সেই দলের, আর কলেজের দলাদলিতে, আমাদের দলটাই ছিল ভারী। আমি হয়তো অন্য দলেও যেতে পারতাম, দু একবার যে বদলাবদলিও করিনি তা নয়, তবে বড়দা মেজদার দলে আমার কিছুতেই যেতে ইচ্ছা করতো না।

আমি ওসব দল-টল জানি না, ওদের দু'জনের চরিত্তির তো আমার জামা ছিল। তা ছাড়া, সত্যি বলতে কি, ওরা আমার ওপর খবরদারি করবে, নেতাগিরি ফলাবে, এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারতাম না। দিনরাত্রি লঙ্কা ভাগাভাগি, আর স্‌সাহ্‌, গায়ে ল্যাংটা—মানে ওরা আসলে মানুষ যে রকম, চিনি তো, অথচ যেন কী একেবারে হ্যাট-কোট গায়ে দিয়ে চলেছে, সেরকম একটা ভাব, আমার দুচক্ষের বিষ। আমি বুঝতেই পারি না, কেন ওরা দল করে, আর ওসব বলে। দল যাই হোক, তোরা নিজেরা কী, তাই দ্যখি। কিন্তু কে বলবে, ল্যাংটা হয়েও যে বলবে আমি বেশ পোশাক-আশাক পরে সভ্য ভব্য আছি, তাদের কিছু বলবার নেই। ওদের আমার সেইরকম মনে হয়।

যশোদাবাবুটিও তাই। তবে তিনি তো আমার দাদা নন, তাই মাস্তানি করতে হল, সে দলে থাকাই আমার ভাল। কিন্তু ও লোকটারও একটা ব্যাপার আশ্চর্য, একেবারে গালাগাল দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, খচ্চরটার নটা ছেলেমেয়ে, মাইরি। স্‌সাহ্‌, রাগের চোটেই করেছে, নাকি সেই প্যানতাখ্যাচা বউটাকে লেকচার দিতে দিতেই এই কাণ্ড করেছে, কে জানে। ন'টা ছেলেমেয়ে! সেই পাউরুটি মার্কা ফুলো ফুলো মুখে, বাঁধানো দাঁতে, কৃমির মতন শাদা রক্তশূন্য চোখে দলাদলির প্যাঁচ-পয়জার কষে, আর কী করে সম্ভব! এখন তো বুঝতে পারি, মাস্তানি যে আমি ভালই পারি, তাই জেনে আমাকে সবসময় তোয়াজ করতো। বড়দা, মেজদার রোয়াবির থেকে, যশোদাবাবুর ত্যালানিই আমার ভাল লাগতো। সেজন্যেই বাড়িতে দাদাদের সঙ্গে আমার কোনরকম মিল ছিল না। আমাদের কারুর সঙ্গেই কারুর মিল ছিল না, আমরা সব টুকরো টুকরো, ছেঁড়া ছেঁড়া, অথচ আমরা এক মায়ের পেটেই জন্মেছিলাম। ওই পেটে জন্মানো পর্যন্তই, কেউ কারু না। বাবাও তাই ছিল। বাবা একটা লোক, বড়দা একটা লোক, মেজদা একটা লোক, আমি একটা লোক। সব যে-যার আলাদা, যে-যার নিজেকে নিজেকে নিয়ে আছে। স্‌সাহ্‌, আমার এইটা বয়ে গেছে, ঠিক এরকম আমার মনে হত। সুখেন তোদের মুখে ইয়ে করে দেয়, এরকম মনে হত। কেউ ঘুষ ত্যালানিতে মজে আছে, কেউ দল আর রাজনীতি করছে, আর আমি যা ইচ্ছা তাই করছি। তারপরেও যে আমি সকলের ঘর নোংরা করিনি, জিনিসপত্র নষ্ট করিনি, সেটাই তো যথেষ্ট।

এক একদিন, আমার মাইরি, কী রকম ভয় করতো। এখন ভাবলে খুব হাসি পায়। হয়তো দুপুরবেলা একলা ঘরে বসে আছি, হঠাৎ আমার গায়ের মধ্যে কীরকম করে উঠতো। বুকের ভিতরটা গুরগুর করে উঠতো, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতো। যেখানে বসে থাকতাম, সেখান

থেকে উঠতে পারতাম না। মনে হত, উঠলেই কেউ আমাকে ঘাড় মুচড়ে দেবে, চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। কেন এরকম মনে হত, আমি জানি না। হাতে পায়ে কোন জোর থাকতো না, আর বুকের কাছে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে উঠতো, চোখ থেকে যেন জল এসে পড়তো, অনেকটা কান্নার মতন। অথচ আমি সবই দেখতে পেতাম, শুনতে পেতাম, বাড়ির বাইরে লোকজন চলাচল করছে, পিছনের একটা আমবাগানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করছে, মেজদা হয়তো একটা ঘরে আমাদের ঝিয়ের ষোল-সতর বছরের মেয়েটাকে সেইসব করছে—আমি কয়েকদিন দেখেছিলাম কিনা, ফ্রক পরা ধুমসো বেঁটে ভোঁদকা, জন্তুর মতন চোখ, আর পায়ে মেলাই কালো কালো লোম মেয়েটাকে মেজদা গায়ের এখানে ওখানে খামচে খামচে আদর করছে, আর মেয়েটা তাড়কা রাস্ফুসীর মত হাসছে, অথচ লজ্জা লজ্জা ভাব। ওদিকে ঝি চাকর ঠাকুরদের কথাবাত কাজকর্ম, সবই দেখতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি, বুঝতে পারছি। অথচ আমার হঠাৎ কেমন একটা ভয় করে উঠতো, আর গায়ের মধ্যে থরথর করতো, মনে হত, সেই একটা লোককে দেখেছি, যে মুচ্ছে না মিরগি রুগী বলে হঠাৎ পড়ে গিয়ে, অজ্ঞান হয়ে যায়, মাটি খামচে ধরে, মুখ দিয়ে গাঁজলা উঠতে থাকে, আমার যেন সেইরকম হবে।

তখনই আমি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতাম। জোরে হাত পা ছুড়ে ঘরের মধ্যে দৌড়ে লাফিয়ে এমন জোর চীৎকার করে উঠতাম, গোটা বাড়িটা হকচকিয়ে উঠতো। ছুটে ঘরের বাইরে গিয়ে, একেবারে আমাদের বাগানের মধ্যে চলে যেতাম। তখনো যদি মনে হত, ভিতরে সেই ভয়ের ভাবটা আছে, তা হলে এদিকে ওদিকে ইট ছুড়ে, গাছপালা মুচড়ে, একটা যা-তা কাণ্ড করতাম। ততক্ষণে ঠাকুর চাকর ঝি, সবাই ছুটে আসতো। কেউ বারান্দায় দাঁড়াতো, কেউ বাগানের কাছে। চেঁচিয়ে বলতো, 'কী হচ্ছে কি, অ্যাঁ? ছোট খোকা, তুমি চন্দরমল্লিকের গাছটা ছিঁড়ে ফেলবে, বাবু কী রকম রাগ করবেন জান?'

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়তাম। পিটপিট করে সকলের দিকে তাকাতাম। আমার ভিতরের ব্যাপারটা ততক্ষণে কেটে গেছে। কিন্তু ওদের কাউকে সে কথা বলতে পারতাম না। ওদের বলব কী, আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারতাম না, সত্যি সেরকম কিছু হয়েছে, তাই খুব জোরে হো হো করে হেসে উঠতাম। আর ওরা সব নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচায়ি করতো। বুঝতে পারতাম, চোখে চোখে চেয়ে, ওরা নিজেদের মধ্যে মনে মনে বলাবলি করছে, 'দেখছো, কী রকম বদ ছেলে। কথা নেই, বার্তা নেই, কী রকম বদমাইশি জুড়েছে। আমি কিন্তু খুব জোরে হাসতেই থাকতাম, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওদের দিকে চেয়ে কাঁচকলা দেখাতাম। ঝি হয়তো বলতো, 'ছি ছি ছোট খোকা, কী করলে বল তো?'

আমি ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলতাম, 'বেশ করেছি! আরো করব।'

সে কথা শুনে ওরা যেন অবাক হয়ে যেত। ঝি বলতো, 'তুমি এত বড় হয়েছ, তোমার কি এসব ভাল দেখায়। বাবু কী বলবেন বল তো'

আবার কাঁচকলা দেখাতাম, বাবু আমার এই করবে! কিন্তু তখন আমি কিছুতেই ঘরের দিকে যেতাম না। পুরনো চাকর শুলা অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো। ওকে আমি আমার জন্মের পর থেকেই দেখে আসছি। ও প্রায় বাবার সমবয়সী, আমরা শুলাদা বলে ডাকি। এই রকম নামের মানে কী, তা জানি না বাবা। শুটকার তবু একটা মানে বুঝি, কিন্তু শুলা যে কারুর নাম হতে পারে, এ আমার মাথায় কিছুতেই আসে না। যতদিন জিজ্ঞেস করেছি, 'আচ্ছা শুলাদা, তোমার নাম শুলা কেন,' কোনদিনই সে ঠিক জবাব দিতে পারেনি। খালি বলে, 'নামে কি এসে যায় গো। ওইসব ওগো হাঁগো নাগো খুব বলে সে। আমি বলতাম, 'নামে যদি কিছু না আসে যায়, তবে তোমার নামের আগে একটা আর বসিয়ে দাও শুলাদা। শুলাদার সেদিকে খুব বুদ্ধি, বলতো, 'আরশুলা বলছ? তাও হতে পারে। লোকের নাম মাছি হয়, তাও শুনেছি গো। কেন, ব্যাঙ নাম শোন নাই, পাশের বাড়ির চাকরটার নাম তো ব্যাঙ? তখন আমার আবার অবাক লাগতো, সত্যি এরকম অদ্ভুত নাম মানুষের হয় কী করে। জিজ্ঞেস করতাম, 'আচ্ছা এরকম নাম কেন রাখে?'

শুলাদা বলতো, 'কেন আবার, ছেলেপিলে বেশী হলে, তখন বিরক্ত হয়ে লোকে ওরকম নাম রাখে। মাছি যেমন ঝাঁক বেঁধে জন্মায়, ব্যাঙ যেমন গাদা গাদা জন্মায়, সেইরকম। ভাবে, ওরকম একটা নাম রাখলে, আর ছেলেপিলে জন্মাবে না। আবার দেখতে খুব ছোটখাটোটি হলেও মাছি নাম রাখতে পারে, ব্যাঙ ব্যাঙ দেখতে হলেও ব্যাঙ নাম রাখতে পারে।'

এই রকম সব জবাব দিত। পরে আমি যখন বড় হলাম, তখন শুলাদাকে বলতাম, 'তোমার নামের শু-এর উ-কারটা কেটে দিয়ে একটা আ-কার করে দিলে বেশ হয়। শুলাদা একটু-আধটু লেখাপড়াও জানতো। প্রথম, দ্বিতীয় ভাগ পড়া ছিল, তাই মনে মনে একটু ভেবে, হেসে বলতো, 'শালা বলছ? তারপরে আবার হাসতো, হি হি করে হেসে বলতো, 'লেখাপড়া শিখে খুব পাজী হয়েছ। তা বলে আমি কোনদিন শুলাদাকে শালা বলে ডাকিনি, ফাজলামি করার জন্যেই বলতাম। ওর মোটা কালো গলায় কণ্ঠী আছে, তুলসী না কাঠের মালা বলে, সেই জিনিস, আর ওর চোখগুলো ঠিক গরুর মতন। গরুর মতন বড় বড়, চাউনিটাও যেন সেইরকম। অথচ গরুর চাউনি দেখলে যেমন গায়ে লাগে না, ও তো দুটো গরুর চোখ, কিছুই বুঝতে পারছে না, শুলাদার ঠিক সেরকম না। সে আমার দিকে চেয়ে থাকলেই মনে হত, সে যেন আমার ব্যাপারটা ধরে ফেলবে। তাই আমি তার দিকে বেশী তাকাতাম না। তা ছাড়া ছেলেবেলা থেকে ও আমাকে এত বেশী কোলে পিঠে করেছে, মনে হয়, আমার নাড়িনক্ষত্র জানে। আমার দিকে চেয়ে থেকে সে বলতো, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি গো ছোট খোকা, অ্যাঁ, বল তো। আমি বলতাম 'তোমার মুণ্ডু হয়েছে।' তারপরে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে, কোথাও চলে যেতাম! আমি জানি, ওরা ভাবতো, আমি ভীষণ পাজী নচ্ছার আর একগুয়ে হয়ে উঠেছি। সবাইকে খালি জ্বালাতন করতে চাই। তেএঁটে বদমাইস হলে যা হয়, সেরকম আর কী। অথচ ব্যাপারটা কাউকে বলতে পারতাম না, বোঝাতেও পারতাম না, আর আমি এমনিতেও ছটফটে দুরন্ত ধরনের ছিলাম তো, একটু হাত পা ছোঁড়া মেজাজী, ঠিক কিছুই যেন মনের মতন হত না, সকলের ওপরেই কী রকম একটা রাগ রাগ ভাব। তাই সবাই ভাবতো, আমি খালি বদমাইসি করছি।

কিন্তু মেজদা বা বড়দা—বড়দা তো তখন বেশ তুখোড় খচ্চর হয়েছে। মেজদাটা ভিন্ন জাতের, হ্যাংলা কুকুরের মতন, যা পায় তাই খায়। না হলে ঝিয়ের সেই মেয়েটাকে কেউ খামচে আদর করে! বড়দার আবার অন্যরকম, তখন ও মাঝে মধ্যে ধুতি পাঞ্জাবী পরে, আর চেহারাটা তো খানিকটা মেয়েমানুষ মার্কা, আর মেয়ে বন্ধু ওর বিস্তর। কী জানি মেয়েলি ধরনের চেহারা ফরসা সুন্দর, নরমনরম মিষ্টি হাসি, ছাল ছাড়ানো আলুসেদ্ধর মতন পুরুষ দেখলে মেয়েদের এত খাই-খাই ভাব হয় কেন। ওকে দেখলেই মেয়েরা কাত। আমার তো ধারণা, বড়দার মতন ছেলেকে নিয়ে মাখামাখি করবে কাবুলের মতন পুরুষেরা। জানি না, ছেলেবেলায় সেরকম কোন পুরুষের পাল্লায় কোনদিন পড়েছে কিনা—পড়েনি কী আর! শহরে ওরকম অনেক ছেলেকেই আমি জানি। আমার তো ভাবলে কেমন গা ঘিনঘিন করে,

কিসের সঙ্গে কী। তা বড়দাকে দেখেছি, শুধু মেয়েরা না, অনেক বউ, যুবতী বিবাহিতারাও ওর কাছে আসে, আড্ডা দেয়। এত মেয়ের ধকল ও সামলায় কী করে, কে জানে। এদিকে তো ছোটখাটো নরম নরম মানুষটি দেখলে মনে হয়, ভাজার মাছটি উলটে খেতে জানে না। জানে না আবার! আমি নিজের চোখে দেখেছি নন্দ ডাক্তারের মেয়ে কৃষ্ণাকে ওর ঘরের মধ্যে ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে চুমো খাচ্ছে। কেন, শুধু তাই কেন, কলেজের লেকচারার রামকেষ্টবাবুর নতুন বিয়ে করা বউকে—বেশ সুন্দর বউটা, লেখাপড়াও ভালই শিখেছে, তার ওপরে জ্বলজ্বলে সিঁদুরের দাগ, সিঁথেয় আর কপালে, তাকে নিয়ে বেলেল্লাপনার আর বাকি রেখেছে কি! বড়দার সবই বড় বড়, ওসব বাজে মেয়েটেয়ের ব্যাপারে নেই। শহরের বেশ ভাল ভাল ঘরের মেয়েদের সঙ্গেই ওর আশনাই, সেখানেই ওর যাতায়াত। সে সবই ওর রাজনীতির দলের ব্যাপার, সবাই ওদের দলে আছে।

তবু যে কেন বড়দা বল, মেজদা বল, শিখার পেছন ওরা ছাড়ছে না, বুঝতে পারি না। যাই হোক, বড়দা বা মেজদা, যে-ই বাড়িতে থাকুক, আর তখন যদি সেই ভুতুড়ে ধরনের ভয়ে আমি ওরকম করে উঠতাম, তা হলে ওরা কী মনে করত, তাও আমি জানি। ওরা ভাবতো, খচ্চরটা আমাদের পেছনে লাগবার জন্যেই এরকম করেছে। সেটা বুঝতে পারতাম, পরে ওদের ব্যবহারে। পারে তো আমাকে ছিঁড়েই ফেলে বড়দা অবিশ্যি কথা বলতো না, ভাবটা করতো যেন কিছুই হয়নি, যে ভাব দেখলেই মনে হত, ও যেন ঠিক মায়ের মতন করছে, মা যেমন বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে সেরকম চাল চালতো বা মাকে দেখে যাদের নালানি-ঝোলানি গড়াতো, সেই শুয়োরের বাচ্চাগুলোর সামনে মা যেমন 'গায়ে লাগছে না' ভাব করে থাকতো, এইরকম আর কী। তবে বড়দা কথা বলতো না। ঘুঘু, যেন আমাকে দেখতেই পাচ্ছে না, এমনি ভাব। তার মানেই হল, 'শয়তান, পেছনে লাগবার জন্যেই ওরকম করছিলি তা জানি। মেজদার ব্যাপার আলাদা। মেজদা রেগে তাকাতো। যেন দাঁতে দাঁত পিষতো, আর তাই দেখে আমার হাসি পেত, আমি মিটিমিটি হাসতাম! হাসতে দেখলেই ও একেবারে খ্যাঁক করে উঠতো, মারব মুখে লাথি, হাসছিস কেন?'

আমারও ভিতরে ভিতরে রাগ হত, বলতাম, 'তুই রেগে রেগে তাকাচ্ছিস কেন?'

'তুই তখন ওরকম চেঁচিয়ে ছুটে বাড়ি মাথায় করলি কেন?'

'আমার ইচ্ছা?'

ও অমনি ঘুষি পাকিয়ে উঠতো, 'তোর দাঁত ভেঙে ফেলবো, লোফার কোথাকার। রাসকেল|'

ইচ্ছা করতো, আসল কথাটা বলে ফেলি। কিন্তু চোখে না দেখতে পেলে তো হবে না, প্রমাণ দিতে পারব না। অথচ গালাগাল শুনে সহ্য করতে পারতাম না। অনেক ছেলেবেলায় ওকে ভয়টয় পেতাম। বডড মারতো। কিন্তু ক্লাস নাইন টেন-এ উঠে অতটা আর ভয় পেতাম না। আর ওসব ঘটনাগুলো তখনই ঘটতো বেশী। আমিও মুখে মুখে বলে উঠতাম, 'ভাঙ তো দাঁত, তোরও চোখ গেলে দেব। তুই তো একটা লোচ্চা। বেশী বলবি তো সবাইকে চেঁচিয়ে যা-তা বলে দেব।'

বুঝতে পারতাম, গায়ে হাত তোলবার সাহস তখন আর ওর হত না। তবে একেবারেই যে মারামারি করিনি, তা না, আগে আগে হেরেই যেতাম। ওর সঙ্গে আমার শেষবার হাতাহাতি মারামারি হয়, কলেজের ব্যাপারে। ওদের দলের একটা ছেলেকে আমি মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলাম। মেজদা বাড়ি এসে আমাকে খুব তড়পেছিল, বলেছিল, রাস্তায় বেরুলে ওরা আমার মাথা ফাটিয়ে ছাড়বে। আমি তখনই ওর সঙ্গে রাস্তায় যেতে চেয়েছিলাম। আমারও রাগ চড়ে গিয়েছিল। ও আমাকে যা-তা গালাগাল দিয়েছিল, তারপরে তর্ক করতে করতে দুম করে এক ঘুষি বসিয়ে দিয়েছিল আমার থুতনির কাছে। মারতেই আমি ওর ওপরে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, এখন বুঝতে পারি, আমি যে এতটা ক্ষেপে যেতে পারি ও ভাবতেই পারেনি। একটার বদলে আমি অন্ততঃ গোটা আটেক ঝেড়েছিলাম ওকে। তাতে ওর চোখ ফুলে গিয়েছিল, ঠোঁটের কষে রক্ত বেরিয়ে পড়েছিল, ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে একটা টেবিল

উলটে পড়ে গিয়েছিল মেঝেতে। খেয়ালই ছিল না, বাবা বাড়িতে আছে। তখন বাবার রিটায়ার করবার আর মাসখানেক বাকী, তাও চার বছর একসটেনসনের পরে।

হয়তো লড়াইটা আরো হত, বাবা এসে চীৎকার করে দাঁড়াতেই আমরা দুজনে দু দিকে থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। দুজনেই হাঁপাচ্ছিলাম, আর মেজদার চোখের কাছে ভুরু ফুলে উঠেছিল, ঠোঁটের কষে রক্ত দেখা যাচ্ছিল, চোখ জ্বলছিল ধ্বকধ্বক করে। একবার আমার দিকে, আর একবার বাবার দিকে দেখছিল। আমি শুধু বাবাকেই দেখছিলাম, আর এক-আধবার মেজদাকে। বাবা চীৎকার করছিল, 'কী, হচ্ছে কি বাড়ির মধ্যে, অ্যাঁ? এসব কী ব্যাপার। তোরা মারামারি করছিস, এটা কি ভদ্রলোকের বাড়ি না?'

আমারও নিশ্চয় চোখ জ্বলছিল, আর মনে মনে বলছিলাম, 'আহ্, ভদ্দর লোকের বাড়ি!' মেজদা বলে উঠেছিল, 'আপনি জিজ্ঞেস করুন ওকে, কলেজে কী করে এসেছে। একটা ছেলেকে মাথা ফাটিয়ে এসেছে। আমি সে কথা বলেছি বলে, আমাকেও মারছে।'

মেজদার দিকে চেয়ে, ওর অবস্থা দেখে বাবা আমার ওপর ক্ষেপে উঠেছিল৷ বলেছিল, 'ইয়েস, আমি শুনেছি, এটা একটা গুণ্ডা হয়ে উঠছে, তোকে ও মেরেছে নাকি এভাবে?

মেজদা তখন অনেকটা কাঁদো কাঁদো, কষের রক্ত মুছতে মুছতে বলেছিল, 'হ্যাঁ।

বাবা তৎক্ষণাৎ চীৎকার করে উঠেছিল, 'দাদাকে এভাবে মারা? বেরোও, বেরিয়ে যাও তুমি বাড়ি থেকে। এ বাড়িতে থেকে ওসব গুণ্ডামি চলবে না। এত বড় সাহস, বাড়ির মধ্যে মারামারি!'

আমি বলেছিলাম, 'ওকে তো আমি আগে কিছুই বলিনি। ও-ই তো আমাকে আগে মেরেছে।

'আমি কোন কথা শুনতে চাই না, তুমি চলে যাও আমার চোখের সামনে থেকে। '

মস্ত বড় অফিসারটি গর্জন করে উঠেছিল, 'তারপরে দেখছি আমি, তোকে কী করে শায়েস্তা করা যায় ওসব আমি কিছু সহ্য করব না! বাড়িটাকে এরা একেবারে নরক করে তুলেছে। আমি প্রত্যেককে দেখব, আর প্রত্যেককে শাস্তি দেব!'

অথচ আমি ভেবেছিলাম বাবা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। অনেকবার আমার দিকে তাকিয়ে চীৎকার করেও এগিয়ে এসে গায়ে হাত দেয়নি। তাতে আমি একটু অবাক হয়েছিলাম। বাবা মারবে বলে আমি তো গা হাত পা শক্ত করে দাঁড়িয়েছিলাম। তবে তা দাঁড়ালেও আমার রাগ কমেনি। ভিতরটা আমার জ্বলছিল, ফুসছিল। বাবা গায়ে হাত দিলে অবিশ্যি আমি কিছু বলতাম না, কিন্তু আমার ইচ্ছে করছিল, মেরে ধরে ছিঁড়ে কুটে একটা তুলকালাম কাণ্ড লাগিয়ে দিই!

সেই সময়ে বড়দা এসে দাঁড়িয়েছিল, আর ও খুব ভালো মানুষের মত, বেশ ভারিক্কি চালে বলেছিল, 'এভাবে মারামারি করার কোন মানে হয়। ইস, নিকুর তো ঠোঁট কেটে রক্ত বেরুচ্ছে দেখছি।'

আমাদের তিনজনের তিনটি ডাকনামও ছিল। পিকু নিকু টুকু৷ জানি না, সেসব নামের উদয় হয়েছিল কেমন করে, কারণ শুলাদাকে কোনদিন জিজ্ঞেস করা হয়নি। তবে ওই শুলাদার কথাই ঠিক, নামে কী আসে যায়। বড়দার কথা শুনে, মেজদা আর একবার ঠোঁট মুছেছিল। কিন্তু ফিরে তাকায়নি। বাবাও যেন ফিরে যাবে বলে শরীরটাকে দোলাচ্ছিল, আসলে উত্তেজনায় সেরকম করছিল, আর বলেছিল, 'আমি আমার বাড়িতে এসব কিছুই সহ্য করব না। যার যা খুশি তা-ই করবে, আর এসব ছোটোলোকোমি, কিছুতেই টলারেট করব না। ইউ অল মাস্ট মেনটেইন দ্য ডিসিপ্লিন!'

বড়দা আবার সেই ভাবেই বলেছিল, 'কিন্তু বাইরের ব্যাপার এভাবে বাড়িতে টেনে আনা উচিত না। কলেজে যা ঘটেছে, ঘটেছে, সে সব নিয়ে বাড়িতে কথা বলার দরকার কী?'

তৎক্ষণাৎ মেজদা বলে উঠেছিল, 'হ্যাঁ, তুই তো সেকথা বলবিই। এখন তোদের দলের ছাত্ররা তো ওদের সঙ্গে কলেজে আমাদের বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়েছে। আমাদের কোণঠাসা করবার মতলব। তা-ই বড় গায়ে লেগেছে, কলেজের ব্যাপার বাড়িতে এসেছে বলে, খুব ইয়ে

দেখাচ্ছিস্।'

বড়দা বলেছিল, 'তা কেন—।'

বাবা চীৎকার করে উঠেছিল, 'শটি আপ্, চুপ কর সব। আমি কারুর কোন কথা শুনতে চাই না। ঘরে বাইরে বলে কিছু জানি না আমি। এ সবের মধ্যে কারুরই থাকা চলবে না, আই ডোন্ট লাইক অল দিজ ব্লাডি ফুলিসনেস্।'

কথাবার্তা সেই ঠিক অফিসের বড়কতার মতই, কিন্তু ফাদারকে সেই সময় আমার একটু অন্যরকম লেগেছিল, যে রকমটা ঠিক আগে আর দেখিনি। আগে ছিল, রাগ তো রাগই, তার মধ্যে আর কিছু নেই, বাঘটা গর্জন করছে আর ফুসছে! কিন্তু সেই ঝগড়ার দিনে একটু অন্যরকম, যেন রাগ তর্জন-গর্জন সবই ছিল, অথচ বাঘটা যেন দূরে কিসের শব্দ শুনছিল। এক এক সময় হয়-না, হাঁক-ডাক চলছে একদিকে, অথচ মন পড়ে আছে অন্যদিকে। কী বলে তাকে যে, ওই সেই, মানে আনমাইন্ডফুল। না কি, গজরাচ্ছে, অথচ গায়ের কোথায়, গলায় না পায়ে, কোথায় একটা কাঁটা ফুটে আছে, আর সেটা বারে বারেই খচ্‌খচ্ করছে, কে জানে স্‌সাহ্, কী ভাব বলে ওকে। মোটের ওপরে, ফাদারের রাগ ছাড়াও একটা অন্যরকম ভাব ছিল, যেন বড় অশান্তি লাগছিল। সেই পর্যন্ত বলেই চলে গিয়েছিল। আমিও তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম।

তবে, মেজদা বড়দাকে যা বলেছিল, সে কথাগুলো কিন্তু ঠিকই বলেছিল। ওদের দলটা তখন এমন একটা ভাব দেখাচ্ছিল, অনেকটা নিমরাজী ছুঁড়ির মতন। মুখে কিছু বলছি না, তবে যদি কিছু করতে চাও, চালিয়ে যেতে পার। মেজদাদের দলটার সঙ্গে যখন আমাদের বেশ গরমাগরমি ভাব, ওরা যেন ভর-হওয়া ঠাকুরের মতন হয়ে গিয়েছিল। কী জানি বাবা, তোমাদের যা করবার কর, আমরা ওসবের মধ্যে নেই। এর নাম ছেনলি। তার মানেই, বলতে চাইছিল, 'ওদের মেরে স্‌লা উড়কু উঠিয়ে দাও। আমরা নাক গলাবো না। এর নাম ওদের রাজনীতি আর দলাদলি। খচ্চর! তা না হলে, বড়দা যা রাম ঘুঘু, মুখ ফুটে একটি কথাও বলতো না। কেননা, উলটো ঘটনাও তো ঘটেছে। তখন আবার বড়দা গোঁসা করেছে। তবে ও তো মেজদার মতন ছিল না, বরাবরই একটু অমায়িকভাবের তাঁদড়। এখন অবিশ্যি ওদের দুজনেরই অনেক অদলবদল হয়েছে। দুজনের ব্যবসা চাকরি আর রাজনীতি, সব মিলিয়ে ওরা আগের থেকে এখন অনেক চালাক হয়েছে। তার মানে, দুজনেই অনেক ঘুঘু হয়েছে এখন। অথচ, লড়াই ওদের ভিতরে ভিতরে বেড়েছে, আর আমাকে নিয়ে টানাটানিও বেড়েছে। এখন আমার সঙ্গে দুজনেরই নরম গরমে চলে। বুঝতে পারি, ওরা দুজনেই চায়, আমি ওদের দলে ভিড়ে পড়ি। কখনো দুজনেই আমাকে ত্যালায়, রেগুলার কমপিটিশন লেগে যায় ওদের; আমি মনে মনে বলি, স্‌সাহু মালপাড়ার গোঁসাই তোমরা, দেশটা তোমাদের মালপাড়া, আর আমাকেও তাই ভেবেছ? যখন দেখে যে, কিছু হবে না, তখন গুণ্ডা বলে। অথচ গুণ্ডা বলেই আমাকে চায়। আমার তো আর কোন দল নেই। যশোদাবাবুদের দলটা তো এখন নিখাগীর মা হয়েছে। কোনরকমে নাম বজায় আছে, কয়েকজনের দল হয়েছে, বাততি সব নিভু-নিভু! জোরদার থাকলেও আমি আর থাকতাম না! কলেজ যখন ছেড়েছি, ওদের সঙ্গে সম্পর্ক কী!

যাই হোক গে, মোটের উপর মেজদা জীবনে সেই আমার গায়ে শেষবার হাত তুলতে এসেছিল। বুঝতে পেরেছিল, আমার সঙ্গে লাগতে এলে খুব সুবিধা হবে না। আর সেই একটা ধারণা ছিল ওদের, আমি ওদের পেছনে লাগি। সেই ভয় পেয়ে যখন ওরকম করে উঠতাম, আর তারপরে চেঁচিয়ে ছুটে দাপিয়ে একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুলতাম। শুধু ওরা কেন, বাড়ির ঝি ঠাকুর সবাই তাই মনে করতো। কেবল, কেন আমি জানি না, শুলাদাটা যেন একটু অন্য রকম ছিল। গাছ ফুল ফল ছিঁড়ে ফেললে, সে নিজের হাতে সব ঠিকঠাক করে রাখতো, যাতে ফাদারের চোখে কিছু না পড়ে। আর এও জানতাম, সে-ই সবাইকে সামলে রাখতো, যাতে আমার সেই সব বদমাইসির কথা বাবার কানে না যায়। সে আমাকে থেকে থেকে প্রায়ই বলতো, "তোমার কী হয় ছোট খোকা, তোমার কি মাথা খারাপ?

তা বলে, আমি কোনদিনই শুলাদাকে সে কথা বলিনি। আমি বুঝতে পারতাম, শুলাদা একটু অবাক হয়ে ভাবতো, ছোট খোকা বড় হচ্ছে, লেখাপড়া শিখছে, অথচ তার এরকম হচ্ছে কেন। ব্যাপারটার মধ্যে যে একটা অদ্ভুত কিছু আছে, সে খানিকটা আন্দাজ করতে পারতো। বুঝতে পারতো না কিছুই।

এ কথাও ঠিক, সেই এক রকমের ভয় পাওয়া, আর বুক গুরগুরিয়ে ওঠা, বুকের মধ্যে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া এক ধরনের যন্ত্রণা, চোখে জল এসে পড়ার ব্যাপারটা যে আমার খুব ছেলেমানুষি বয়সের তা না। তখন ক্লাস নাইন-টেনে উঠেছি, এমন কি যখন কলেজে প্রথম ঢুকেছিলাম, তখনো কয়েকবার সেইরকম হয়েছে, কথাটা ভেবে আমার সত্যি কান্না পেয়ে গেছে। বাথরুমে ঢুকে কেঁদেও ফেলেছি। আরো এইজন্যে যে, কাউকে বলতে পারছিলাম না, কেউ বুঝতেও পারছিল না, আর বললে বোধহয় বিশ্বাসও করতো না। তারপরেই অবিশ্যি রাগের চোটে আমার গা জ্বলে যেত। আমি নিজে নিজেই বলে উঠতাম, বয়ে গেছে আমার। কাউকে বলতে চাই না। আমার কাউকে চাই না, কারুক্কে আমার দরকার নেই। বাবা না, দাদাদের না, কারুক্কে না। সবাইকে আমি ইয়ে করে দিই ‘ কেউ কাছে থাকলে কখনো সেরকম ঘটতো না। যখনই হয়েছে, আমার একলা অবস্থায়। আমার মনে আছে, কীরকম অবস্থায় সেটা হত। হয়তো হঠাৎ বাইরের থেকে বাড়িতে এসেছি, ঘরে ঢুকেই মনে হল, আচ্ছা ইকনমিকস-এর নোটটা একটু পড়ে রাখি। বইটা খুলতে গেলাম, ভাল লাগলো না, দুম করে বাবার ঘরে চলে গেলাম। টেবিলের ওপরে একটা অফিসের কাগজ ফ্যাস করে খানিকটা ছিঁড়ে ফেললাম, বাবার মুখটা মনে পড়ে গেল, হাসি পেল, একটু ভয়ও হল; বেরিয়ে এসে বড়দার ঘরে গেলাম, ওর দলের নেতাদের ছবিগুলো দেখলাম দেওয়ালে, ভেংচে কাঁচকলা দেখিয়ে দিলাম; মেজদার ঘরে গিয়ে প্যাঁচ করে একটু থুথু দিয়ে দিলাম, অবিশ্যি যদি ওরা বাড়িতে না থাকে। তারপরেই মনে হল, আচ্ছা কিছু খাই, ভাবতে ভাবতে বাথরুমে গেলাম, প্রায় কুঁথিয়ে কুঁথিয়ে একটু প্রস্রাব করলাম, কারণ, পায়নি তো। তখন মনে হল, বাইরে রেস্টুরেন্টে গিয়ে কিছু খেলে কেমন হয়, আর ঠিক তখনই হয়তো সেই খারাপ একটা ব্যাপার করতে ইচ্ছা হল, বন্ধুদের কাছে শেখা, যেটা নিজে নিজেই করা যায়। ওটা তখন প্রায়ই ইচ্ছা হত, একলা থাকলেই কুকুরের নতুন গু খেতে শেখার মত। ব্যাপারটা সেরে হয়তো ছাদে গেলাম। আর তখনই জল তেষ্টা পেল, জল খেলাম। আর সেই সময়েই হয়তো একেবারে মোমেন্টে যাকে বলে, হঠাৎ একটা কীরকম ভয় করে উঠলো, আর বুক গুরগুরিয়ে....কোথা থেকে যে কী হয়ে যেত।

এখনো যে সে ভয়ের ভাবটা আমার একেবারে কেটে গিয়েছে, তা কিন্তু না। এখনো সেই গুরগুরোনিটা আমি মাঝে মাঝে টের পাই, তবে খুবই কম। কলেজের হৈ চৈ মারামারি উত্তেজনা মাথা ফাটাফাটি দলাদলি ওসব নিয়ে যতই মেতেছিলাম, ততই ব্যাপারটা কেটে যাচ্ছিল। ভাগ্যিস স্‌সাহ্ গুণ্ডা হয়েছিলাম, তা না হলে হয়তো সেটা কৃমির মতন লেগেই থাকতো। যেন ও ব্যাপারটাকে কাটিয়ে ওঠবার জন্যেই আমার একটা হুড়যুদ্ধ দরকার। যে কোন রকমেরই৷ এখনো মাঝে মাঝে যখন টের পাই, তখনই লক্ষ্য করে দেখেছি, হয়তো কোন কারণে মেজাজটা খারাপ, শরীরটা খারাপ, কিছু ভাল লাগছে না, কেমন যেন একটা ঝিম-ধরা ভাব, কিছুই করছি না, শিখার কাছেও যাচ্ছি না, ওকে গালাগাল দিচ্ছি মনে মনে, আর একলা একলা থেকেছি, তখনই হঠাৎ চমকে উঠলাম। মনে হয়, যেখানেই থাকি, ঘরে বাইরে দোকানে, সবখানেই, কী যেন একটা এসে হাজির হয়েছে। আমনি লাফ দিয়ে উঠে হেঁকে উঠলাম, ‘পেলে লেগে যা! এই সসিবে, সসুটকা!’

অমনি ওরা এসে হাজির হয়। যেখানেই হোক কাছাকাছিই তো থাকে। বাড়িতে থাকলে, ঝি চাকরকেই চেচিয়ে গালাগাল দিয়ে উঠি, দৌড়ে বাড়ির বাইরে যাই। মিছিমিছি চেঁচাতে চেঁচাতে যাই, “তোমাদের ডেকে পাওয়া যায় না, কোথায় থাক সব? তখন মনে হয়, যেন সত্যি সত্যি বলছি, সত্যি সত্যি ওদের কাউকে ডেকেছিলাম, কেউ শুনতে পায়নি। বাইরে থাকলে, অন্যরকম। ওইরকম চীৎকার করে ওদের ডাকি—ওরা এসে হাজির হলেই বলি,

'চল তো একটু মাল খেয়ে আসি।'

ওরা অবাক হয়ে বলে, 'সে কি রে স্‌লা, বেলা এগারটাতে মাল খাবি কী।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এখনই টানা যাক একটু, চল-না।'

ওরা হাসে, মজার মজার খিস্তি করে। একটু খেতে পাবার খুশিতেই যে আরো ওরকম করে, বুঝতে পারি, সময়ের জ্ঞান তো কত। কাকে গু খাবার আগে, ভোরবেলা পেলেই খেতে পারে, তারা আবার বেলা এগারটা দেখায় আমাকে। তবে ব্যাপারটা এমন আচমকা ঘটে, বলে, 'গুরুর যে কখন কি মতিগতি হয়, মাইরি বুঝতে পারি না। ' বলেই না শুধু, আমাকে নিয়ে ওরা একটু অবাক। আসল ব্যাপার তো বুঝতে পারে না, ভাবে, আসল গুণ্ডার ভাবভঙ্গি বোধ হয় সকলের থেকে একটু আলাদাই হয়!

এইভাবে মদ খাবার জন্যে ছুটতে গিয়ে হয়তো, হঠাৎ চোখে পড়ে যায়, কোন মেয়েকে দেখে, কোন রিকশাওয়ালা খারাপ কথা বলে ফুট কাটছে, অমনি ঠাস করে মারি গালে এক চড়, তারপরেই আর একটা ঘুষি চোয়ালে। খিস্তি করে বলি, 'সসাল্লা, ভদ্রলোকের মেয়েদের টিটকারি। সশহরে তোমার গাড়ি চালানোর বারোটা বাজিয়ে দেব আমি। খবরদার, আমার চোখে যেন কোনদিন আর না পড়ে।'

তার মধ্যে সাকরেদরাও হয়তো দু'চার ফাইট হাঁকিয়ে দেয়। লোকজন ট্রাফিক পুলিশ, যারা সবাই আমাকে চেনে, শহরের থানারই পুলিশ তো, আর রিকশাওয়ালারা এসে থামিয়ে দেয়। এক কাজে, দু কাজ হয়ে যায়। তখন কী যে করি বা করব, তা কোন শিবের বাবাও বলতে পারে না। ওরকম একটা কিছু করা তখন যেন আমার দরকার হয়ে পড়ে, মাইরি। আর সবাই অবাক হয়ে ভাবে, এরকম একটা কারণে আমি এত রেগে উঠতে পারি। শুধু অবাক কেন, রীতিমত প্রশংসা, যাকে বলে হিরোর দিকে চেয়ে দেখার মতন। অথচ জানে সবাই, আমার মত হাড়ে-হারামজাদা গুণ্ডা শহরে দ্বিতীয় নেই। সে কি না, কোন একটা মেয়েকে দেখে রিকশাওয়ালা কী বলেছে, তার জন্যে একেবারে লাল! আমি বলি, লে হালুয়া। লোকে বলে, অদ্ভুত তো!

লোকজনেরা সবাই রিকশাওয়ালাকে ধমকায়। এমন কি রিকশাওয়ালারা পর্যন্ত মার-খাওয়া লোকটাকে বলে, 'তোর স্‌সালা আঁখ নেই রে, স্‌সুখেনদার সামনে মজাকি মারতে গেছিস।' আমি তো আবার সকলেরই স্‌সুখেনদা। ভদ্র, অভদ্র, ছোট বড় অনেকেরই। আমি গা ঝাড়া দিয়ে বেরিয়ে আসি। কেবল সেপাইটাই একটু অন্যরকম করে তাকিয়ে থাকে। ঠিক কিছু বলতেও পারে না, অথচ আমার মাস্তানিটা সহ্যও হয় না। ওর তো ধারণা, মাথায় পাগড়ি আর গায়ে খাকি কুর্তা থাকতে, আর কেউ মাস্তানি করবে কেন। শহরে মাস্তান তো ওরাই। খালি পয়সায় রিকশা চাপছে, তা না হলেই পেটি কেসে ধরে নিয়ে গিয়ে ঠুকে দিচ্ছে, আশেপাশের দোকান থেকে যখন যা দরকার, ধারের নাম করে নিয়ে যাচ্ছে, আর কোনদিন দেবার নাম নেই; বাজারেও তাই—অবিশ্যি দোকানদার রিকশাওয়ালাদেরও দোষ আছে, তা হলেও মনে করে, ওসব ওদেরই একচেটিয়া। বাবা, কেলাস বোঝ না, তোমাকে আমাকে ফারাক করলে হয়। জানবে, আসল মাস্তান আমিই! যদি না জান, তবে আরো অন্য জায়গায় গিয়ে জিজ্ঞেস কর।

কিন্তু রিকশাওয়ালারা ওরকম কত করে, আমার বাপ-মা-মরা দায় কেঁদে গেছে কিছু বলতে। আমি কিছু ওসব চেয়ে দেখি না, বলিও না। কত বেচালবাজ ছুঁড়ি আছে, তাদের পোশাক-আশাক ভাবভঙ্গি চলাফেরা দেখলে, আমিই কি কিছু বলতে ছেড়ে দিই নাকি! রিকশাওয়ালাদের মতন বলি না, গলাটা একটু নামিয়ে হয়তো বলি, 'স্‌সটকা, ছুঁড়ির লেবেল খুলেছে মনে হয়।'

শুটকা তারও বাড়া, হয়তো জবাব দেয়, 'লেবেল মানে, সাফ হয়ে গেছে সব মাল |'

আমরা এরকমভাবে বলি, ওদের বলাটা অন্যরকম। সে সব কথা শুনলে, কানে তালা লেগে যায়, মাইরি! এমনই মোক্ষম বলে, তারপরে আর কথা চলে না। তা ছাড়া রিকশাওয়ালারা আমার আপন লোক, বিনা পয়সায় আমাকে চাপায়, পয়সা কড়ি না থাকলে

অনেক সময় কিছু দেয়ও। থানার বড়বাবুকে বলে অনেক সময় ছাড়িয়েও এনেছি। আমার যেমন বড়বাবুকে নিয়ে মাথাব্যথা, বড়বাবুরও তো তেমনি আমাকে নিয়ে মাথাব্যথা। কেউ কাউকে ডিসটাব করি না, খাঁটি ভদ্রলোকের চুক্তি ...তাই বলছি, সেই ভয়ের ভাবটা আমার এখনো যায়নি। তবে অনেক কম, আর কালেভদ্রে টের পাওয়া যায়। গেলেই ওইরকম কিছু করি। ওটা যে কী ব্যাপার, আমি কোনদিন তা জানতে পারিনি।

দু বছর, তারপরে আরো তিন বছর, পাঁচ বছরেও যখন ডিগ্রি কোর্সের গাঁট পার হতে পারিনি, তখন আমিই স্‌সাহ্‌, হাঁপিয়ে পড়েছিলাম। তখন আর কলেজের চার দেওয়ালের মধ্যে আমার আর তেমন জমছিল না। সেখানে দলাদলি মারামারি করতে করতে বাইরে একটা নাম ছড়িয়ে গিয়েছিল। তখন বাইরেও আমাকে ডাকাডাকি করতো। আর কলেজের যে দলটা আমার সঙ্গে থেকে মারামারি করতো, সেই দলটার অনেকেই আমার সঙ্গে থাকতো, অনেকেই আজও আমাকে ছাড়েনি।

সেই যা বলছিলাম, কলেজে সেটাই আমার শেষ বছর। কত বছর আর হবে। চার-পাঁচ বছরের বেশী না। সেবার কলেজের গর্ভনিং বডির বিরুদ্ধে আমরা সব দল কয়টা এক হয়েছিলাম। যেমন স্‌সাহ্‌, গভর্নিং বডি, গোটা তিনেক লোককে তো চিনতাম, শহরের সেরা ঘুঘু, চুরি ছিচকেমি, মেয়েমানুষের দোষ, কোন গুণে ঘাঁট নেই, বাইরে নিপাট ভদরলোক। ওদের বিরুদ্ধে আবার ভদ্রলোকের ছেলেরা আন্দোলন করবে, সে কথা ভাবলেও তো আমার গা ঘিন ঘিন করে! মন্ত্রী হয়, বড় বড় অফিসার হয়, তার না হয় একটা কথা আছে, তবু বোঝা যায়, হ্যাঁ একটা কিছু হচ্ছে। আর ওগুলো কী, বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা, মফস্বল শহরের একটা কলেজ পেয়েছে, তাতেই যতখানি কেরদানি আর কিছু গাঁড়া মারা যায়। লেগেছিল তিন চারটে ব্যাপার নিয়ে। একজন প্রফেসরকে তাড়ানো নিয়ে, সে আবার মেজদাদের দলের স্যার, আর কলেজের সামনে খানিকটা জায়গা ছিল, সেটি কোন কর্তার দরকার হয়েছিল, তাই অন্যদিকে মেইন গেট করা হবে, তার মানে, একটা সরু গলির ভিতর দিয়ে আমাদের অনেকখানি ঘুরে গিয়ে ঢুকতে হবে, আর কর্তাটি সেখানে একখানি বিল্ডিং হাঁকিয়ে কারবার করবেন, এমনি সব। আরও কী সব ছিল, আমার মনে নেই। আমাকে বলেছিল, হাঙার স্ট্রাইক করতে হবে। রাজী হয়ে গিয়েছিলাম।

তখন তো সব দল এককাট্টা। বড়দা মেজদা তো আমার ওপর খুব। খুশি। আমিও যে হাঙার স্ট্রাইক করব, এটা যেন ওদের একেবারে বিশ্বাসই হয়নি। মেজদা তো ভুরু কুঁচকে অবাক হয়ে বলেই উঠেছিল, ‘তুই হাঙার স্ট্রাইক করবি?’

ভারী খচ্চর ও, সব সময় নিজেকে বড় ভাববার তালে আছে। বলেছিলাম, ‘দেখে নিস।’

আবার বলেছিল, ‘একটা কেলেঙ্কারি করবি দেখছি।’

বলেছিল, কিন্তু গা জ্বালানো ভাবে বলেনি, যেন কতই দুশ্চিন্তা, আমার জন্যে যেন ওদের মহাযুদ্ধটাই পণ্ড হয়ে যাবে।

বড়দা বলেছিল, ‘পারবি তো?’

আমার বাবা এলেন! সব কথাতেই একটা ভারিক্কি ভাব, যেন কী একটা হয়ে পড়েছে। তবে এটা ঠিক, বড়দা তখন একটু একটু করে, ওদের দলের বেশ একটা চাই হয়ে উঠেছিল। ও যেন একটু গভীর জলে খেলে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু আমার রাগ হয়ে গিয়েছিল ওরা কথা শুনে। বলেছিলাম, ‘তুই পারবি?

ও এমন করে হেসেছিল, যেন আমি একটা কচি খোকা। অথচ ওর চোখের মধ্যে যে সব সময়ে একটা খারাপ মেয়েদের মতন চোরা হাসি লেগে থাকতো, বুঝতে পারতাম। যেন বেশ্যাটা সমাজের মধ্যে এসে পড়েছে, আর সকলের দেখাদেখি হরি হরি বলতে আরম্ভ করেছে। খারাপ কথা আমি জানি না! বলেছিল, ‘পারব মানে কী রে, কলেজে তো আমরাই ফাস্ট ব্যাচ, যারা হাঙার স্ট্রাইক করেছিল। আমিও তার মধ্যে ছিলাম।’

আমি বলেছিলাম, ‘তুই কি করেছিলি, না করেছিলি, সেসব আমি দেখতে যাইনি। আমি পারব কি না, সেটা গিয়ে নিজের চোখে দেখে আসিস।’

কলেজ গেটের সামনেই অনশন ধর্মঘটের ক্যাম্প হয়েছিল। পোস্টার-টোস্টার তো প্রচুর মারা হয়েছিল। তিনটে গ্রুপ থেকে, সবসুদ্ধ ছ’ জন হাঙার স্ট্রাইক করেছিলাম। খেলাটা জমেছিল মন্দ না। এখন অবিশ্যি আমি ভাবতেই পারি না, ওরকম না খেয়ে চিত্তির দিয়ে পড়ে

থাকব। তাও কিনা, শহরের সেই ঘাগী খচ্চরগুলোর জন্যে। স্‌লাদের ধরে কয়েক ঘা রদা মেরে দিলেই তো হত! তা না, উপোস করে শুকিয়ে প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। যেন আমরা না খেলে শহরের সেইসব ইয়েদের কিছু যায়-আসে। সে ব্যাপারে দেখেছি আমার ফাদারকে, না না, হটাও ওসব ঝুট-ঝামেলা, ওসবের মধ্যে নেই। থাকবার দরকারও ছিল না। ওতে থেকে এমন কিছু আমদানির সুযোগ ছিল না। যেটুকু থাকে, তাও কয়েকজনের মধ্যে থাকে। বাকীদের খালি মনের শান্তি। বাবার কাছেও প্রস্তাব এসেছিল কি না পরে, রিটায়ার করার পরে, গভর্নিং বডিতে যাবার জন্যে।

প্রথমটা মাইরি ঘাবড়ে খুবই গিয়েছিলাম। পারব তো! কিন্তু ভিতরে এমন একটা একসাইটমেন্ট ছিল, নেমে পড়েছিলাম। হয়তো মারামারি ফাটাফাটি না, তবু প্রায় সেইরকমই একটা উত্তেজনা। শুরু করবার আগে সভা হয়েছিল, আমাদের, আমরা যারা অনশন করেছিলাম, তাদের মালা চন্দন দিয়ে আবার সংবর্ধনা করা হয়েছিল। জীবনে ওই শেষবার, আর একবারই, আমার গলায় মালা পরানো হয়েছিল, মানে ওরকমভাবে মালা পরানোর কথা বলছি। তখন তো কোন ঝগড়াঝাটি নেই, আমার গলায় যে মেয়েটা মালা পরিয়েছিল, কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়েছিল, সে আবার বড়দাদের দলের মেয়ে। মেয়েটা তার আগে কোনদিন আমার মুখের দিকে তাকায়নি। তাকাতো ঠিকই, তবে সামনাসামনি কোনদিন না। আমি কিন্তু তখন মেয়েটার অন্য কিছুর দিকে তাকিয়ে দেখিনি, যেদিকে তাকনো-টাকানো যায় আর কি! তখন যেন কেমন অন্যরকম একটা ভাব এসে গিয়েছিল। আমাদের দলের একটা মেয়ে মেজদাদের দলের একটা ছেলেকে মালা পরিয়ে দিয়েছিল। সব—কী বলে—বাঙলা কথাটাও স্‌সাহ্‌ ভুলে যাই, সেই—হ্যাঁ ঐক্যবদ্ধ, তখন তো সবাই ঐক্যবদ্ধ, তাই সব উলট-পালটা কারবার হয়েছিল। সবাই হাতে হাত দিয়ে আমরা চীৎকার করে উঠেছিলাম, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। গভর্নিং বডির স্বৈরাচার, মানব না, মানব না। ছাত্র-ঐক্য জিন্দাবাদ!' তখন প্রায় আমিও বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম, সে ঐক্য আর ভাঙবে না। রক্তের মধ্যে, স্‌সাহ্‌, এমন একটা রণরণানো ভাব এসেছিল, মনে হয়েছিল, একটা অদ্ভুত আশ্চর্য ব্যাপার ঘটতে চলেছে ..অ-মাগো, তখন কি জানতাম, আমন কত ঐক্য হয়েছে, কত ভাঙছে। জানতাম না, তা ঠিক না, তবে আমার বেলায় মনে হয়েছিল, এই যে জোড়া লাগলো, এ আর কস্মিনকালেও ভাঙবে না। আমি আছি কিনা! তবে আর কি, তুমি যখন আছ, এ চিরদিন টিকে যাবে। বাবা এর নাম দলাদলি, জান না তো!

তা সে যাই হোক গে ছাই, আমি শিখার ছোঁয়া লাগার প্রথম দিনটার কথাই ভাবছি। শিখাকে যে ধর্মঘটের দিনই প্রথম দেখেছিলাম, তা না। আরো আগেই দেখেছি, তবে এ তো সেই শিখা, তখনো কোন দলে ছিল না, অথচ সকলের সঙ্গেই ওর ভাব ছিল। চিনতাম ওকে অনেককাল আগে থেকেই। ওর দাদাদের সঙ্গে কয়েকবার ওদের বাড়িতেও গিয়েছি। যেমন অনেক বন্ধুর বাড়িতেই গিয়েছি বা যাই, কিন্তু তাদের বোনদের সম্পর্কে তখন আমার কোন মাথাব্যথা ছিল না। শিখাকে দেখে তখন কিছু মনে হয়নি। কলেজে যখন এসেছে, তখনো কিছু মনে হয়নি। ওর ওপর অনেকের নজর আছে, এটা জানা ছিল। সব দলের ছেলেরাই শিখা শিখা করতো। শুনে শুনে, আমিও যে দু-চার বার নজর করিনি তা না। কই বাবা, তেমন একটা মার-কাটারি কিছু তো মনে হয়নি। হাবলা গোবলা মেয়ে, আছে না একরকমের, ভাল গোছের মেয়ে—দেখতে খারাপ না, অথচ যারা, প্রেম-ট্রেম করে না, হেসে, ঢলে, নাচিয়ে, খুঁচিয়ে চলে না—যেন একেবারে রাস্তার সব প্রাণ জাগিয়ে চলে, সেরকম ভাবের। যেসব মেয়েকে দেখলেই মনে মনে খিস্তি করে উঠতে ইচ্ছা করে, আর যাদের নিয়ে ছেলেদের বেশী মাথাব্যথা, যাদের দেখলেই অন্য সব কথা মনে হয়, খারাপ খারাপ ইচ্ছা হয়, তাদের নিয়েই তো ছেলেদের রেষারেষি বেশী।

শিখাকে ঠিক সেরকম মনে হত না। তা বলে ও যে ভাল ছিল, তা বলছি না। হয়তো তখনো ও প্রেমও করতো, সবই করতো, রাতারাতি তো আর শহরে দুর্নাম রটেনি যে, শিখা অনেকের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে। এখন যেমন শোনা যায়, শহরে কান পাতা যায় না। তখন এত

নামডাক হয়নি, বা কলেজের অমুক ছেলের সঙ্গে ওর আছে, তাও শোনা যায়নি। অথচ দেখলেই খারাপ কিছু ভাবতে ইচ্ছা করে, খারাপ কিছু করতে ইচ্ছা করে, খারাপ খারাপ কথা বলতে ইচ্ছা করে, তাও ছিল না। তার মানে এই না যে, ও দেখতে ভাল ছিল না। তা হলে আজকের এই শিখা, এই-ই শিখা হত না। তবু এক একটা মেয়ে কীরকম থাকে না, সেই যে কী বলে—একটা ইয়ে ভাব—আহ, আমরা বলি না এক এক সময়, পিওর! হ্যাঁ পিওর ভাব, লক্ষ্মী লক্ষ্মী, প্রতিমা প্রতিমা –ওই সেই আবার 'ওর মধ্যে কী যেন একটা আছে ভূতুড়ে চিন্তাটাই ঘুরে ফিরে আমার মনে আসছে, হাজার ফ্যাকড়া বের করেও যা বোঝা বা বলা আমার দ্বারা হবে না। মোটের ওপর দেখতে ভাল, অথচ মেয়েলি মেয়েলি একরকমের গুমোর যেমন থাকে, সেরকম কিছু ছিল না। সকলের সঙ্গেই সহজে হেসে কথা বলতো, যেন সকলের সঙ্গেই তার বেশ ভাব। ওরকম মেয়ের দিকে আমার আবার তেমন ঝোঁক-টোক লাগতো না, অনেকের যেমন শিখা শিখা বাতিক ছিল। শিখা তো সেরকম ছিল না, শুটকা যেমন যেমন মাঝে মাঝে বলে, 'রঙ্গিলা ছেমড়ি।'

অথচ শিখা আবার কোন দলেরও ছিল না। দলাদলি করার যে একটা মেজাজ থাকে, লড়ে যাওয়া ভাবের, সেটা একদম ওর ছিল না। সেটা যে কেমন করে হয়, জানি না। ওর সম্পর্কে ছেলেদের এত মাথাব্যথা অথচ ও কোন দলে নেই আর তাতেও ছেলেরা ওর ওপরে রেগে যেত না, সেটাই তো কেমন একটু যেন আশ্চর্য ও যে একলাই সেরকম ছিল তা না, অনেক মেয়েই ওরকম দলের বাইরে ছিল, কেবল ইলেকশনের সময় ভোট দিয়েই তারা খালাস। কিন্তু সেই অনেকের মধ্যে শিখাকে ঠিক ফেলা যেত না যেন। কারণ, অনেক মেয়েদের মত ও ঠিক ছিল না, ছেলেরাও ওকে ঠিক অনেক মেয়ের মতন দেখতো না। এতে কীরকম মনে হয়, ও যেন কলেজ—শিখা যেন কলেজটা। আমরা সবাই দলাদলি করছি, আগের ছেলেরাও করে এসেছে, পরেও ছেলেরা করবে, তবু কলেজটা কলেজই থেকে যাচ্ছে। আর না হলে বলতে হয়, ও যেন এই দেশটা, মানে বাঙলা দেশটা। দেশটা তো আর কোন দলে যেতে পারে না, দলাদলিও করতে পারে না, মারামারি কাটাকাটি করতে পারে না। দেশটা যেন নিজের মনেই থেকে যাচ্ছে আর বাকীরা নানান কিছু করছে। এরকম ভাবলে আবার আমার মনে হয়, দেশটা যেন জ্যান্ত মতন কিছু, সবই দেখতে পাচ্ছে। এক এক সময় মনে হয়-না, নীল আকাশটা, মেঘগুলো, গাছের পাতা-চিকচিকনো ঝাড়, সবই যেন কেমন জ্যান্ত জ্যান্ত, কেউ যেন সেখানে রয়েছে, চেয়ে চেয়ে দেখছে সব | কাউকে বললে, আমাকে ঠিক ঠ্যাঙাবে, 'স্‌লা ভূত দেখছ। কিন্তু সত্যি বলছি, মাইরি, অনেকদিন এমন হয়েছে, হয়তো কোন মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে আছি, সেই দূরে গাছপালাগুলো বাতাসে দুলছে, আর না হয় তো হঠাৎ দেখলাম, একটা মেঘ, কালো মতন মেঘ, দূর থেকে খচ করে খুঁচিয়ে উঠলো আকাশে, তারপরে সেই খোঁচাটা বাড়তে লাগলো, বড় হতে লাগলো, বড় বড় বড়, হঠাৎ মার খ্যাচ, চিক চিক করে বিদ্যুৎ চমকে উঠলো, গুর গুর করে দূর থেকে যেন বাঘ ডেকে উঠলো, তারপরেই গাছের মাথাগুলো মুচড়ে দিয়ে ধুলো উড়িয়ে তাল পাকিয়ে গোঁ গোঁ করে ছুটে আসতে লাগলো, ঠিক মনে হয়, সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে জ্যান্ত একটা কিছু রয়েছে। আর না হয় তো ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখা গেল, আকাশটা তখনো ভাল করে নীল হয়নি, ঘাস পাতা ফুল সবকিছুর ওপরে শিশির পড়ে রয়েছে, বাড়িঘরের দেয়ালগুলোও কেমন যেন ঘুম ঘুম ভাব করে রয়েছে, যাহ, কেউ শুনলে কী বলবে—কিন্তু সত্যি এরকম মনে হয়, হয়তো এক-আধটা পাখী চিরিক-পিরিক করে হঠাৎ ডেকে উঠলো, তখনো কী রকম মনে হয়-না, সব কিছুতেই একটা বেঁচে থাকা জ্যান্ত ভাব। রাত্রের তো কথাই নেই। অন্ধকার রাত্রে খোলা জায়গায় দাঁড়ালেই মনে হয়, সব কিছু আরো ভীষণ জ্যান্ত। এরকম মনে হয়, মাটি গাছপালা ঘাস একেবারে চেয়ে আছে, অথচ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ফট করে কথা বলে উঠতে পারে, 'কী রে টুকু, এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস।' উহ্‌রে স্‌সাহ্‌ ভ্যাট, ভাবতেই আমার গায়ের মধ্যে কীরকম করে উঠছে। না, ঠিক ভয়ে না, একটা কীরকম অদ্ভুত শিউরোনি লাগা ভাব, কিন্তু সত্যি' আমার সেরকম মনে হয়। কাউকে বললে সে ভাববে,

সুখেন মাল চড়িয়ে এসেছে। সে কথা আমি কাউকে বলতে যাচ্ছি না। মোটের ওপর, আমার মনে হয় দেশটা, যেটার ওপর দাঁড়িয়ে আমরা নেত্য করছি, দলাদলি মারামারি বল, আর যাই বল, যত রপোট, সেটা যেন একটা জ্যান্ত কিছু। এমন কি, এক এক সময় আমার মনে হয়, আমি যেন কোন এক জায়গায় রয়েছি, আর দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি, মাটি গাছপালা আকাশ, মানুষ—অনেক মানুষ, সব মিলিয়ে গোটা একটা জিনিস চলছে। সবাই সব কিছু করছে, কিন্তু যার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে, সে যেন কিছুই করছে না—সেই রাস্তাঘাট মাঠ গাছ বন, কারণ, তারা মারামারি করতে পারছে না, দলাদলি না, কিন্তু জ্যান্ত, বাকীরা সবই করে যাচ্ছে, আর সে দেখে যাচ্ছে .এই দ্যাখ সুখেন, খচড়ামি করিস না। এ সব ভেবে, আমার নিজেরই এরকম বলে উঠতে ইচ্ছা করছে। মোটের ওপর, আমরা আর শিখা, যেন এরকমই। আমার এরকম বলতে ইচ্ছা করে। ও কোন দলেই নেই, অথচ সবাই ওর কাছে আছে।

যা-ই হোক—প্রথম শিখার ছোঁয়া যেদিন লাগলো, তারপরে তো সভা শেষ করে মালা-চন্দন পরা অবস্থাতেই, কলেজ গেটের সামনে, যেখানে ক্যাম্প করা হয়েছিল, সেখানে আমাদের বসতে দেওয়া হল। ক্যাম্প মানে, একটা সামিয়ানা মতন খাটিয়ে চারপাশে একটু ঢাকনা-টাকনা দিয়ে, ভিতরে দুটো তক্তপোষ পেতে দেওয়া হয়েছিল। কারা কারা যেন আবার বালিশ চাদর সব এনেও পেতে দিয়েছিল। যাতে আমরা শুয়ে-বসে থাকতে পারি। আমাদের গায়ে যাতে রোদ না লাগে, সেই জন্যেই কাপড়চোপড় দিয়ে, সেই ছেলেবেলায় থিয়েটার করার মত, একটা ঘেরাটোপ মতন করে নিতে হয়েছিল। তা ছাড়া রাত্রে মশা কামড়াবে, সেজন্য ধূপ-ধূনার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল। সেখানে আর মশারি টাঙিয়ে, ঘরের মত করে তো থাকবার দরকার ছিল না। আমাদের সব দলের বন্ধুরাই কেউ কেউ সারা রাত আমাদের কাছে থাকতো। সকলের বাড়ির লোকেরা আসতো, বাবা মা ভাই বোন, বাড়ির ছেলে না মেয়ে আছে, কী জানি বাবা, টেঁসে ফেসে গেলে, তারপর? তারপর আবার কী, গভর্নিং বডির জ্যান্ত চিন্তা। একমাত্র সেই সময়েই কলেজে আমার বাবা এসে উপস্থিত। প্রথমটা তো আমার খুব লজ্জাই করছিল বাবাকে দেখে, তা ছাড়া কে একজন যখন বলে উঠেছিল, ‘সুখেনের বাবা আসছে, তখন আবার আমি সিগারেট টানছিলাম। কমলালেবু, লেবুর জল, সেসব ছিল, কিন্তু সিগারেট না খেতে পেলে সত্যি বোধহয় মরেই যেতাম।

কাপড়চোপড় দিয়ে ঢাকা থাকায়, সেই একটা ব্যাপারে খুব সুবিধা হয়েছিল। আর তখন সিগারেটটা প্রথম দুদিন খুবই ভাল লেগেছিল। বাবা আসছে শুনেই সিগারেটটা অড়াতাড়ি নিভিয়ে ফেলেছিলাম, হাতের ঝাপটা আর ফুঁ দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে দিয়েছিলাম। বাবাকে দেখে প্রথমটা খুব লজ্জা হয়েছিল, কেন তা জানি না। আর বাবার তো সেই চাল, 'সাব ইনসপেকশন মে আয়া হ্যায়।' এসে প্রথম আমার দিকেই তাকিয়েছিল, কী মনে হয়েছিল জানি না, তবে হঠাৎ কোন কথা বলেনি। সাহেবের মুখের ভাবটি মোটেই সন্তুষ্ট না, খুব যে একটা বিরক্ত ভাব, তাও ঠিক না, তবে কেমন একটা ভল-ল লাগা গোছের। সবাইকেই একবার তাকিয়ে দেখেছিল, যেসব ছেলেরা ভলান্টিয়ার ছিল, তারাও বাবার কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু বাবা একবারও আমার দিকে বেশীক্ষণ তাকায়নি। খানিকবাদে, যেন ঠিক কারুর দিক না তাকিয়ে বলেছিল, 'এসব করলেই কি আর ওরা শুনবে!' তার মানে, গভর্নিং বডির কথা বলেছিল ! কে যেন বলে উঠেছিল, আমরা ওদের শুনিয়ে ছাড়ব দেখবেন।' বাবা যে বিশ্বাস করেছিল, তা আমার মনে হয়নি। বোধ হয় ফার যদি গভর্নিং বড়ির মেম্বার হত, তা হলে শুনতো না। যে ছেলেটা বলেছিল, তার দিকে একবার তাকিয়ে, মুখ ফিরিয়ে আর একবার আমার দিকে তাকিয়েছিল। তখন আমিই বলেছিলাম, 'আমি বেশ ভালই আছি।' বাবা বলে উঠেছিল, 'এই করো খালি।' কিন্তু সে কথার মধ্যে কোন তর্জন গর্জন ছিল না, বরং যেন ওইরকম ভাবের আরো অনেক কথা বলতে ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু বলতে পারেনি। বোধ হয় অন্যান্য ছেলেরা ছিল বলে চুপ করেছিল, তারপরে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা যে একেবারেই লোকদেখানো নিয়মরক্ষা, যে, যাই একেবারে না খেয়ে পড়ে আছে, না গেলে লোকেরা কী বলবে, ঠিক সেভাবে বোধহয় আসেনি। কারণ পরে শুনেছি, বাবার আসবার কথা শুনে দাদারা নাকি বারণ করেছিল, 'থাক, আপনার যাবার কোন দরকার নেই, কিন্তু তা শোনেনি। উলটে দাদাদের খিচিয়েছিল, 'হ্যাঁ, এইসব করেই সবাই নিজেদের গোল্লায় দাও। ওখানে পড়ে থাকলেই সব হয়ে যাবে, যত সব বাঁদরামি।ওকে এখন কান ধরে ওখান থেকে তুলে নিয়ে আসা উচিত।' প্রেসটিজের ফিলিংস্ নেই, সসাহ্, না খেয়ে অনশন ধর্মঘট করলাম তাও বলে কিনা কান ধরে আনা উচিত। অথচ ক্যাম্পে এসে আর ওসব কথা বলতে হয়নি, মুখখানি হুমদো করে চলে যেতে হয়েছিল। প্রিন্সিপাল, ভাইস আর স্যারেরা অনেকবারই তো এসে ঘুরে গিয়েছে। স্যারদের কথা আলাদা, প্রিন্সিপাল ভাইস স্ট্রাইক তুলে নিতেই অনুরোধ করেছিল, করতে হয় তাই, কারণ আমাদের দাবী মেটাবার কথা তো তারা কেউ দিতে পারেনি।

প্রথম দুদিন একটু বেশী কষ্ট হয়েছিল, বিশেষ করে যেদিন শুরু তার পরের দিন সকালে তো মনে হয়েছিল, উহ, এ্যাবসার্ড। দুপুরে মনে হয়েছিল, কাঁউ কাঁউ করে ভাত গিলে আসি, ঝামেলা হটাও। কিন্তু মনের কথা কাউকে বলতে পারছিলাম না। যদি স্সাহ্, মুখ ফসকে বলেই ফেলতাম, তা হলে নিশ্চয় দেয়ালীর রাত্রে কুকুরের ল্যাজে ফুলঝুরি বেঁধে, জ্বালিয়ে ছোটাবার মত অবস্থা করা হত আমার। ভাতের কথা, ডাল তরকারি মাছের কথা মনে হতেই মুখের মধ্যে এত জল কেটেছিল, আর পেটের মধ্যে কীরকম জ্বালা করছিল। তবে বন্ধুরা সবসময়ে গল্প করছিল, লেবুর জল চলছিল, সিগারেট চলছিল, তাই কোনরকমে ভুলে থাকা যাচ্ছিল। তবু আমি—অন্যদের মনের কথা ঠিক জানি না, দ্বিতীয় দিনে বিকেলের সময় মনে মনে সত্যি ভগবানকে ডাকতে আরম্ভ করেছিলাম। আমি এক পাশ ফিরে চুপ করে শুয়ে শুয়ে যেন নিজেকে সামলাচ্ছিলাম, আর ভীষণ ভয় করছিল, গেল বুঝি আমার কাপ ছটকে। একটা সময় এসেছিল, কারুর কথাবাত ভাল লাগছিল না, কেউ কাছে এলে ভাল লাগছিল না। মেয়েরাও কেউ কেউ ছিল, সারাদিনই কেউ না কেউ থাকতোই। রাত্রে কেউ থাকতো না, তখন শুধু ছেলেরাই থাকতো। দিনের বেলা মেয়েদের মধ্যে শিখাকেও কয়েকবার দেখেছি, ও আমাকে লেবুর জল-টলও দিয়েছে, বিশেষ কিছু মনে হয়নি। সবাইকেই যেমন দিচ্ছিল, আমাকেও তেমনি, অন্যান্য মেয়েদের মতই। কোন মেয়েকেও যেন কাছে ভাল লাগছিল না।

তার পরের দিন, তিনদিনের দিন সকালে যখন আমার ঘুম ভাঙলো, আমি দেখলাম,

কাপড় ঢাকার ফাঁক দিয়ে একটা বড় নিম গাছ দেখা যাচ্ছে। তার আশ্লেপাশে আরো কয়েকটা কী গাছ। সেখানে রোদ পড়েছে, গাছের পাতাগুলো চিকচিক করছে, কিন্তু আমার যেন চোখের পাতাগুলো কেমন টনটন করছিল, চেয়ে থাকতে পারছিলাম না, আর চোখ দিয়ে যেন জল আসছে। এমন সময় কার একটা হাত আমার গায়ে এসে পড়লো, পাশ ফিরে দেখলাম, বিজয়, সেও অনশন করেছিল। ও আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসলো একটু, আর আমাকে জড়িয়ে ধরলো, আমিও সেইরকম ওকে জড়িয়ে ধরলাম, আর দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কেন যে ওরকমভাবে দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়েছিলাম জানি না, আর একটু একটু হাসছিলাম, অথচ কেউ কোন কথা বলছিলাম না। বাকী চারজন তখন ঘুমোচ্ছিল। তখন কিন্তু একটা আশ্চর্য, সেরকম খিদেটিদে লাগছিল না। অনশনের আগের দিন রাত্রে তো পারগেটিভ নিয়ে পেটটি একেবারে ফাঁকা করে নিয়েছিলাম। তিনদিনের দিন সকালে মনে হয়েছিল, পেট বলে ব্যাপারটা নেই, ওখানে কোন কিছুই হচ্ছে না। কেমন একটা নিঝুম ভাব, আমি যেন অন্য কোথায় কীভাবে রয়েছি, একেবারে একলা একটা ঘরের মধ্যে। অথচ সবাই রয়েছে, সবাইকেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু একলা থাকাতে অনেক সময় যে সেই একটা ভূতুড়ে ভয়, বুকের মধ্যে গুরগুরিয়ে ওঠা ভাব, সেটা একেবারেই হচ্ছিল না। তবু যেন মনে হচ্ছিল, আমি একটা আলাদা কিছু—মানে, আলাদা কিছুর মধ্যে আছি, যেখানে কেউ পৌছুতে পারবে না, খিদে না, ভয় না, আমাকে কেউ ছুতেও পারবে না। ঠিক বোঝাতে পারি না ব্যাপারটা, এক এক সময় মনে হয়-না, কে কি বলছে না বলছে, আমি জানি না, শুনতে চাই না, সরে যাও, আমি একলাই পারি। একলার মধ্যেও যে একটা খুব-জোর আছে, সেটাই যেন আমি বুঝতে পারছিলাম, অথচ তখন তো আমি বেশ দুর্বল, তবু যে ওরকম কেন মনে হচ্ছিল, জানি না।

অনেকক্ষণ পরে আমি বিজযকে বলেছিলাম, তোর গা-টা একটু গরম গরম লাগছে। বিজয় বলেছিল, 'তোর গা-টাও।' ভলান্টিয়ারদের মধ্যে একজন বলেছিল, 'এখন ওরকম একটু হয়।'

একটু পরেই ডাক্তার এসেছিল, আমাদের শহরেরই এক ছোকরা ডাক্তার। ছোকরা হলেও বেড়াল যেমন মাছের গন্ধ চেনে; সেও তেমনি পয়সার গন্ধ চেনে, আর বাঘ যেমন রক্তের গন্ধ পায় আর চায়, মেয়েমানুষের ব্যাপারেও সে ঠিক তাই, তবে শহরের এসব ব্যাপারে লোকটা সব সময়েই হাজির থাকে, আর তাতেই লোকটাকে বেধড়ক খচ্চর জেনেও কেউ বিশেষ পেছনে লাগে না। এখন তো সে আমার বিনা পয়সার ডাক্তার। একটু-আধটু শরীর খারাপ হলে ওকেই দেখাই, ওষুধও দেয় বিনা পয়সাতেই। সেই একই ব্যাপার, গুণ্ডাটাকে হাতে রাখার জন্যে। সবাইকে হাতে রাখার জন্যে যা যা করা দরকার, সবই করতে হয়, ওটাও বোধহয় বিজনেস ট্যাকটিকস, কিন্তু এদিকে হাতে রাখতে গিয়ে কাদের ঘাড়ে যে কাঁঠাল ভাঙা হচ্ছে, তাও তারাই জানে, যারা কোমরের কষি থেকে ঘামের গন্ধ লাগা চটচটে টাকাগুলো তুলে দিচ্ছে। পাঁচের জায়গায় দশ, দশের জায়গায় কুড়ি নিচ্ছে, নেবেই, ওদিকে দাতব্য করতে গেলে, এদিকে টান না মারলে চলবে কী করে। ঘর থেকে তো আর বের করবে না, বরং ঘরের জমাতে কোন ফাঁকি রাখলে চলবে না, সেটা আগেই ঠিক রাখতে হবে।

বুঝতে পারি, এখন যে আমাকে, অসুখ-বিসুখ হলে দেখতে হয়, ওষুধ দিতে হয়, তাতে দাঁতে দাঁত পিষে, নিজেরই মাড়িতে ব্যথা হয়ে যায়, কিন্তু বল হরি, কী করি উপায়! গুণ্ডাটাকে না সামলে রাখলে, কোনদিন একটা কী কাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়বে, বলা তো যায় না। তা সে যাক গে, আমাদের দেখতে এসেছিল ডাক্তার, দেশের আর দশের সেবা করা যাকে বলে। সকলেরই নাড়ি টিপে, বুকে নল বসিয়ে, ব্লাড প্রেসার দেখে, লেবুর জলের সঙ্গে কিছু গ্লুকোজের জলের ব্যবস্থা দিয়ে গিয়েছিল। আমাদের সকলের শরীরই নাকি বেশ ভাল ছিল, একজন ছাড়া। সে ছিল বড়দাদের দলের। সে যে কেন উপোস করতে রাজী হয়েছিল, কে জানে, কারণ তার তো পাখীর মতন শরীর, লগবগে রোগা, চশমা চোখে, তার ওপরে স্সাহ্

দাঁতগুলো উঁচু ফাঁক ফাঁক। মাথায় একগাদা চুল, সেই খ্যাংরা কাটির ডগায় আলুর মত মনে হত। দেখলেই মনে হত ওর পেটে সব সময়ে কুলকুল গোঁ গোঁ হুটর পাটোর শব্দ হচ্ছে, পেটের অসুখে ভুগছে। ব্যাটা, এমনিতেই না হয় তোর খাওয়াটা কম, হজম করতে পারিস না, তা বলে অনশনের রমজানি কেন। নাম করতে হবে, না? তাহলেও ডাক্তার তাকে ওষুধ দিয়েছিল। ওদিকে ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটু-আধটু কথাবার্তা চালাবার চেষ্টা করছিল গর্ভর্নিং বডি। বাছাধনদের ব্যাপারটা খুব সুবিধার মনে হচ্ছিল না। শোনা যাচ্ছিল, এস.ডি.ও নাকি আসচে, কারণ গভর্নিং বডির উনিই তো আবার প্রেসিডেণ্ট—সেই কী বলে কথাটা – মানে খুটোর জোরে—ভাল কথায়, পদাধিকার বলে।

কিন্তু সে সবে কিছুই আমার যাচ্ছিল না। তোমরা যা খুশি তাই করতে পার, আমাকে ছুতে পার না, আর আমাকে ভয় দেখাতে পার না। ছেলে আর মেয়েরা সবাই আমাদের মাঝে মাঝে মুখে লেবুর জল-টল তুলে দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে ওরা গান গেয়ে উঠছিল, ‘সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান। সংকটের কল্পনাতে হয়ে না ম্রিয়মাণ ‘...আগেও তো কতবারই ও গানটা শুনেছিলাম, পরেও অনেকবাব শুনেছি, শুনছি, শুনব আরো, শুনে শুনে কান পচেও যাবে, কারণ এই তো বোধহয় কয়েকদিন আগেই শুনলাম, একটা গলির মধ্যে কয়েকটা বাচ্চ ল্যাংটো হয়ে, রাস্তার ধারের নর্দমায় পেছন ঝুলিয়ে বসে, এক কাজে দু কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। ওদিকে এক কাজ, সেটা শরীরের ব্যাপার, এদিকে প্রাণ খুলে ছংকোচের বিবভলতা নিজেলো অপমান, চীৎকার করে যাচ্ছিল। তাই বলছি, এখন ওই শোনা পর্যন্তই, আর কিছু মনে হয় না। অথচ সেই সময়, সেই উপোসের দিনে, গানটা শুনতে শুনতে, আমার বুকের মধ্যে কীরকম করে উঠেছিল। ওরা তুড়ি দিয়ে হাততালি দিয়ে তালে তালে গেয়েছিল, আর আমিও যেন সেই তালে তালে মনে মনে বলেছিলাম, না না না, কখনো না, কোন কিছুতেই মানব না। শরীরে তো একরত্তি জোর ছিল না বলতে গেলে, অথচ ভিতরটা যেন ফুলে ফুলে উঠেছিল। তারপরে কৃষ্ণা, সেই বড়দাদের দলের মেয়েটা, যাকে ও বাড়িতে ঘরের মধ্যে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে হাবড়ে চুমো খাচ্ছিল, সেই কৃষ্ণা গেয়েছিল, ‘ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে নোয়াই মাথা। আবার গেয়েছিল, ‘সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে। আহ, মাইরি, আমার কেন জানি না, ফোঁড়া ফেটে গেলে যেমন পুজ রক্ত গলে যায়, আর শরীরের মধ্যে কী রকম একটা হতে থাকে, চোখের জলটা যেন সেভাবেই গলে গলে পড়ছিল। সে সময়ে ছুঁড়িটাকে আমার কীরকম যেন একটা ফুল ফুল মতন মনে হয়েছিল, ভোরবেলার টাটকা ফুল যেমন থাকে না, সেইরকম। সুন্দর তাজা আর মিঠে মিঠে গন্ধ। তখন অন্য সব কথা মনেই আসেনি। আমি পাশ ফিরে চোখ বুজে শুয়েছিলাম, যাতে আমার চোখের জল পড়া কেউ দেখতে না পায়। ওর গলাটাও অদ্ভুত মিষ্টি ছিল—এখন যে মেয়েটা কোথায় বেপাত্তা হয়ে গেছে, বিয়েই হয়েছে না কি, খালি নিকা চালিয়ে যাচ্ছে, কে জানে। বড়দার সঙ্গে তো আর নেই, কতদূর এগিয়েছিল, কে জানে, এখন হয়তো অন্য কোন ঘরের দরজার পাশে, অন্য কারুকে খাওয়াচ্ছে, তবু গলাটা দারুণ লেগেছিল, ঠিক যেন তারের বাজনায় আওয়াজ দেবার মতন। নাহ, ছুঁড়ির গলাতে আওয়াজ ছিল।

এখন অবিশ্যি সমস্ত ব্যাপারটা আমার অনারকম লাগে, যেন থিয়েটারের একটা জমজমাট সিন। সিনেমার একটা বেশ লাগদার জায়গা, কাঁদানে কাঁদানে এক একটা জায়গা থাকে যেমন সিনেমা থিয়েটারে, বাজনা বাজছে, ওয়েঁায়েঁা, ওয়েঁায়েঁা, আর লোকটা বা মেয়েটা কেঁদে ভেসসা যাচ্ছে, সেইরকম। তবে আমার মনে হয়, আমার চোখের জলটা একজন দেখতে পেয়েছিল, শিখা দেখতে পেয়েছিল, কারণ সে সময়ে ও আমাকে জল বাড়িয়ে দিয়েছিল মুখের দিকে, আমি ঘাড় নেড়ে জানিযেছিলাম খাব না, আর শিখা, যেন কিছুই হয়নি, এইভাবে হঠাৎ আঙুল দিয়েই আমার নাকের পাশে, চোখের কোলটা মুছে দিয়েছিল। বড়দা মেজদা অনেকবারই যাতায়াত করেছিল, আর বোধ হয় সেই একবারই দেখেছিলাম, ওরা আমাকে খাতির করেছিল, কেননা, ওটা ওদের ঠোঁট-বাঁকানো আর ভারিক্কি চালের একটা জোর জবাব হয়েছিল। তবু মেজদা ওর সেই বাঁকা হাসিটা ছাড়েনি, বলেছিল,

টুকু তা হলে কামাল করলি। না করলেই যেন ওর মনের মতন হত। এমন পাজী না, ওর চোখের চাউনি দেখেই বুঝতে পারতাম, ব্যাপারটা যেন একটা কিছুই না, খুবই সামান্য, সেইটা বোঝাবার চেষ্টা করত। আর বড়দার সেই গাঁয়ে মনে না আপনি মোড়ল, কীরে টুকু, কষ্ট হচ্ছে?—-যেন কী এল, তবু যদি তোকে না জানতাম—যাকগে, সব থেকে খারাপ লেগেছিল, আমার যখন ঘুম আসছিল, তিনদিনের দিন, দুপুরের দিকে, তখন প্রতিনিধি নিয়ে ওরা ক্যাম্পের মধ্যেই তর্কবিতর্ক আরম্ভ করেছিল। এমন খিস্তি করতে ইচ্ছা করে, সকলেই হঠাৎ যেন আসল ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিল। মেজদাদের দলের একটা ছেলে, সব সময়ে প্রায় ঘুষি পাকিয়ে কথা বলে—ওটাকে একবার আমি মাথা ফাটিয়েছিলাম, প্রায় চেচিয়ে উঠে বলেছিল, তা হলে আমরা আলাদা ক্যাম্প করব, আমরা ইউনাইটেড থাকব না' অবিশ্যি, অন্য দলগুলোরও পেয়াজি ছিল, সকলেই বলে, "আমায় দ্যাখ। আমি তো ভেবেছিলাম, যাহ স্‌সাহ্‌, সব ভণ্ডুল হয়ে গেল বোধহয়।

তারপরে জানি না, কীভাবে ওদের মিটমাট হয়েছিল, তবে হয়েছিল একটা কিছু। আমি জানতে পারিনি, কারণ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আর ঘুম যখন ভেঙেছিল, চোখ তাকাবার আগেই আমি ঝিঝির ডাক খুব আস্তে শুনতে পেয়েছিলাম। যেন অনেক দূর থেকে শব্দটা আসছিল। আস্তে আস্তে চোখ তাকিয়েছিলাম, কেন না, হঠাৎ তাকাতে গেলেই যেন চোখের পাতা টনটুনিয়ে ব্যথা করে উঠবে মনে হচ্ছিল। অবিশ্যি সে রকম একটা কিছু না যে, একেবারে চোখের পাতা ভেঙে যাবে। চোখ তাকাতে বুঝতে পেরেছিলাম, আমি পাশ ফিরে শুয়ে আছি। কারা যেন অনেক দূর থেকে কথা বলছিল, তার মধ্যে কয়েকটা কথাই ঘুরে ফিরে শুনতে পাচ্ছিলাম, "নিশ্চয়ই কেউ তার কেটে দিয়েছে। যে-ই কাটুক, তাকে ছাড়া হবে না ...এখন বিরিজের দোকান থেকে একটা কানেকশন লাগিয়ে নিলেই হবে।'

তার মানে, কলেজের ইলেকট্রিক লাইন থেকে টেনে, ক্যাম্পে একটা আলো জ্বালানো হয়েছিল। সেই তারটাই কেউ কেটে দিয়েছিল—কে জানে, কার এত সাহস হয়েছিল। কাছেই বিরিজের মুদি দোকান ছিল, সেখান থেকেই আবার লাইন টানার কথা হচ্ছিল। তাই পাশ ফিরে শোয়া অবস্থায় আমি যখন চোখ মেলেছিলাম, অন্ধকার মতন দেখেছিলাম, অথচ একটা আলো কোথা থেকে এসে যেন আমার চোখের পাশে পড়ছিল। তেমন জোরালো আলো না, কিন্তু আলো, বুঝতে পারছিলাম, আলোর রেশটা যেন আমার গালের ওপরেও পড়েছিল। রাস্তার আলো নিশ্চয়ই না, কারণ মনে ছিল, রাস্তার দিকটা একটা পুরো শতরঞ্চি টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সামনে অন্ধকার, পাশে একটা আলো, আর ধূপ-ধূনার গন্ধ পাচ্ছিলাম, মশার জন্যে যেগুলো জ্বালানো হয়েছিল। পাশের আলোটা দেখবার জন্য, আমি আস্তে আস্তে চিত হয়েছিলাম, আর চিত হতেই, ইস্‌, ঠিক মনে হয়েছিল, আমার চোখের সামনে প্রায় গোল একটা লাল আলো ঝুলছে। প্রথমটা এমন হকচকিয়ে গিয়েছিলাম যে, জিনিসটা কী, তা হঠাৎ বুঝতেই পারিনি। তারপরে দেখি কি, ওটা চাঁদ—গোল তাঁবার থালায় আলো পড়লে যেরকম দেখায়, ঠিক সেইরকম দেখাচ্ছিল। প্রথমে চোখের সামনে মনে হলেও আসলে ওটা অনেক দূরেই ছিল, কাপড় ঢাকার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, আস্তে আস্তে আরো বুঝতে পেরেছিলাম, নিমগাছটার প্রায় মাথার কাছেই চাঁদটা রয়েছে, কারণ গাছটার মগডালের একটুখানি যেন চাঁদটার গায়ে লেগেছিল। আলোটা প্রায় সরাসরি আমার গায়ের আর মুখের ওপর পড়েছিল। তাতে আমার যেন মনে হচ্ছিল, আমি কোথায় একটা জায়গায় যেন রয়েছি। মনটা কেমন একরকম হয়ে যাচ্ছিল—এখন ভাবলে মনে হয়, পেটে ইদুরে ডন মারলে চাঁদকেও বোধ হয় ওরকমই লাগে, একটা কেমন যেন অদ্ভুত অদ্ভুত ভাব। ভূতুড়েই বলতে হয়, আর মনও ওইরকমই হয়ে যায়। এই যে আমি, এই আমি যেন মোটেই সেই আমি না, স্‌সাহ্‌, এর চেয়ে খোয়াব দেখা আর কাকে বলে। একমাত্র মালের ঝোঁকেই ওরকম মনে হতে পারে। যাই হোক, আমি যখন একরকম দেখছিলাম, তখনই শুনতে পেয়েছিলাম, জেগেছে? কোন মেয়ে বলেছিল, তাতে একটা কথা বোঝা গিয়েছিল, সন্ধ্যারাত্রই হবে তখন, কারণ মেয়েরা ক্যাম্পে রয়েছে। মেয়ে তো; বেশী রাত্র অবধি থাকলে,

তারপরে নিজেদের মধ্যে মাখোমাখোটি করে কাজ সারো, সিটি হবার নয়। অনশন কর, আর যা-ই কর বাবারা, ও সব ছোঁড়াছুঁড়ি একত্রে রাত্রে থাকবে, তা হবে না, মেয়েদের সবাইকেই বাড়ি চলে যেতে হত। কে যে বলেছিল জেগেছে, বুঝতে পারিনি, কিন্তু চাঁদকে আড়াল করে কে যেন দাঁড়িয়েছিল। কাচের গেলাস আর চামচের শব্দ আমার কানে এসেছিল। যে দাঁড়িয়েছিল, সে একটা মেয়ে, এটা আমি বুঝতে পারছিলাম, মাথা চুল গলা কাঁধ শরীরের ভাবটা, শাড়ির আঁচল, এ সব দেখে বুঝতে পারছিলাম, কোন মেয়ে। তারপরে সে চাঁদকে পাশ কাটিয়ে, আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন তার মুখে তাঁবায় আলো পড়া লাল আভা লেগেছিল, চিনতে পেরেছিলাম, ওটা শিখা। কিন্তু শিখা হলেও যেন শিখা না, একটা অন্য কেউ, একটা অন্য ভাব, মাইরি—ওর চোখগুলো কীরকম, অন্যরকম লাগছিল, যেন কত বড়, কুমোরদের আঁকা মূর্তির চোখের মত সেই যেন কান পর্যন্ত টানা, আর সাদা বলে কিছু নেই, চোখের সবটাই কালো, অথচ একটা চিকচিকে ভাব, আর গালটা লাল লাল, নাক ঠোঁট লাল লাল, কাপড়টা লাল লাল—যে কাপড়টা খানিকটা আমার গায়ের কাছেই লুটিয়ে পড়েছিল, কারণ শিখা নিচু হয়েছিল, আমার ওপর ঝুঁকে পড়েছিল, আমি ওর গায়ের একটা হালকা গন্ধ পেয়েছিলাম—কিসের গন্ধ তা বলতে পারব না, হয়তো গায়ের না, চুলের, বা কী জানি, আর কিছু মেখেছিল কিনা, আর ওর নিশ্বাসের হাওয়াও আমার মুখে লেগেছিল, বলেছিল, ‘সুখেনদা, একটু গ্লুকোজের জল খান।

জলের কথা শুনেই, আমার কিন্তু একটা অন্যরকম ফিলিঙস হয়েছিল, আশ্চর্য, গলাটা তো বেশ কাঠ-কাঠই লাগছিল, তবু মনে হয়েছিল, আমার তলপেটটা ভার আর জলে ভরতি হয়ে আছে যেন, তাই আমি প্রথমটা শব্দ করেছিলাম, 'অ্যাঁ?'

শিখা আবার বলেছিল, 'একটু গ্লুকোজের জল খান।

আমি বলেছিলাম, না, আমি একটু পেচ্ছাব করতে যাব।'

ধূর স্‌সাহ্‌, আমি একটা কী মাইরি, এখন তো ভাবলেই অবাক লাগে, আমি কিনা একটা মেয়েকে বলেছিলাম সেই কথা। আরে, 'বাথরুমে যাব' বা 'বাইরে যাব' বল, তা না, একেবারে খোকনের মতন—কেন, 'হিসি' বললেই পারতে, বুদ্ধু! কিন্তু কথাটা যে তখন কারুর কানে খারাপ লেগেছিল এমন মনে হয়নি, আমারও মোটেই কিছু মনে হয়নি, যেন খুব সাধারণ কথাই বলেছি। কথাটা বলেই আমি উঠতে যাচ্ছিলাম, শিখা তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, 'দাঁড়ান দাঁড়ান, আমি ধরি, তা নইলে পড়ে যেতে পারেন। ছেলেরা কেউ নেই তো, সব আলোর জন্যে গেছে, লাইন কেটে দিয়েছে কিনা।'

সেটা তো আমি অনেক আগেই টের পেয়েছিলাম। কিন্তু শিখার ধরবার কোন দরকার ছিল না, উঠে দাঁড়াবার বা চলবার শক্তি আমার ছিল, তাই ওর কথা না শুনে উঠতে উঠতেই বলেছিলাম, 'আমি পারব।' কিন্তু শিখা শোনেনি, কোনরকমে হাতের গেলাসটা একদিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, 'কৃষ্ণাদি, ধরুন তো গেলাসটা।'

তখন জানতে পেরেছিলাম, কৃষ্ণাও ছিল। সে হাত বাড়িয়ে গেলাসটা নিতেই শিখা আমার হাত ধরেছিল। ওর সেই হাতটাও লাল লাল দেখাচ্ছিল, ওর হাতটা ঠাণ্ডা ছিল, ঠিক যেমন মনে হচ্ছিল লাল আলোটাও যেন ঠাণ্ডা সেইরকম আর শিখাকেও যে কারণে শিখা বলে মনে হচ্ছিল না, সেই আমার অদ্ভুত মনের ভাবের মতই। ও যখন হাতটা ধরেছিল, আমার ডানাটা, তখন যেন সেই ভূতুড়ে ভূতুড়ে ভাবটাই আরো বেশী হয়েছিল, অথচ আমি যেরকম বলা উচিত, সেইভাবেই বলেছিলাম, 'আমি পারব যেতে। শিখা সে কথার কোন জবাবই দেয়নি, খালি বলেছিল, "ঠিক আছে। ঠিক আছে।" তার মানে কী, ওর নিজের কথা বলতে চেয়েছিল যে, "আমার জন্যে ভাববেন না, ঠিক আছে? আমার সেরকমই মনে হয়েছিল, তবে আমার তখন ওসব নিয়ে বেশী কথা বলতে ইচ্ছে করছিল ন। আমি উঠে দাঁড়াতে শিখা আমাকে এমনভাবে ধরেছিল, ওর গাটা আমার গায়ের সঙ্গে লাগছিল, ওর বুকটা আমার ডানার সঙ্গে লাগছিল, আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, আর আমার কীরকম একটা অদ্ভুত লাগছিল, আমি ওর দিকে তাকিয়েছিলাম। তখন ওর মুখে ছায়া পড়েছিল, মুখটা দেখতে পাইনি, কিন্তু আমার তো এখনো ভাবলে অবাক লাগে, উল্লুক তোর পেটে তিন রোজ ভাত নেই, শিখার গায়ের সঙ্গে ছোঁয়াছুয়িতে তোর ওরকম লাগছিল কেন। সেটা যে ঠিক কোন মেয়ের সঙ্গে লবজবানি করার মত একটা ব্যাপার, তা না, একটা অন্যরকম ভাবের, সেই অনেকটা গান শুনে যেমন হয়েছিল না, সেইরকম যেন চোখে জল এসে পড়বে, অথচ আমার উপোসী শরীরে রক্ত যেন কেমন করে উঠেছিল—মানে গরম আর কী। হ্যাঁ, একসাইটমেন্টই যাকে বলে—কী বলব, মার তোর মুখে লাথি, কিন্তু কী যে হয়েছিল না সত্যি, আমি অনশন করছি, প্রতিবাদ করছি,

অদ্ভুত মনে হচ্ছিল, যেন কেঁদে ফেলি, আর শিখার সেই নরম বুকের মধ্যে মুখটা ডুবিয়ে দিই, ডুবি—য়ে দিই। একে শয়তান বলে না তো কী, কিন্তু কী করব, আমার যা সত্যি মনে হয়েছিল, তাই ভাবছি। তা বলে শিখাকে সেসব জানতে দিইনি, সে জ্ঞানটা টনটনে ছিল। ও আমার ডানা ধরে ক্যাম্পের বাইরে নিয়ে গিয়েছিল। ক্যাম্পের বাইরে কয়েক পা গেলেই তো একটা নর্দমা ছিল, সেটাই তখন আমাদের ইউরিনাল হয়েছিল। বাইরে যেতে, সেই তাঁবাটে আলোটা আরো বেশী করে গায়ে পড়েছিল, আমার আর শিখার দুজনেরই। আমারটা আর কে দেখছিল, ওরটাই আমি একটু একটু দেখছিলাম, কিন্তু যে কাজের জন্য বাইরে যাওয়া, আশ্চর্য, তার কোন চাপই আর ছিল না। একটু আগেই যে আমার মনে হয়েছিল, গলা শুকিয়ে গেলেও জল খাবার আগে, আমাকে নর্দমার ধারে যেতে হবে সেটা বেমালুম গায়েব হয়ে

গিয়েছিল, বরং সেই উত্তেজনায় সব ব্যাপারটা একেবারে উলটে গিয়েছিল। তবু আমি নর্দমার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, তখন শিখা আমার হাত দুয়েক পিছনে দাঁড়িয়েছিল। অতটা তো আর পারে না যে, তখনো আমাকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে। জানি না, অবিশ্যি এখন হলে কী হবে, যদি আমি উঠে দাড়াতে না পারি, আর আমাকে সেই কর্মটি করতে হয়, শিখা হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে কিনা।

এ আবার একটু খচড়ামি হয়ে গেল, তাই হাসিও পায় ভাবতে এখন আর বাবা অত চাপাচাপি করার কী আছে। একবার তো ফিতে কাটা নিয়ে কথা, কুচ—তারপরে সসুভ উদ্বোধন হয়ে গেল, মন্ত্রী মশাই চলে গেলেন, এবার ভি আই পি-এরা, আর জনগণ চলে আসুন। যত সংকোচের বিহ্বলতা তো সেই পর্যন্তই। কিন্তু নর্দমার কাছে গিয়ে আমার দাঁড়ানোই সার হয়েছিল, একেবারে একটু কিছু না। জানি না, কী করে শরীরের এসব ব্যাপারে এমন ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে। কী রে বাবা, সেই যে বলে না, যৌবন কুরকুরোয় না পেট কুরকুরোয়? ধুকতে ধুকতেও ও আবার কী। জানি, আমাকে ফিরতে হয়েছিল, ওকে ধরেই ফিরেছিলাম, আর তখন, সব মিলিয়ে মনটার মধ্যে কেমন একটা গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। গোলমাল মানে, মনের ভিতরটা যেন কেমন একরকম তলতলিয়ে উঠেছিল—হয় না একরকম, যেন মনটা তলতল করছে, দুলছে, ঠিক যেমন জলে হাওয়া লাগলে দোলে, সেইরকম এদিকে ওদিকে ধাক্কা লেগে লেগে যেন বেড়ে যেতে চায়, উপচে উপচে পড়তে চায়—সেটা কীরকম ভাব জানি না, সেরকমই আমার মনে হয়েছিল, অথচ তার সঙ্গে একটা কষ্ট, যেন ভিতর থেকে কিছু একটা ঠেলে ঠেলে উঠতে চাইছে, অথচ আবার শরীরের মধ্যে এমন একটা ভাব, একটা সুখের মত, মনে হচ্ছিল, উনুনের কয়লাগুলো সব জ্বলে উঠলে যেমন একটুও ধোঁয়া থাকে না, একটাও শিস থাকে না, একেবারে লাল গনগনে আগুন, আমার শরীরের ভিতরটা যেন সেইরকম হয়েছিল। তার একটু আগেই তো সব যেন কেমন আসার আসার লাগছিল, আর তখন মনে হচ্ছিল, শরীরের সবখানে এত বেশী সার, একটু সামান্য ছুঁয়ে গেলেও ঠিক টের পাব।

এই সব ব্যাপারকে ভালবাসা বলে কিনা জানি না, তবে সব মিলিয়ে আমার কেমন যেন মনে হয়েছিল, শিখাকে আমি ভালবাসি, ওকে আমার ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। ফেরবার সময়ও আমাকে, আমার পিঠের ওপর দিয়ে এক হাতে জড়িয়ে ধরেছিল, খুব সাবধানে, যাতে আমি পড়ে গেলে ও সামলাতে পারে, তাতে আমার শরীরের মধ্যে ওকে আরও বেশী টের পাচ্ছিলাম। তবু সেই ঘটনার আগেও তো, মেয়েদের সঙ্গে মিশেছি—মানে সঙ্গ করা যাকে বলে, গায়ে গায়ে জড়াজড়ি, যেমন দোকানের পিছনে বা অন্য কোথাও, কিন্তু সেসব ব্যাপারের সঙ্গে, শিখার ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা মনে হয়েছিল। এমন কি, নিজেকে কেমন একটু খারাপ লেগেছিল, ছোটলোক ইতরের মতন। এটা বুঝতে তো কোন অসুবিধা ছিল না, শিখা খুব ভাল মনেই আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, আমার ভিতরের কথা কিছুই জানতে পারেনি, অথচ আমার ব্যাপারটা কী জঘন্য। কিন্তু আমি তো ওসব চাইনি, ভাবিওনি। ফেরবার পথে আমি চোখ তুলে তাঁবার থালার মতন চাঁদটার দিকে তাকিয়েছিলাম, সেটা তখন নিম গাছের মগড়ালটাকে একটু পার হয়ে গেছে। ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকে আমি শুইনি, চৌকির ওপর বসেছিলাম, শিখা বলেছিল, 'শুয়ে পড়ুন না, আমি আপনাকে জল দিচ্ছি।'

আমি বলেছিলাম, বসতেই ভাল লাগছে। তখনো আলো জ্বলেনি, কিন্তু ছেলেদের দু-একজন ক্যাম্পে ফিরে এসেছিল, বলেছিল, এখুনি আলো জুলবে। একজন এসে আমার পাশে বসেছিল, আমার গায়ে হাত রেখেছিল, আমি চুপ করে ছিলাম। বসা অবস্থায় চাঁদটাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমার বুক আর পেটের কাছে আলো পড়ছিল, পরের দিন নাকি এস ডি ও আসবে, কিন্তু আমি কিছুই যেন শুনছিলাম না, দেখছিলাম না, কেমন একরকম হয়ে গিয়েছিলাম। গ্লুকোজের জল খেয়েছিলাম শিখার হাত থেকে! গেলাসটা ও আমার হাতে দেয়নি, মুখের কাছে ধরে ধরে খাইয়ে দিয়েছিল, আর কী আশ্চর্য, আমি তখন শিখার মুখের দিকে তাকাইনি অথচ ওর মুখটাই যেন আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, আর সেই প্রথম আমার মনে

হয়েছিল, এমন একটা সুন্দর মুখ আমি জীবনে কোনদিন দেখিনি, মাইরি। আসলে কথাটা তো একদম বাজে, শিখার থেকে অনেক সুন্দর মুখ আমি দেখেছি, কিন্তু সেই সময়ে মনে হয়েছিল, শিখার মুখটা কী অদ্ভুত সুন্দর। জল খাওয়াতে ওর একটা হাত আমার গলার কাছে কাঁধের ওপর রেখেছিল, সেটা যেন আমি টেরই পাচ্ছিলাম না, অথচ ইচ্ছা হচ্ছিল শিখা আমাকে একটু জড়িয়ে ধরুক, একটু আমার গায়ে হাত দিক। ওর মুখটা যেন চোখের সামনে ভাসছিল, সুন্দর মুখ, আর সুন্দর মুখ হলেই, মুখের ভাবটাবগুলোও কেমন একরকম অদ্ভুত হয়, যেন চোখে হাসি হাসি ভাব, ঠোঁটের কোণেও সেইরকম, হাসছে না অথচ হাসি হাসি ভাব, এইরকম দেখছিলাম। পৃথিবীর যে কেউ এলেও যেমন আমাকে অনশন থেকে ফেরাতে পারতো না, দাবী না মেটা পর্যন্ত খাওয়াতে পারতো না, ঠিক তেমনি মনে হচ্ছিল, শিখার মুখটা কেউ আমার চোখ থেকে সরাতে পারবে না। জল খেতে খেতেই আলো জ্বলে উঠেছিল। দেখেছিলাম, কৃষ্ণাও একজনকে জল খাওয়াচ্ছিল। আমি তখন শিখার মুখের দিকে তাকাইনি, ইচ্ছা থাকলেও পারিনি, অথচ ভীষণ দেখতে ইচ্ছা করছিল। জল খাওয়া হয়ে যাবার পরে, গেলাসটা সরিয়ে নিয়েছিল, একজন একটা সিগারেট আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আমার খেতে ইচ্ছা করছিল না, বলেছিলাম, ভাল লাগছে না। হাতের পিঠ দিয়ে মুখ মোছবার সময়, শিখার দিকে আমি তাকিয়েছিলাম, শিখাও তাকিয়েছিল, জিজ্ঞেস করেছিল, ‘আর একটু খাবেন? আমি মাথা নেড়েছিলাম, চোখ ফেরাব ভেবেও ওর দিকে তাকিয়েছিলাম, শিখা এমনভাবে চোখটা নামিয়ে নিয়েছিল যেন আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ওর হঠাৎ কেমন হয়ে গিয়েছিল। সেটা আমি বলতে পারব না, কেমন হয়ে গিয়েছিল—না, রাগ বা বিরক্ত না, অন্যরকম, যেটা দেখলেই মনে হয়, ও বুঝি একটু কেমন অবাক হয়ে গেছে, একটু লজ্জা পেয়ে গেছে। স্‌সাহ্‌, কত কীই মনে হয়েছিল, যত্‌তো এলেবেলে ভাবনা, বলে কত হাতী গেল তল, মশা বলে কত জল, আ বে লে লে যাহ!

যাই হোক, সেই প্রথম দিনের ছোঁয়াছুঁয়ির কথাই বলছিলাম, ওহ, তার যে কী এফেক্ট না, কতদিন ধরে যে চলেছিল, আর কী সব আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল আমার মনের মধ্যে সেও একরকমের ভূতুড়ে ব্যাপার বললেই হয়। ছ'দিন হাঙ্গার স্ট্রাইক চলেছিল, এস ডি ও এসেছিল, শেষ পর্যন্ত গভর্নিং বডির জাদুদের থোতা মুখ ভোঁতা হয়েছিল, তবু খচ্চরগুলোর ওপর আজও আমার রাগ যায়নি, শহরের সেই মান্যিগণ্যি লোচ্চাগুলোর জন্যে কিনা ছটা দিন না খেয়ে থাকতে হয়েছিল। এখন তো মান্যিগণ্যি হওয়ার পলিসি সব শিখে গেছি, ওরা সব মুখোস আটা বদমাইস, তার সঙ্গে স্ট্যাটাস মেনটেন করে যাওয়া, আমার বড়দা মেজদা এখন যেমনটি হয়ে উঠছে। যা, তোরা তাই কর গিয়ে, আমি গুণ্ডাই থাকব। বাবাকেও দেখেছি, তোদেরও দেখছি, আমার কাছে নতুন কিছু না, একমাত্র তফাত হল, দাদারা রাজনীতি করে, বাবা তা করতো না।

কিন্তু সেই ছ-দিনের এফেক্ট, স্‌সাহ্‌ ছত্রিশ দিন ধরে চলেছিল। মনের সে যে কী একটা অবস্থা না, তা সে যাই হোক গে, অবাক হতে হয় যে-স্যারটির চাকরিতে বহালের জন্যে ছ-দিন না খেয়ে ছিলাম, তার সঙ্গেই পরে পরীক্ষার হলে—ধূ-র, সে কথা যাক গে, যে মেন গেট নিয়ে অতো ঝামেলা, সেই মেন গেট ঠিকই আছে, কিন্তু পাশ ঘেঁষে যতটা জমি ছিল, যেখানে আমাদের ক্যাম্প হয়েছিল, তার ওপরেই তো গর্ভনিং বডির মেম্বার বে-নামেতে সেই বিল্ডিং হাঁকিয়েছে, এখন দেখা গিয়ে, সেখানে একতলাতে কী রমরমা বিজনেস চলেছে। ছেলেদের সিগারেট চা, খাতা পেন্সিল কলম লজেন্স তো বাদই দিচ্ছি, আরো কত কী রপোট চলেছে—তা যাকগে সে কথা, আমি শিখার কথাই বলছি, সেই ছ'দিনের এফেক্ট যে আমাকে কী সব কাণ্ড করে দিয়েছিল, কোথায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল, কারণ তারপরেও আরো কয়েকবার শিখা আমাকে ছুয়েছিল—কিন্তু গুলি মারো সে সব কথায়, মোটের ওপর তারপর থেকে আমি আর শিখাকে ছেড়ে থাকতে পারিনি। থাকতে পারিনি মানে কী, একটা কুকুরের মতই প্রায় ওর পেছনেই লেগে আছি, তা বলে কি আর এদিক ওদিক টীক মারিনি, না শিখাই মারছে না, তবু শিখাকে আমি ছাড়তে পারিনি। কিছু যে পাইনি, তা না, তবে সেটা আমার কাছে পাওয়া বলে মানেই হয় না, সে পাওয়াটা যেন কিছুই না। অথচ আর কী-ই বা পাওয়া যেতে পারে, ওকে তো আর কেটেকুটে মাংস বানিয়ে খেয়ে ফেলা যায় না, যদিও এক এক সময় সত্যি মনে হয়, ওর ঠ্যাঙ দুটো ধরে ছিড়ে ফেলে দিই—সেই কী বিচ্ছিরি ব্যাপার, কিন্তু এ কথা আমার বারে বারে মনে হয়, পাইনি, পাইনি, ওকে আমি পাইনি। কী পাইনি, তা বুঝিয়ে বলতে পারি না, ওটাও একটা ভূতুড়ে ব্যাপারের মতনই, তবে এমনি ওর শরীর-টরীর সবই আমার দেখা জানা আছে, বেশ ভালভাবেই জানা আছে, আর সে জানাটা এমন একটা জানা, সত্যি, অন্য কোন মেয়ের কাছে সেটা কখনোই জানা যায় না। কিন্তু আমি কি, স্‌সাহ্‌, তাও বুঝিয়ে বলতে পারি নাকি, কী জানা আছে। ছাই, ওসব আমি বুঝিয়ে বলতে পারি না, কী জানা আছে, মোটের ওপর শিখাকে পেলে আর কোটি মেয়েও চাই না, এই আর কী, এবার বোঝ স্‌সাহ্‌, ব্যামোটা কোথায়। একে বলে ভূতে পাওয়া রোগ, ভূতুড়ে ব্যাপার। তবে এই শরীর-টরীর যে কারণে ভাবছিলাম, আমার সবই জানা আছে, এই যে শিকের গরাদের মত জামাটা ঢল খেয়ে যাওয়ায় ওর বুকের যতটা দেখা যাচ্ছে, সব আমার জানা, তবু হাতটা যেন দারুণ খিদেয় কেউ কেউ করছে, কারণ কিছুতেই খিদে মরে না, সব সময়েই নতুন নতুন মনে হয়।

কিন্তু ও কি সত্যি এদিকে ফিরবে না, একটা কথাও বলবে না! এবার আমি ওকে জোর করে ধরে, আমার দিকে ফেরাই। দু কাঁধের ওপর হাত রেখে আমার দিকে ফিরিয়ে ডাকি 'এই!'

শিখা তৎক্ষণাৎ দু' কনুই দিয়ে আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। হাতে প্রজাপতিটা ধরা, তা-ই কনুই দিয়ে আমার বুকের কাছে ধাক্কা দিয়ে, আমাকে সরাতে চাইল, আসলে ও নিজেই

একটু সরে গেল আর আমার দিকে রেগে তাকালো। ওই যে সেই গান আছে না, এমন মাটিতে চাঁদের উদয়, কে দেখবি আয়, আমার ঠিক তেমনি করে বলতে ইচ্ছা করছে, মেয়ের এমন রাগ কে দেখবি আয়। একেবারে ছবি, মাইরি বলছি, সেই, সেই যে বলছিলাম না, সিনেমা সিনেমা। কিন্তু শিখা তো সত্যি আর সিনেমার ছবি না, মিছি মিছি রাগ দেখাচ্ছে না, ওর রেগে যাওয়া চোখ দুটোতে জলও রয়েছে, সেই ছবির মতই। আঁচলটা তেমনি লুটিয়ে পড়েই রইল, আর লাল নীল হলুদের ডোরাকাট জামাটা বুকের কাছে ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো, জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে কি না, তা-ই। ওর এরকম চেহারা, আমি আরো কয়েকবার দেখেছি, এই রকম রেগে যাওয়া লাল লাল চোখ, অথচ জল এসে পড়ায় একটা টল টল ছল ছল ভাব, নাকের পাটা একটু একটু ফোলানো, কাঁপা কাঁপা, ঠোঁট দুটো শক্ত করে টিপে রাখা। সেই একদিনের কথা আমার মনে আছে, অথচ সেটা প্রথম দিনের কথা না, বরং ও সেদিন বেশ খুশি মনেই রাজী হয়েছিল, আর তাতেই আমি বেশী ক্ষেপে গিয়েছিলাম কি না জানি না, এমন কাণ্ড করেছিলাম, যাচ্ছেতাই। আরে, খাবি তো, থালাটা ভেঙে চুরমার করে নাকি। উহ, সেদিন দেখেছিলাম, আমার কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে—ওটাকে ছাড়া পাওয়া বলে না, নিস্কৃতি পাওয়া বলে, পেয়ে উঠে ঠিক এমনি করেই তাকিয়েছিল আমার দিকে কী সুন্দর হাসিখুশি ছিল তার একটু আগেই, আর কী মূর্তিই হয়ে উঠেছিল। কেবল একটা কথাই, নিচু গলায়, কিন্তু ফুঁসে উঠে বলেছিল, 'পশু!'

তখন আমার চোখে নেশা থাকলেও, একেবারে ল্যাজ গুটিয়ে যাওয়া, চোখ পিটপিটনো কুকুরের মতন হয়ে গিয়েছিল। সে রাগ কাটাতে অনেকদিন লেগেছিল, অনেক হাতে পায়ে ধরতে হয়েছিল। কিন্তু সেটা ছিল ওর শরীরের ব্যাপার, আর এটা তো একটা প্রজাপতি। প্রজাপতিটার জন্যে সত্যি ও এরকম করছে, নাকি, অন্য কোন মতলবে আছে, যাতে এ-ই দিয়েই সকালবেলাটা ভাগিয়ে দিতে চায়। কারণ, জানে তো ও ওরকম করে থাকলে, আমি বিশেষ সুবিধা করতে পারব না, হয়তো চলেই যেতে হবে। অথচ, সত্যি তো আমি ওটাকে মারতে চাইনি। বললাম, 'আমি কি ওটাকে মারতে চেয়েছি নাকি, ও নিজে তো— '

আমার কথা শেষ হবার আগেই, ঠিক যেমন করে 'পশু' বলে উঠেছিল একদিন, তেমনি নিচু স্বরে ফুঁসে বলে উঠলো, 'গুণ্ডা!'

কথাটা শুনেই এমন হাসি পেয়ে গেল, আমি খ্যাল খ্যাল হেসে উঠলাম। বললাম, 'গুণ্ডা বলছ?'

ও যেন প্রায় ঝাঁকিয়ে উঠলো, বলব, 'হাজার বার বলব, একটা গুণ্ডা তুমি?'

আবার হেসে উঠে, আমি বললাম, সে তো সবাই বলে আমাকে।

'আমিও বলব! গুণ্ডাকে গুণ্ডাই বলব।'

'বল না বুঝি!'

'আরো বলব, তুমি গুণ্ডা, গুণ্ডা, গুণ্ডা।'

যেন একটা ছোট মেয়ে ঝগড়া করছে, ঠিক এমনি ভাবে বলছে। হাসি পেলেও, আমার ভিতরে ভিতরে একটু রাগও হচ্ছে। একটা প্রজাপতির জন্যে—অথচ ও যেরকম করছে, তাতে এটা আমি জানি, ও সত্যি ন্যাকরা করছে না। বললাম, ঠিক আছে, আমি তো গুণ্ডাই।

'তা-ই এটার সঙ্গেও গুণ্ডামি করতে হবে, না?

মানে প্রজাপতিটার সঙ্গে। আমি ওর কাছে গেলাম, ওর গলাটা ধরতে গেলাম, ও গোটা শরীরে একটা ঝাঁকুনি মেরে বললো, না।

আসলে, ওর চেহারা, রাগ, চোখ মুখ, শরীরের ঝাঁকুনি দেখে, আমার ভিতরটা অন্যরকম ভাবে তরতরিয়ে যাচ্ছিল। এ সে-ই, অনশনের দিনের মতই, ও ছিল একরকম মনে, আমার ওদিকে অন্যরকম। আমি বললাম, "কিন্তু আমি ওটা তোমার জন্যেই ধরতে চেয়েছিলাম।'

ও তেমনি ভাবেই বললো, 'আমি তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিলাম, না? বারণ করলাম না তোমাকে। তবু তুমি ওই পালকের ছপটিটা দিয়ে মারলে, তবে ছাড়লে। রাক্ষস

কোথাকার।'

আবার আমার হাসি পেয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু একটু সামলানো দরকার। প্রেমিকাটি বড় রেগে গেছে, সকালবেলাটা মূলে হা-ভাত হবে। অথচ রাক্ষস কথাটা শুনে এত হাসি পেতে লাগলো, তবে রাক্ষস বলে, ও যেন একটু শান্তি পেল, আর মুখের ভাবটা একটু জুড়িয়ে এল। যেরকম জ্বলছিল, যেন ভস্ম করে ফেলবে। আর স্‌সাহ্‌, প্রজাপতিটার কাণ্ড দেখ, ওটা এখনো পাখা ঝাপটাচ্ছে। তবে আগের মতন আর না, ছুঁড়ির হয়ে এসেছে, তবু কীরে বাবা, ও কি এক পাখাতেই উড়বে নাকি। তারপরে, ঠিক যা ভেবেছিলাম, শিখা তা-ই বললো, 'তোমাকে যদি কেউ এভাবে মারে, এরকম আধমরা করে ফেলে দেয়, তখন তোমার কেমন লাগবে।'

'আমি কি ওর মত পালাতে যাব নাকি যে, কেউ আমাকে ওরকম মারবে।'

'ও কি পালাচ্ছিল নাকি! ও তো উড়ে উড়ে খেলছিল, নিজের মনে ছিল, কী করে জানবে, তোমার মধ্যে পিশাচটা জেগে উঠছে।'

সে কথাটা ঠিক, প্রজাপতিটার জানবার কথা নয়, আমি তখন কী চাইছিলাম। ও ওর নিজের মনেই ছিল। দেখলাম শিখা আচল তুলে, চোখ দুটো মুছে ফেললো, আস্তে আস্তে চেপে চেপে মুছলো, যাতে সকালবেলার পেনসিলে টানা কাজলটুকু না উঠে যায়। আমি তবু বললাম, 'তুমি দেখেছিলে, ও কী রকম ছেউটি ছুঁড়ির মত করছিল।'

কথাটা শুনে, ভুরু কুঁচকে একবার যেন অবুঝের মত তাকালো, তারপরে বললো, 'তোমার তো সবই কোন না কোন ছুঁড়ির মত, ছোটলোক কোথাকার।'

তবু ঠাণ্ডা হ মা, যা বলিস তা বল, একটু ঠাণ্ডা হ, মনে মনে এ কথাই বলি। অবিশ্যি তা-ই হয় শিখা, আগের থেকে অনেক ঠাণ্ডা হয়ে ওঠে। তবে সে-ই যেন কী দেখে একেবারে মোহিত হয়ে যাচ্ছে, সে ভাবটা তখনো যায়নি, নজরটা আবার প্রজাপতিটার দিকেই নেমে গিয়েছিল, আর নাকের পাশে, ঠোঁটের কোণে, কষ্টের কিছু দেখলে যেরকম হয়-না, সেইরকম দেখাচ্ছিল। আমি ওর কাঁধে একটা হাত রাখলাম, তখনি ঝাপট মারতে যাচ্ছিল, কিন্তু গিয়েও, কাঁধটা একটু কোঁচকালো মাত্র। আমি বললাম, 'প্রজাপতিটার জন্যে সত্যি এত কষ্ট লাগলো।'

শিখা জবাব না দিয়ে মুখ তুললো, চুলের একটা গোছা ওর গালের ওপর এসে পড়েছে, তার পাশ দিয়ে একটা চোখ প্রায় ঢাকা দেখাচ্ছে, ও আমার দিকেই তাকালো। খানিকক্ষণ তাকিয়েই রইলো। কিছু বললো না, যেন আমাকে বোঝবার চেষ্টা করছে—বোঝবার আবার কী আছে কে জানে, আমি মোটের ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি না, ওসব আমার একটু ন্যাকামি ন্যাকামিও লাগে, তবু ওই যে সেই, কী যেন একটা আছে ওর মধ্যে', সে চিন্তাই খেলছে। ও মুখটা নামিয়ে, আবার দেখতে থাকে, থাকতে থাকতে বলে উঠলো, কী সুন্দর, ইস্! তোমার কষ্ট হচ্ছে না?'

আমার দিকে না তাকিয়েই ও বললো। কিন্তু কষ্ট কই, আমি তো সত্যি কোন কষ্ট পাচ্ছি না, বরং একটা কী রকম বিদকুটে ভাবই লাগছে আমার, নুলোর মত ডানাটা ঝাঁপাতে দেখে। কত কী-ই তো কত সময় এখানে সেখানে মরে পড়ে থাকতে দেখি, পোকামাকড়, ইঁদুর, আরশোলা, এমন কী, অনেক মানুষকেও মরে পড়ে থাকতে দেখেছি, তার জন্যে কষ্ট তো কিছুই হয়নি কখনো। একটা উলটো ভাবই আসে, গা-টা কেমন করে ওঠে, খারাপ লাগে, সেটা কষ্ট লাগা না। শিখা আবার বললো, 'আর জান, ওরা সত্যি সত্যি বিয়ের ঠাকুর।'

আমার মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়ে গিয়েছিল, 'আমার ইয়ের ঠাকুর', কিন্তু চেপে গেলাম। আচ্ছা, শিখা কি সত্যি সত্যি এ কথা বিশ্বাস করে নাকি, ওর মত রেপুটেড মেয়ে, শহরের নাম-করা—খেলোয়াড়ি যাকে বলে, সেই মেয়ে কি সত্যি এসব বিশ্বাস করে আমাকে শোনাচ্ছে। ভাল একটা বিয়ে-টিয়ের জন্যে বোধহয় মেয়েরা সবাই এটা বিশ্বাস করে, যেমন বেশ্যাদেরও দেখি, গঙ্গা থেকে নেয়ে ফেরবার সময়, শিবের মাথায় একটু জল না দিয়ে পারে না। কেন, তখনো কি তার শিবের মত বর পাবার আশা নাকি। স্‌সাহ্‌—এসব আমি জানি না। শিখা আবার বলে উঠলো, 'মানে প্রেমের দেবতা'

তার মানে, বিয়ে, প্রেম, এসব নিয়ে শিখার মাথাব্যথা, একটা ভাল বিয়ে, একটা ভাল প্রেম, এসব কিছু নেই বলেই প্রজাপতিটার জন্যে ওর এত মায়া। অথচ ওর কাছে ওসবের কী দাম আছে, তা এই নুলো পোকাটাই জানে। প্রেমের তো বাবা শেষ নেই, ওদিকে বিয়ে যে স্‌সাহ্‌, কতজনের সঙ্গে পাতিয়ে বসে আছে, কে জানে। তবে, ওর কথাগুলো শুনতে শুনতে আমার তখন আর ওসব মনে থাকে না। আমি ওর চিবুকে হাত দিয়ে, মুখটা তুলে ধরি, ও আমার দিকে তাকায়। তাকিয়ে চিবুকটা নামিয়ে নেবার চেষ্টা করতে, আমি বললাম, 'এক ছক্কা উঠা লুঁ?'

চিবুকটা নামিয়ে নিতে গিয়ে, ও আমার মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো, ভুরু কুঁচকে অবাক হয়ে—এরকম করলেই, আমার ঠোঁট চুলবুলিয়ে ওঠে, কারণ এখন ওর ঠোঁট দুটো আলগা হয়ে, সাদা কয়েকটা দাঁত দেখা যাচ্ছে, আর এই ভাব করে জিজ্ঞেস করলো, ছক্কা মানে?

আমি বললাম, সে তুমি বুঝবে না, ওসব হচ্ছে আলাদা জগতের কথা। মুচু মুচু, মুচু জান না? বলতে বলতেই শব্দ করে, ওর ঠোঁটের ওপর ঠোঁটটা ছুঁইয়ে দিই। ও অমনি ঠোঁট দুটো আরো ফুলিয়ে বলে উঠলো, 'অসভ্য! অসম্ভব। তখন একেবারে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে শুষে নিলাম, নিতে নিতেই টের পেলাম, ঠোঁট দুটোকে টেনে নেবার চেষ্টা করছে, কিন্তু—হুম, যা ভেবেছি, স্বাদে আর গন্ধে দুটোতেই টের পাওয়া গেল, সকালবেলা ও নিশ্চয়ই পরোটা আর বেগুন ভাজা খেয়েছে। ওকে ছেড়ে দিয়ে, সে কথাই জিজ্ঞেস করলাম, সকালবেলা পরোটা আর বেগুন ভাজা খেয়েছ, না?

শিখা প্রায ফুঁসে উঠে বললো, 'বেশ করেছি, অসভ্য কোথাকার।

কিন্তু প্রজাপতিটা তখন ওর হাত থেকে পড়ে গেছে। ঠোঁট মুছতে মুছতে সেটাকে খুঁজতে গিয়ে, যেই এক পা সরেছে, অমনি প্রজাপতিটাকে পা দিয়ে চাপা দিয়ে ফেললো, বিয়ের ঠাকুর, প্রেমের দেবতাটির একেবারে স্বর্গলাভ, তাও শিখার পায়ের তলায় পড়ে, পেটটা একেবারে চেপটে গেছে। শিখা ডুকরে ওঠা বলতে যা বোঝায়, সেইরকম করে উঠলো। আমি বলে উঠলাম, 'যাহ্‌ স্‌সাহ্‌!'

নিচু হয়ে সেটাকে ধরতে গিয়েও, শিখা হাত ফিরিয়ে নিয়ে এল, আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম, আসলে চমকে গিয়ে একটা কষ্টের ভাব হলেও, চেপটানো প্রজাপতিটাকে ধরতে ওর কী রকম বিঘনি লেগে গেছে। তবে, চেপটে গেলেও রসটস কিছু বেরোয়নি। দেখলাম, শিখা ওটাকে দেখতে দেখতে, কী রকম আনমনা হয়ে গেল, একটা যেন ভয় ভয় ভাব ওর চোখে ফুটে উঠলো, ও যে কপালে হাত ঠেকালো, নমস্কারের মত, সেটা ও নিজেই যেন জানে না। আর একটা পাখনা যে কোথায় গিয়ে পড়েছে, দেখাই গেল না। আমি এগিয়ে গিয়ে, প্রজাপতিটার পাখনা ধরে টেনে তুললাম, আস্তে আস্তে তুললাম, যাতে মেঝেতে খানিকটা আটকে না থাকে। পুরোটা তুলে, জানালার পর্দা সরিয়ে, বাইরে ফেলে দিলাম, যাহ্‌ আপদ বিদায় হল। ফেলে দিয়ে, আমি ফিরতেই শিখা বলে উঠলো, 'তোমার জন্যই তো!'

কথাটার মধ্যে তেমন একটা রাগ ঝাঁজ যেন বিশেষ ফুটলো না, খালি একটা নালিশ মনে হল, তাও নালিশটা যে পুরোপুরি আমার ওপরেই, তাও যেন ঠিক মনে হল না। ওর মুখের ভাবটাও সেইরকমই প্রায়, তার ওপরে আবার চোখ জলে উলসে উঠবে কি না, কে জানে এক প্রজাপতি নিয়ে, সকালবেলাটা মাডার। ওর কাছে গিয়ে বললাম, 'আচ্ছা বাপু আমার জন্যেই, যা পাপ হবে, তা আমারই, হয়েছে তো? এখন একটু চা খাওয়াও তো।'

বলতেই, ফরকে চলে গেল অন্যদিকে, যেতে যেতে বললো, 'পারব না যাও।' বলে একেবারে ঘরের বাইরে। উঠোনে, সেই কূয়াতলার কাছে। বাড়িটা সেকালের তো, অনেকখানি জায়গা, ফেরেব্‌বাজ মজুমদার এর নাম, কী কায়দা করেই না বাড়িটা বাগিয়েছিল, বেশ খানিকটা জায়গা, কয়েকটা গাছপালা, সীমানাটা রাঙচিতের বেড়া দিয়ে ঘেরা, বড় বড় রাঙচিতে, মানুষ ছাড়িয়ে ওঠা, বাইরের থেকে ভিতরের কিছু দেখা যায় না, আর কুয়োটা উঠোনের এক কোণে। পর্দাটি সরিয়ে—পর্দা যে এ বাড়িতে কেন আছে, কে

জানে। আমাদের বাড়িতে আছে, তার একটা মানে বুঝি, এসব বাড়িতে আবার এত কিসের। পদটি সরিয়ে দেখি, শিখা নিজেই দড়ি ফেলে কুয়া থেকে জল তুলে, নিজের পায়ের ওপর ফেলে, পা দিয়ে ঘষে ঘষে ধুয়ে ফেললো। তার মানে, ওর গা ঘিনঘিন করছে, সেটা বোঝা গেল। পা ধুয়ে আবার এ ঘরেই এসে ঢুকলো, এ ঘরটাই হল ওদের বসবার ঘর, বন্ধুদের র্‍্যালা রপোটের ঘরও। আমি ওদের বাপটার কথা ভাবি, লোকটা যে কখন বাড়িতে আছে, কখন নেই, কোন কাকপক্ষীও টের পায় না। আমি তো এ ঘরে কোনদিন দেখতেই পাইনি, আর যদি বা কোন সময় ঢুকতে বেরোতে দেখা হয়ে যায়, তাহলে যেন চেনা নেই,শোনা নেই, আমিই বা কে, সে-ই বা কে, এমনি একটা ভাব করে চলে যায়। যেন সে বাড়ির মালিক না, ছেলেমেয়েরা তা ছেলেমেয়ে না, কে যায়, কে আসে, কোন দিকে লক্ষ্য নেই, তুমিও যা, আমিও তা-ই। ওদের দাদা দুটোও ঠিক সেইরকম, স্‌লাদের শিরদাঁড়া আছে কি না, বুঝতে পারি না। একেবারে বাপের মত না, একটু-আধটু কথা বলে, তার ওপরে আমি তো আবার দুই দাদারই সসত্তুর, কেননা, ওর দাদারা আমার দাদাদের দুই দলে। আমার দাদারা যখন আমার কেউ না, ওরাই বা কেন হবে। তা বলে, এক-আধটা কথা কোনরকমে বলা, যেন দেখতেই পাচ্ছে না, অথচ খুব যে একটা গোসা গোসা ভাব, তাও না, ওই ওদের বাপের মতই, নির্বিকার। যেন জানেই, আমি কার কাছে এসেছি, ওদের আমার কোন দরকার নেই; কিন্তু আমার দাদাদের বেলাও তো তা-ই, দাদারা কি ওদের কাছে আসে নাকি। দাদারা বা অন্যান্য যেসব ছেলেরা আসে, সকলেরই তো একদিকেই নজর, জানি না অবিশ্যি শিখার ছোট বোনটার দিকেও কারুর কারুর নজর আছে কি না, সেটিও বেশ তৈরী হয়ে উঠেছে, এ বছর কলেজে যেতেও আরম্ভ করেছে, তা বেশ, এ বড় মজার কল চলছে চলুক, মিস্তিরি ভাই থেম না। আমার দাদাদের সঙ্গেও যে শিখার দাদারা, এ বাড়িতে বেশী কথা বলে, তা না। দলের কথা তো অন্যখানে, এখানে ওসব বিশেষ হয় না, তবে একটা কথা তো চালু রাখা যাচ্ছে, "আমরা শিখার দাদার কাছে এসেছি। যেমন বেলাদির পুরুষ বন্ধুরা চালু রেখেছে 'আমরা তো বেলার বাবার কাছে—হেঁ হেঁ হেঁ, মজুমদার মস্‌সাইয়ের কাছে এসসেছি। অথচ খোঁজ নিয়ে দেখ, কোন সময় কোন মজুমদারেরই পাত্তা নেই। আমার বাবা ওসব নেই, আমি শিখার কাছে আসি, কারুর বাপ দাদাদের কাছে না। কিন্তু এসব ভাবলেই, আমার মেজাজটা কী রকম গোলমাল হয়ে যায়, ভিতরটা কী রকম জ্বলতে থাকে, রাগে আর ঘেন্নায় মাথার ভিতরটা দপদপ করতে থাকে, আর এ সময়েই, একটা ভীষণ আক্রোশে শিখাকে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছা করে। আমি যেন এ সময়ে নিজের মনেই দেখতে পাই, সেই কৃষ্ণার মতই, শিখাকে ধরে বড়দা চুমো খাচ্ছে, না হয় সেই ঝিয়ের মেয়েটার মতই, মেজদা খামচে খামচে শিখাকে আদর করছে। আরো যারা আসে, তারাও ওইরকমই কিছু করছে, হয়তো অনেকটা আমার মতন। কোনদিন চোখে পড়লে, কাউকেই ছেড়ে কথা কইব না আমি। ছেলেবেলায় যেমন বাগানে ব্যাঙ পিটিয়ে মেরে ফেলতাম, সেভাবেই মেরে ফেলব, কিন্তু কোনদিনই কিছু চোখে পড়েনি, অথচ এরকম একটা চিন্তা আমাকে কিছুতেই ছেড়ে যেতে চায় না, যে কারণে, অন্যদের ছেড়ে, আমার নিজেকেই পিটিয়ে মেরে ফেলতে ইচ্ছা করে, মনে হয় আমাকে কেউ একটা কাঁটা খোঁচানো ফাঁদে আটকে রেখে মজা দেখছে, আর আমি মাথা কুটে মরছি সেখান থেকে বেরুবার জন্যে। তবু শিখাকে আমি বলতে পারি না, রাগারাগি খিস্তি-খেউর করি, সেটা না করে পারি না এক এক সময়—এই এখনই যেরকম মনের অবস্থা হয়ে উঠছে—ইচ্ছা হচ্ছে ওকে যা-তা বলে গালাগালি দিয়ে উঠি। কিন্তু একটা কোন হেস্তনেস্ত করতে পারি না, কারণ সেই যে সেই একটা ভূত চেপে আছে আমার ঘাড়ে, 'ওর মধ্যে কী যেন একটা আছে। যেটা বেলাদিকে দেখলে কখনোই মনে হয় না। বেলাদি খারাপ জানি, তবু এক-একটা আছে না, জানছি খারাপ, বজ্জাত বা খাণ্ডারনি নষ্ট অথচ একটা কী রকম কষ্টই হয় তাকে দেখলে। শিখা তাও না। তাও না, এও না, অথচ আমি যেন ওর কাছে যেতে যেতে কোথায় আটকে পড়ে আছি, নিজেই আটকে পড়ে আছি, নাকি শিখাই আটকে রেখেছে তাও বুঝতে পারি না। এ একটা জঘন্য পাপের মত মনে হয়।

শিখা পা ধুয়ে এসে ঘরে ঢুকলো, তখনো কাপড়টা খানিকটা টেনে তোলা, যেখানে ওর বেশ নিটোল পায়ের গোছার ওপরেই অল্প অল্প লোম দেখা যাচ্ছে, আর গোছার ওখানটা অনেক ফসা, যেন কচিলতার রঙের মত, আর তাতে অল্প অল্প লোমগুলোকে দেখাচ্ছে যেন ঠিক হালকা ছাড়া ছাড়া দুর্বার মতন। পা-টা ও মুছলো না, মিহি মিহি ধোয়া ভেজা পা, নখগুলো মাপ করে কাটা, তাতে দু-একদিন আগের পালিশ লাগানো দাগ এখনো রয়েছে। আলতার কোন দাগ নেই আজ, তবে মাঝে মাঝে ও আলতাও পরে। ও এসে টেবিলের কাছে, একটা কাঠের পুরনো চেয়ারে অনেকখানি চেপে বসলো, যাতে ওর পা মেঝে না ছোঁয়, আর সেইভাবে পা দুটো আস্তে আস্তে দোলাতে লাগলো, তাতে ওর কোমর বুক সবই এমনভাবে দোলা খেতে লাগলো যে—নিকুচি করেছে, কোন মানে হয় না। কিন্তু সেই নালিশ জানানো ভাবেই, টেরে টেরে আমাকে দেখতে লাগলো, তখন আমি আবার চায়ের কথা বলতে গেলাম, আর তখুনি ও আবার বলে উঠলো, প্রজাপতিটা সত্যি সুন্দর ছিল।

এখন ও খানিকটা মন-মরা মন-মরা, মুষড়ে যাওয়া ভাবে যেন বললো। আমি বললাম, ‘এক কাজ কর না।’

‘কী।’

‘তোমার সেই কেশবদার দেওয়া, রুপোলি ফুটকি নীলাম্বরটা নিয়ে এস না।’

‘ওটা মোটেই কেশবদা দেয়নি, বাজে বকো না। কিন্তু ওটা দিয়ে কী হবে, শুনি?’

‘কেস্‌সবেন্দু দাদা যদি না দিয়ে থাকে, তাহলে তোমার পুন্‌নেন্দুদাদা দিয়েছে। নিয়ে এস না, ওটার থেকে খানিকটা কাপড় কেটে, একটা প্রজাপতি বানিয়ে দিচ্ছি, সেটাকেই টাঙিয়ে রেখ।’

এতক্ষণ পা দোলানি ছিল, আমার শেষের কথা শুনে ওর পা দোলানি বন্ধ হয়ে গেল। ভুরু কোঁচকালো, তারপরে ঘাড়টাকে বাঁকিয়ে বললো ‘ফাজিল, কাপড় কেটে প্রজাপতি বানাবে, না?’ বলেই, পা দুটো মাটিতে ঠেকিয়ে ঝুঁকে বললো, ‘আমার কেশবদা তোমারই বড়দা, আর আমার পূর্ণেন্দুদা, তোমারই মেজদা, সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন।’

‘তবে আর কী, আমি একেবারে উদ্ধার হয়ে গেলাম। তবু বললে না, কে দিয়েছে শাড়িটা।’

‘ছোটলোকের মত কথা বলো না।’

‘র্‍যাশন ইনস্পেকটর অনিল তো চাল দিয়েই চালায়, কাপড়ও দেয় নাকি। ‘

শিখার প্রায় ফস মুখ এবার লাল হয়ে উঠলো, চোখ দুটোও সেইরকম। নিচু গলায়, ফুঁসে উঠে বললো, ‘ইতর।’

ও চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল, তার আগেই কাছে গিয়ে ওর কাঁধ চেপে ধরলাম! আমি হাসতেই চাইছিলাম যাতে ওকে জ্বালিয়ে খাক করে দিতে পারি, কিন্তু হাসিটা আসলে আমার দাঁতে দাঁত পেষার মতই ভিতরটা জ্বলছিল। কাঁধের ওপর থামচে ধরে এমনভাবে ওকে চেপে রাখলাম, যাতে হাজার ছটফট কবলেও নড়তে চড়তে না পারে। বললাম, যেন বেশ নরম গলায় বললাম, ‘কেন রে স্‌সিখু, আমার কথা কি সব মিথ্যা?’

বাহ্‌, নরম নরম গলায় কথা বলেও, নিজেরই মনে হল, আমি যেন বাঘের মত গর গর করে উঠলাম। শিখা রুষে উঠে মুখ তুলে আমার চোখের দিকে তাকালো। ওর চোখ দুটো ঠিক আগুনের মতই দপদপ করছে, অথচ যেন কিছু খুঁজে দেখলো আমার চোখে। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে। সেইরকম ফুঁসে উঠে বললো, ‘তোমার মত একটা গুণ্ডাকে সে কথা আমি বলব না, নীচ কোথাকার।’

বলেই ও আমাকে আবার ঠেলে উঠতে চাইল, কিন্তু তা আমি দিচ্ছি না। এখন আমার মাথার মধ্যে যে রকম টগবগিয়ে ফুটছে, আর এরকম বাইরে কারুর সঙ্গে যদি লাগতো, তবে এতক্ষণে তার লাশ পড়ে যেত, নিদেন একটা রক্তারক্তি তো বটেই। এখানে সেরকম কিছু ঘটাতে চাইছি না, ওর লাশ ফেলে দেওয়া বা মাথাটা ফাটিয়ে দেওয়া—এই কি সেই অনশনের এক সন্ধ্যায় দেখা শিখা, কথাটা হঠাৎ একবার মনে হল, আর আমি ওর জামার মধ্যে একটা

হাত ঢুকিয়ে দিলাম! ও আমার সেই হাতটা টেনে তুলতে চাইল কিন্তু এত শক্তি ওর নেই, তা ছাড়া এমনভাবে ধরেছি, বেশী টানাটানি করলে ওরই লাগবে—কাদা ডলে ঠেসে ছেড়ে দেব। কোথায় সুখ, স্বাদ কে জানে, সুখের আমি কিছু জানি না, বুঝি না, অনেকটা তো মনে হচ্ছে, বাবার টেবিলের তলায় নোংরা করে দেবার মতই যেন কিছু করছি—কেন করছি যেমন জানা ছিল না বা টেবিলের দরকারি কাগজ টেনে ছিঁড়ে দেওয়া, সেই রকম! অথচ আমি তো ওকে আদর করতেই চেয়েছিলাম। কী যে করছি, কিছুই যেন জানি না, বুঝতে পারছি না, কেবল একটা ভীষণ রাগ, ভীষণ আক্রোশ, অথচ একটা—কী বলব—অদ্ভুত যন্ত্রণা, যেন চোখে জল এসে পড়বে খুব জোরে কোথাও লাগলে, যেমন দাঁতে দাঁত চেপে রাখতে গিয়ে জল এসে পড়ে। আমি বললাম, তেমনি নরম গলাতেই, “আমি গুণ্ডা, আর সবাই ভাল-কেশব, পূর্ণেন্দু, অনিল……।’

কথা বলতে বলতে হাতকে আমি থামিয়ে রাখিনি, কিন্তু আমার কথা শেষ হবার আগেই, শিখা আবার একটা ঝটকা দিল, জোরে শব্দ করে কিছু বলতে গেল আর শব্দটা বেরুনো মাত্রই আমি ওর ঠোঁটে ঠোঁট চেপে দিলাম—দুটো ঠোঁট, কী তার স্বাদ কিছুই জানি না, যেন প্রাণপণ শক্তিতে কিছু একটা মুখে নিয়ে শুষতে লাগলাম, আর একটু পরেই রক্তের নোনা স্বাদ পেলাম, ঠোঁটের না মাড়ির কিছুই জানি না। শুষতে শুষতেই আমার চোখে পড়লো, শিখার চোখ দিয়ে জল পড়ছে, চোখের কোণ দিয়ে, গাল বেয়ে, আমার ঠোঁটের কষে এসে লাগছে, কিন্তু ও চোখ বুজে আছে, মুখে কষ্ট আর যন্ত্রণার ছাপ, তবু একটা হাত আমার বুকের ওপর রেখে তখনো ঠেলছে, পা দিয়ে আমার হাঁটুর কাছে ঠেলছে—যেন এর শেষ নেই, শেষ হবে না, কিন্তু—কিন্তু আমারই মনে হল, আমি পারছি না, আমার বুকের কাছে কী রকম করছে, চোখের সামনে যেন কিসের একটা পদ নেমে আসছে, আমার হাত-পায়ের জোর কমে যাচ্ছে, ঠোঁট আলগা হয়ে যাচ্ছে। আমি প্রায় গড়িয়ে পড়ে গেলাম ওর কোলের ওপর, টাইট প্যান্ট বলে, মেঝেতে হাঁটু গেড়ে পড়তে গিয়ে, পিছনে অনেকখানি পা ছড়িয়ে গেল, সেই অবস্থায় শিখা উঠে দাঁড়ালো। ও যে হাঁপাচ্ছে, আমি তা শুনতে পাচ্ছি, কাছেই দাঁড়িয়ে আছে, তাও টের পাচ্ছি। আমিও হাঁপাতে হাঁপাতে কয়েক সেকেণ্ড পরেই ঠেলে উঠলাম, আর তৎক্ষণাৎ শিখা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, যাবার আগে মনে হল, এক হাতে মাথার চুল ঠিক করতে করতে আর এক হাতে শাড়ির আঁচল দিয়ে ঠোঁট মুছে মুছে কী যেন দেখছিল—বোধহয় রক্ত।

শিখা বেরিয়ে গেল, চারদিকটা অসম্ভব চুপচাপ নিঝুম মনে হতে লাগলো, কেবল মাঝে-মাঝে হঠাৎ এক একটা পাখি ডেকে উঠছিল, যে ডাক শুনে, আমার যেন কেমন মনে হল, ওরা আমার বিষয়ে বলাবলি করছে—আবার সেই ভূতুড়ে ব্যাপার, যা শুনলে লোকের মার খাওয়া ছাড়া কোন রাস্তা নেই, কিন্তু এইরকম অবস্থাটাকে আমি জানি, এইরকম নিঝুম চুপচাপ, পাখির ডেকে ওঠা, কেননা, আমার অনশনের শেষে, অনেকগুলো দিন ঠিক যেন এভাবেই কেটে ছিল, সেই সব দিনগুলোর কথাই আমার মনে পড়ছে। আমার শরীরের শক্তি ফিরে আসতে কিছুদিন দেরী হয়েছিল, কিন্তু আমার ভিতরে কীরকম একটা গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। যেদিন অনশন শেষ হয়েছিল—ক'দিনই বা, ছ'দিন তো মাত্র, লোকেরা তার থেকে কত বেশী দিন করে, নাম-করা নাম-করা লোকেরা, তাদেরই আবার কত কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি শোনা যায়, অদ্ভুত কাণ্ড সব—কিন্তু সে তুলনায় ক'দিনই বা অনশন করেছিলাম! স্ট্রাইক সাকসেসফুল, খুব ঢোল পিটিয়ে আমাদের মাথায় করা হল, বাড়ি ফিরে এলাম। শিখার কথা আমার মনে ছিল, কিন্তু তার জন্যে যে মনের মধ্যে খুব একটা ছটফটানি আকুলিবিকুলি ভাব, তা মোটেই ছিল না, মনে হয়েছিল আমি কী রকম একটা অন্য লোক হয়ে গেছি। আমার মনে আছে, আমি মনে মনে বলেছিলাম, 'শিখা, আমি সারাজীবন তোমার কথা চিন্তা করব, তোমাকে আমি পাই না পাই, সেটা বড় কথা না, তোমাকে আমি মনের মধ্যে রেখে দেব।' সত্যি মনের মধ্যে রাখা যায়, পরে সেটা একটা ন্যাকামি মনে হয়েছিল। তবে আমার এই রকমই মনে হয়েছিল, কারুর সঙ্গে বিশেষ কথাবাতা বলতে ইচ্ছা করতো না, আর সে সময়েই আমার প্রথম মনে হয়েছিল, 'আমি কেন এই পৃথিবীতে। অনশনের কথা তো কয়েকদিন বাদে একেবারে যেন ভুলেই গিয়েছিলাম, সমস্ত ব্যাপারটা একটা কোন ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছিল না, তখনো গর্ভনিং বডিকে মেরে ঠাণ্ডা করার কথাই আমার ঠিক মনে হচ্ছিল, কেননা, সেই লোকগুলোর জন্যে না খেয়ে এত কাণ্ড করার কোন অর্থই হয় না, তবু আমার ভিতরটা কেমন ভার হয়ে উঠেছিল। আছে না একরকম, আমার মনে হয় পৃথিবীতে সব মানুষেরই বোধহয় এরকম কখনো কখনো হয়, কী যেন তার হয়েছে, সে কিছুই জানে না, বুঝতে পারে না, নিজেকে নিয়ে সে কী করবে! সে কেনই বা পৃথিবীতে এল—কারণ, এই যে আমি এসেছি—পরে এ ব্যাপারটাকে প্রায় খচরামি বলে মনে হয়েছে আমার, কেন আমি এসেছি, কেন গরুর বাচ্চা হয়, কাকের বাচ্চা হয়, এসব কথার কোন ঠিক অর্থই হয় না, কিসে কী হলে মানুষ জন্মায় বা গরুর বাচ্চা হয়, একথা সবাই জানে, তা-ই সেও কেন পৃথিবীতে এল, সেও তা জানে, যার জবাব ধাইয়ের চেয়েও বাবা মা-ই ঠিক বলতে পারে। আমার ঠিক তা মনে হয়নি, আমার মনে হয়েছিল, আমার খিদে পেলে আমি খাই, আমার কিছু করতে ইচ্ছা হলে আমি করি—না, এটাও ঠিক না, আমার যা করতে ইচ্ছা হয় তা-ই আমি কী করে করব, আমি যদি মনে করি কারখানার ম্যানেজার চোপরার মাইনে মজুরদের মতই করে দেব, আর মজুরদের মাইনে চোপরার মত, তাহলে কেউ শুনবে না; একমাত্র ঠ্যাঙনি খাব, তাহলে আলাদা কথা। সেই রকম ইচ্ছার কথাই বলছি, আমি নিজের ইচ্ছায় পৃথিবীতে আসিনি।

এ কথাটাও এক ধরনের ইয়ারকির মত লাগছে, কিন্তু এ কথা আমার তখন মনে হয়েছিল। তখন যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করতো, বা এখনো করে, তাহলেও আমি এই কথাই বলব, আমার একদম আসবার ইচ্ছা ছিল না। এই যে আমি সুখেন-সুখেন্দু,—বাবা কি বিচ্ছিরি নাম, যেন শুনলেই গা ঘুলিয়ে ওঠে, আমি কিনা সুখেন্দু, আমি কী জন্যে পৃথিবীতে এসেছি, আমার কী-ই বা করবার আছে, আমি বুঝতে পারছি না নিজেকে নিয়ে কী করব। বাবা হবার ইচ্ছা নেই, কেশব বা পূর্ণেন্দু হতে চাই না, আর ওই যে সব কী বলে, বড় বড় মানুষদের—ওই আর কি, জ্ঞানী, গুণী, মনীষী, তা হবার কথা বিশ্বাস করতে পারতাম না, ওটা অনেকটা যেন 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি'-এর মতন, পড়াই সার, কাজে না,—"হ্যা রে সুখেন, তুই বড় হয়ে কী হবি? 'স্যার, বিদ্যাসাগরের

মতন হব। ‘ভাল, খুব ভাল। ছেলেবেলায় ইস্কুলে এরকম সব কথার খেলা হত—এখন মনে হলে যেমন মনে হয়, স্‌সাহ্‌, যেমন স্যার তেমনি ছাত্তর। আর সে সময়টা, অনশনের পরের সেই দিনগুলোতে, তখন আমি সুখেন গুণ্ডা হইনি, তখন যা ছিলাম, সেটাও আমার ইচ্ছা ছিল না, তার চেয়ে মজার কথা, এখন যা হয়েছি, তাও আমি ইচ্ছে করে হইনি, কী রকম বলতে বলতে হতে হতে হয়ে গেলাম। কলেজে দলাদলি করতে গিয়ে, সাতটা মাথা ফাটাবার পরেই সবাই বলতে আরম্ভ করেছিল, গুণ্ডা গুণ্ডা, যে কারণে শহরের মাস্তানরাও আমাকে খাতির-টাতির দেখাচ্ছিল, তারপরে একদিন দেখলাম, আমি গুণ্ডাই হয়েছি। কিন্তু আমি ইচ্ছা করে হতে চাইনি, আমি যে কী হতে চেয়েছিলাম, তা জানতাম না, আর অনশনের পরে, সেই দিনগুলোতে, ক’দিন আর, মাস দুয়েকের মত হবে, আমার সেই সব কথা মনে হয়েছিল, “কী হবে আমার, আমাকে নিয়ে কী করব’, আর এরকম মনে হতেই, হঠাৎই মনে হয়েছিল, ‘আমি কেন এই পৃথিবীতে! আমি ইচ্ছা করে আসিনি।

কথাগুলো ভাবতে যে কেবল রাগই হচ্ছিল, তা না, রাগের থেকে বেশী, আমি যেন কেমন চোখে-কানে পথ না দেখতে পাওয়া দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম, একটা বিচ্ছিরি কষ্ট হয়েছিল, এমন কি এ কথাও মনে হচ্ছিল, কোন আত্মা-টাত্মা আমার পিছনে লেগেছে বোধহয়, না হলে, এমন অসম্ভব আজগুবি কথা আমার মাথায় আসছে কেন, আমি ইচ্ছা করে পৃথিবীতে আসিনি, অথচ স্‌সাহ্‌, বেঁচে থাকাটা আমারই দায়। আরে, একি ইতরামি! কার ইতরামি এসব! ন্যাকামি মনে হচ্ছে না একরকমের? তখন আমার মনে হয়েছিল, গলায় দড়ি দিই, কিন্তু সেটা দিতে পারছিলাম না বলেই তো গোলমাল লাগছিল, কারণ আমি ইচ্ছা করে মরতেও পারছিলাম না।

যখন আমার এরকম সব কথাবাত মনে হচ্ছিল, মনে আছে, সেই সময়ে মেজদার একটা বড় চাকরির চেষ্টা চলছিল। বাবাই করছিল সব, বড় চাকরি মানে, মস্ত বড়, এখনই ও দেড় হাজার টাকা মাইনে পায়, এখান থেকে মাইল ছয়েক দূরে একটা ফ্যাক্টরিতে—ডিপার্টমেন্টাল হেড এখন, মেলাই ক্যাশের ছড়াছড়ি। তখন ও চাকরিট পেয়েও গিয়েছিল। পাবেই জানা কথা, অমন যার এলেমদার ফাদার, আহ্‌ কী শাহেনশা বাপ ছেলে, ঠিক রাত্রের অন্ধকারে বাদুড়ের মত পাকা ফলটি গিয়ে খুঁজে বের করেছিল, কেন না, আমি তো জানি, দিল্লি থেকে ভায়া কলকাতা এ্যাপয়েন্টমেন্ট আনতে হয়েছিল অনেক ভাল ভাল ছেলেকে লেঙ্গি মেরে। মেজদা—পূর্ণেন্দু, তখন ভীষণ ব্যস্ত, এ বেলা কলকাতা যায়, ওর ◌েলাই সেই ছ’ মাইল দূরের ফ্যাক্টরি কোয়াটারে যায়, ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি, আর বাবার সঙ্গে কেবলই কনফারেন্স, বাপ-ব্যাটায় কী চুপি চুপি কথা—অথচ ওই মেজদাকেই দেখেছি, তার মাস কয়েক আগেই, ওদের দলের হয়ে বাবার অফিসে হামলা করেছিল, বাবার বিরুদ্ধে অফিসের গরীব স্টাফের হয়ে লড়াই করেছিল—সেই মেজদাকেই দেখেছিলাম, কী ভাব দুজনে, গুজুর গুজুর, ফুসুর ফুসুর, চাকরি তো না, যেন একটা কনসপিরেসি চলেছে। তা করুক গে, কিন্তু ও সে সময়েও, যখন আমি বাড়িতেই বেশীর ভাগ সময় থাকতাম আর ওইসব বিচ্ছিরি চিন্তাগুলো কুরে কুরে খাচ্ছিল, তখনো আমাকে টোপ ফেলতো, ওদের দলে যাবার জন্যে। বড়দাও একই চার ফেলে যাচ্ছিল, ও তো তখন উড়ছিল বলতে গেলে, মস্ত বড় নেতা দারুণ খাতির, শহরের ইয়ং লীডার। আমার মনের কথা তো ওরা বুঝতেই পারছিল না সেখানে কী হচ্ছে, আমি বলতেও পারছিলাম না, কারণ ওসব কথা আবার বলা যায় নাকি, আর বললেই বা সবাই ভাববে কী, আরো পেছনে লাগতো। তা-ই কেশব আর পূর্ণেন্দু, দুজনে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া চালিয়েই যাচ্ছিল আর আমাকে, সময় পেলেই, দুজনে আলাদা আলাদা দলে টানবার চেষ্টা করছিল। কেবল শুলদাকেই দেখেছিলাম, কেমন করে যেন চেয়ে থাকতো। এমনিতে তো শুলাদাকে খুব বোকা বোকা লাগে দেখতে, কিন্তু চোখ দুটো কেমন যেন, মনে হত সব সময়েই একটা কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে। তখনো কয়েক মাস বাকী ছিল ফাইনাল পরীক্ষার, যে-পরীক্ষায় দু’বার গাববা মেরেছিলাম, তখন সেটা থার্ড টাইমের হাঁকোর। বই-টই নিয়ে বসতাম, মাস্টারমশাইরা পড়াতে আসতো, ‘ড্যু ইউ ফলো মী?’ ‘হ্যাঁ স্যার।’ ‘ভেরি গুড! সেই একই

খেলা চলছিল, তবে আমি যেন তখন খানিকটা অভ্যাসমত জবাব দিতাম, 'হ্যাঁ স্যার।' জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ ছাড়া, কোনদিন না বলতে তো শিখিনি, তবে মাস্টারমশাইরাও বুঝেছিল, ছোঁড়ার একটা কিছু গোলমাল হয়েছে, যে জন্যে প্রায়ই জিজ্ঞেসা করতো, 'তোমার শরীর-টরীর খারাপ নাকি।' তখন আবার একটা খাতিরের ব্যাপারও ছিল তো, সদ্য হাঙার স্ট্রাইক করে জিতেছি। তার চেয়েও বড় কথা, ফাদারকে যেন কেমন একটু অন্যরকম লাগতো, মাঝে মাঝে আমাকে এসে জিজ্ঞেস করতো, শরীর খারাপ নাকি। সারাদিন বাড়ি বসে কেন, একটু ঘুরে-টুরে এলে তো হয়। পড়াশুনো হচ্ছে তো! সেই বারো-তের বছরের ভয় পাওয়ার মতন না হলেও, প্রায় সেরকমভাবেই আমি জবাব দিতাম, 'কিছু হয়নি। সব ঠিক আছে। বাইরে যেতে ভাল লাগে না।' ফাদারের যেন কেমন একটা ভুরু খোঁচানো চাউনি হয়ে যেত, অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থাকতো, সব থেকে খারাপ লাগতো, যখন দেখতাম, 'কী, চুপচাপ বসে কী করছ' এই বলে আমার সামনে বসে থাকতো। পনর মিনিট, আধঘণ্টা কেটে যেত, তাতে দুজনেরই যে অস্বস্তি, দুজনেই যেন বুঝতে পারতাম, অথচ কেউ কাউকে কিছু বলতে পারতাম না, আমার উঠে যেতে ইচ্ছা করলেও, উঠে যেতে পারতাম না। ফাদার যে কেন বসে থাকতো ছাই, বুঝতে পারতাম না, কোন কোন দিন হঠাৎ হঠাৎ বলতো, তোমার দাদাদের যা হোক জীবনের একটা গতি হয়ে যাচ্ছে। রাজনীতি-টাজনীতি বুঝি না, আমি বুঝি প্রতিষ্ঠা, লাইফে এস্টাব্লিসড হতে হবে। পিকু অবিশ্যি চাকরি করলো না, রাজনীতি করতে গিয়ে যদি কোনদিন মার খেয়ে না মরে, তবে যাই হোক, সে মন্দ কিছু করছে না। শুনেছি, কাছেই কোথায় নাকি একটা মস্ত দীঘিসহ বিঘে দশেক জমি ইতিমধ্যেই কিনেছে, খুব ভাল কথা। আরো শুনেছি, গোটা কয়েক সাইকেল-রিকশাও নাকি ইতিমধ্যে কিনে ফেলেছে, তা দল-টল করে যদি এসব করা যায়—কী কবে করছে তা জানি না, শুনি নাকি ওর খুব ক্ষমতা, তা ভাল। তারপরে নিকুও মন্দ না, থার্ড ডিভিশনে পাশই করুক, রাজনীতিই করুক, অনেক স্কলার ওরকম ভাল চাকরি আজ পাবে না। আর আমার মনে হয়, তোমার মেজদা এত বোকা না, এই চাকরি থেকে দল তার কাছে বড় হয়ে উঠবে। কথায় বলে, "চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।" আপনি না খেতে পেলে, শংকরাকে ডেকে লাভ নেই; আগে নিজেরটা নিজের সুখসুবিধে ইত্যাদি, তারপরে আর সব, তা সে রাজনীতিই হোক আর যা-ই হোক, সবাই তা-ই করে, কিছু টাকা-পয়সা চাঁদা বা একটু মিটিঙ-টিটিঙ করা, তা করুকগে না, মুখে যাই বলা যাক কাজে তো আর করতে যাচ্ছে না। আগে চাই নিজের প্রতিষ্ঠা। নেহাত তারাই বেশী চেঁচামেচি করবে, যাদের কোন গতি হচ্ছে না, যাদের এ্যামবিশন ফুলফিল হচ্ছে না, এতদিনের চাকরি-জীবনে সেটা আমি বুঝেছি, বহুলোক নিয়ে আমি এতকাল কাজ করেছি, অনেক দেখেছি, নিকুও সেসব ভালই বোঝে। যাই হোক, তারও একটা গতি হয়ে গেল, এখন বাকী রইলে তুমি.। স্‌সাহ্‌, ভ্যারর, ভ্যারর, ভ্যারর, কী মাইরি, ঠিক মনে হত, কোথাকার স্যার এলেন, লেকচার দিয়ে যাচ্ছেন। ওসব কথা আমাকে কেন, কেশব বা পূর্ণেন্দু সম্পর্কে ফাদার যেসব কথা বলতো, সেসব যদি ওদের সামনে বলতো, তাহলে ওরা ফায়ার হয়ে যেত। দুজনেই চেঁচিয়ে উঠতো, বাবা, আপনি ভুল বলছেন, আপনি আমাদের ব্যাপারটা বুঝবেন না। তা-ই কখনো হয়, ওদের ব্যাপপার কখনো বোঝা যায়? বাবার চাকরিটা তো মস্ত বড় ছিল, মস্ত চাকরি মানেই, মস্ত কাজ, মস্ত মানুষ, বাকী যা সব ঘুষ, ত্যালানি, চুরি-চোট্টামি, সেসব ব্যাপপার কেউ কি বুঝতে পারতো? কেশব কোথায়—আমরা দেশকে গড়তে চাই, বুঝলি নিকু, কিন্তু তোদের মত দুশমনদের ঠাণ্ডা না করে তা হবে না '—এই বলতো আর নিকু অমনি তেড়ে উঠতো, 'আরে তোদের কাছে গড়া আর গ্যাঁড়া একই কথা, জানি। তোদের ওই কুরুবংশ শেষ করে, আমরা নতুন দেশ তৈরী করব, জনসাধারণকে ধোঁকা দিয়ে বেশী দিন চলে না।'

পিকু বলতো, 'তুই বলছিস একথা, আর তোর মত ধোঁকাবাজদের জনসাধারণ বিশ্বাস করবে? এ হাসতো, ও-ও হাসতো, হাসি তো না—দাঁত কিরিমিরি করার শব্দ ওসব। তারপরে, এ ওকে ধোঁকাবাজ, এ একে ধোঁকাবাজ বলে গালাগাল, তর্কবিতর্ক, সব শেষে, যে

যার তালে বেরিয়ে যেত। এখন ঘরে গিয়ে দেখ, দুজনেরই সাজানো-গোছানো কী আরামের ঘর। আলমারিতে খুঁজলে, দুজনের ঘরেই ভাল ভাল জিনিস পাবে, মানে বাবা যাকে এস্টাব্লিসড বলে—তা-ই, কিন্তু ওসব কথা ওদের কাছে হিঁদুর গো-মাংস, ওরা লড়ে চলেছে।

সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে এমন জঘন্য চালাকি মনে হত, ওরা তিন বাপ-ব্যাটাই সমান, আমাকেও ওরা ধোঁকা দিতে চায়। ফাদারের ওসব বক্‌বক্‌ করার কোন দরকার ছিল না আমার কাছে, তার ভালই জানা ছিল, 'এস্টাব্লিসড ওই গালভারি কথাটার অর্থ কী, আর ওদেরও দরকার ছিল না, আমাকে নিয়ে দলে টানাটানি করবার। একজন গ্যাঁড়াবাজ আর একজন ধোঁকাবাজ, এটা তো শুলাদা পর্যন্ত বুঝতো। দুজনেরই গোছ-গোছানি সুখের জীবন, আবার দুজনেই শহরের দুই দলের নেতা হয়ে উঠেছিল—কী করে তা কোনদিন বুঝিনি, বুঝবও না—যেন ওদের জীবনের দুটো দিক—ব্যবসা চাকরি চুরি ঘুষ একদিকে, আর একদিকে দল, আর দলের সময় মনে হত, সেটাই যেন ওদের জীবনমরণ, এ ওকে খায়, ও একে খায়—তা খাকগে না, আমাকে কেন। আমার যা খুশি তা-ই হব, তাতে ওদের কী, খচ্চর।

যাই হোক, সে-সময়টা অনশনের পরের দিনগুলোতে যখন সেই সব উদ্ভট ভাবনা-চিন্তা আমাকে কী রকম কবে ফেলেছিল, যে-যাই বলতো, কারুর সঙ্গে ভাল করে কথা বলতে পারতাম না, এমন কি, বড়দা মেজদা ঠাট্টা করে এমন কথাও বলতো, কীরে টুকু, দেখিস সাধু-টাধু হয়ে যাবি নাকি? তখনো চুপ করে থাকতাম, যেন আমি একটা হারিয়ে যাওয়া ছাগল বাচ্চা, আর ভাবতাম, 'কী হচ্ছে এটা, ওরা সব কেমন মজায় আছে, আর আমার মাথায় যত সব বাজে পোকা ঢুকে বসে আছে। সত্যি কথা বলতে কি, মনে হয়েছিল, আমাকে যেন কারা সব, মরবার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছিল, অথচ মরতে পারছিলাম না, অথচ বেঁচে থাকা কী জন্য তাও বুঝতে পারছিলাম না। কারণ কোন কিছুতেই কোন ইচ্ছা হত না আমার—লোকে শুনলে বলতো, সব কিছু জেনে তক্ষকটি হয়ে বসে আছি—কিন্তু তাও তো সত্যি না। এরকম একটা অবস্থা। এইটাই কেবল আশ্চর্য, সেই সময়ে সেই যে একটা ভয়ের গুরগুরানি, সেটা আমাকে একদিনও পেয়ে বসেনি, একদিনও টের পাইনি।

এখন আমার সেইরকম মনে হচ্ছে। সেই সময়ের অবস্থাটা যেন চেপে ধরছে। এখন, শিখা চলে গেছে ঘর থেকে, আমি মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়েছি, চারদিক যেন বড় নিঝুম। চুপচাপ, দু-একটা পাখীর হঠাৎ হঠাৎ ডাক, এ সময়ে সেই ভাবটাই চেপে ধরছে। আমাকে নিয়ে কী করব। কিছুই বুঝতে পারছি না। একটা কথা এখন অবিশ্যি বুঝতে পারছি, যা করব না মনে করি, তা-ই করি। যা চাই না, তাই চাই, এ সময়ে স্‌সাহ্‌, 'তুই একটা ভূত এ কথা আমার বলতে ইচ্ছা করে,কিন্তু আমি তো সত্যি শিখাকে ওরকম করতে চাইনি, তবু করলাম, হয়তো ওকে একেবারে খুন করতেই ইচ্ছা করছিল, আর ব্যাপারটা তো আজই প্রথম না, এরকম আরো অনেকবারই হয়েছে, অথচ কোনবারেই ভেবেচিন্তে কিছু করিনি। যেন এই জন্যেই, এই না জানা, না বোঝা থেকে এই অবস্থাটা আমার দেখা দেয়, এখন আমি কী করব —মানে, নিজেকে নিয়ে আমি কী করব!

অথচ আবার, সেই অনশনের পরে যখন মনের সেই অবস্থা যাচ্ছিল, তা প্রায় মাস দেড়েক কেটে গিয়েছিল তখন, হঠাৎ একদিন শিখা আমাদের বাড়িতে এসেছিল—ঠিক যেন অনেকদিন, মেঘলা মেঘলা অন্ধকার, সাঁতা, ভিজে, তারপরে হঠাৎ রোদ ওঠে, তেমনি করেই এসেছিল। সেই প্রথম ও আমাদের বাড়িতে এসেছিল, আর সুখেনদা, আপনার জন্যই এলাম। কেশবদা, পূর্ণেন্দুদা, ওঁদের মুখে প্রায়ই শুনি, আপনি নাকি বাড়ি থেকে বিশেষ বেরোন-টেরোন না, খালি চুপচাপ থাকেন আর পরীক্ষার পড়া পড়ে যাচ্ছেন; তা-ই এলাম।'

বড়দা, মেজদা ওদের বাড়িতে যায় সে-ই যে প্রথম জেনেছিলাম, তা না, আগেই শুনেছিলাম ওর দাদাদের কাছে, দাদারা যায়। প্রথমটা তো আমি কী রকম লাজুক—আহা হা, দেখিস, কিন্তু সত্যি লাজুক লাজুক হয়ে উঠেছিলাম শিখার সামনে, কী কথা বলব, বুঝতে পারছিলাম না, তবে হলফ করে বলতে পারি, নিজের মুখ দেখতে পাইনি বটে, একেবারে

যেন ঝলমলিয়ে উঠেছিলাম, সন্দেহ নেই। ভিতরটা যে ঝলমলিয়ে উঠেছিল, সেটা তো বুঝতে পেরেছিলাম, তাতেই মনে হয়েছিল সে কথা, কারণ বললামই তো, অনেক দিনের মেঘলার পরে হঠাৎ রোদ উঠলে যেরকম মনে হয়, ঠিক সেরকম মনে হয়েছিল ওকে দেখে। ও এসে ঘরে বসেছিল, কী যে সব কথা বলেছিল, এখন একটুও মনে করতে পারি না। হয়তো 'খুব পড়ছেন বা শরীর ভাল আছে তো, তার জবাবে আমি হয়তো কিছু বলেছিলাম, কিন্তু আমার মনের মধ্যে অনশনের সেই সন্ধ্যারাত্রের কথা ভেসে উঠেছিল, আহ্, সত্যি, কেন যে ওকে এত ভাল লেগেছিল, সেই দিনও লাগছিল, সেই প্রথম দিন যখন এসেছিল, আর আমি যেন সেই দিশেহারা কষ্টের থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছিলাম। জানি না, কেন আমার মনে হযেছিল, শিখা যেন অনশনের সেই সন্ধ্যারাত্রে, আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছিল, মনে হয়েছিল অনশনের পর থেকে ও যেন রোজই আশা করতো, আমি ওদের বাড়ি যাব, কেননা ও বলেছিল, 'আমি রোজই ভাবি, সবাই একবার করে আমাদের বাড়িতে ঘুরে গেল, সুখেনদা তো এল না। কী জানি বাবা, কোন দোষ-টোষ করে ফেললাম না তো। তার মানে, যারা অনশন করেছিল, তারা সবাই ওদের বাড়িতে একবার করে—দশ বারও হতে পারে, ঘুরে এসেছিল। আমি ওকে কী সব যেন বলেছিলাম, না—মানে ভাল লাগে না এইরকম সব কথাই হবে হয়তো। ওর মধ্যে একটা যেন কী ছিল যতবার আমার চোখের দিকে তাকাচ্ছিল, ততবারই আমার ভিতরটা কী রকম করে উঠছিল। সেইসব কথা আমার মনে হয়েছিল, ওর বুকের মধ্যে আমার মুখটা ডুবিয়ে দিই। মনে হতেই আমি ওর দিকে তাকিয়েছিলাম, ওর বুকের দিকে। একটা বাসন্তী রঙের জামা, মোস্ট অর্ডিনারি, তাতে আবার জামার হাতায় ফুল আঁকা, আর একটা লাল লাল ভাবের—ঠিক লাল, না, টকটকে লাল না, লাল ভাবের শাড়ি পরে এসেছিল। আমি ওর ডানা দুটোর দিকে, নতুন চিকচিকে লতার মতন রঙের ডানা, গলা কাঁধের দিকে তাকিয়েছিলাম, আর বুকের দিকে তাকিয়ে, মনটা কী রকম করে উঠেছিল—যা তার আগে কোনদিন মনে হয়নি। তার আগে তো অনেক মেয়ের সঙ্গেই মিশেছি, হাত মুখ দিয়েছি, কিন্তু ওর সামনে সেগুলো মনে করতে গিয়ে কেমন যেন একটা বিঘনি বিঘনি ভাবই লেগেছিল, এমন কি বিচ্ছিরি গন্ধের কথা পর্যন্ত মনে পড়ে গিয়েছিল, সেগুলো যেন সত্যি মাংসপিণ্ডই।

আমি জানি না, শিখাকে জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও কোনদিন বলেনি, আমার মনের কথা ও কখনো বুঝেছিল কিনা—তাই আবার কখনো বলে নাকি, গর্দভ—মেয়েরা কি ওসব কখনো কিছু বোঝে নাকি—মাইয়াছেলে না! তবু, কেন জানি না আমার মনে হয়েছিল, শিখা যেন আমার মনের কথা বুঝে ফেলেছিল, এমন কি এত যে চোখ দুটোকে সামলাতে গিয়েও তাকিয়ে ফেলছিলাম, সেটাও হয়তো ধরা পড়ে গিয়েছিল। ও এসেছিল বিকালের দিকে, ফেরবার সময় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, নিজেই বলেছিল, 'যাবেন নাকি আমাদের বাড়ি অবধি।'

গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখেছিলাম, ওদের বাড়িতে ভিড়, অনেকেই সেখানে ছিল, কলেজের কয়েকজন ছেলে, বিশেষ করে মেজদাদের দল। মেজদা, আর শিখার দাদা মেজদার চেলা। আমি বসিনি, সবাই আমাকে বসতে বলেছিল, এমন কি মেজদাও—আর থাকলে হয়তো শিখাকে আরো খানিকক্ষণ দেখতে পেতাম, কিন্তু আমার মনের অবস্থা সেরকম ছিল না যে, সকলের মাঝখানে বসে বসে গাঁজাবো, আর শিখাকে দেখব। চলে আসবার সময় শিখা আমার সঙ্গে ঘরের বাইরে এসেছিল, আর একটু থাকবার জন্যে বলেছিল, আমি বলেছিলাম, 'সময় পেলে তুমি আবার এসো।'

ওদের বাড়ি থেকে রাস্তা দিয়ে ফেরবার সময় আমি কোনদিকেই তাকাইনি। কারুর সঙ্গে কথাও বলিনি। মফস্বল শহরের রাস্তার আলো কেমন, সকলেই জানে। গাধাও না, ঘোড়াও না, যেগুলোকে খচ্চর শহর বললেই ভাল হয়, আলোগুলোও তেমনি, যে জন্যে মনে হয়েছিল, আমি যেন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ফিরে এসেছিলাম। আমার আশেপাশে সবই ছায়া, কেউই মানুষ না, আর, আবার সেইরকম ভাবনা ফিরে এসেছিল মনের মধ্যে, সেই দিশেহারা কষ্টের ভাবটা। অথচ আশ্চর্য এই, আমি যে খুব সাংঘাতিকভাবে শিখার জন্যে অপেক্ষা করেছিলাম, তাও বলতে পারি না। কারণ বোধহয় মনের সেই অবস্থায়, শিখার একটা ঝলকানি লেগেছিল বটে, আবার আমি সেই ভাবনার মধ্যেই তলিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু শিখা আবার এসেছিল, তিন দিন পরে, কলেজ থেকে ফেরার পথে। শুলাদাটা আবার কী এক আশ্চর্য জীব। সে হঠাৎ শিখাকে ভীষণ খাতির করতে আরম্ভ করেছিলো। বলতে গেলে আরো যেসব মেয়েরা আসতো, তাদের কোনদিন ঠিক ওভাবে খাতির দেখায়নি। তিন দিন পরে যেদিন এসেছিল, সেদিন আমি আর ওদের বাড়ি যাইনি। সেদিন শিখা বেশীক্ষণ ছিল না। ঠিক তার দু দিন পরেই শিখা আবার এসেছিল, একেবারে ভর দুপুরে, ঘরে আমি একলা বসেছিলাম, পিছন ফিরে—সামনে বই খোলা, কিন্তু পড়ছিলাম না। হঠাৎ চেয়ারের পিছনে একটা চাপ লাগতে, পিছন ফিরে দেখেছিলাম, শিখা আমার মাথার ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে টেবিলের ওপর দেখবার চেষ্টা করছে, আমি কী পড়ছি।

আমি এমন চমকে উঠেছিলাম যে, আমার বুকের ভিতরটা ধ্বক করে উঠেছিল, ঠিক মনে হয়েছিল একটা প্রেতাত্মা-টাত্মা কিছু এসেছে বুঝি, আর শিখা বলেছিল, 'খুব চমকে গেছেন, না?'

কিছু না বলে তখনো তাকিয়েছিলাম, তারপর হেসে বলেছিলাম, 'হ্যাঁ।'

'শুলাদা বললে কিনা, আপনি একলা ঘরে রয়েছেন। তাই পা টিপে টিপে এসে দেখছিলাম, কী করছেন। খুব পড়ছেন, না?'

কথার জবাব দেব কি, তখন আমার গায়ের মধ্যে কী রকম করছিল, ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারি না। কেবল, এটা বুঝতে পারছিলাম, শিখার গায়ের কাপড়টা আমার মাথায় ঠেকছিল আর আমার ভিতরটা কী রকম করছিল, অনেকটা ভয়ের মত, তা-ই আমি মুখটা ফিরিয়ে নিয়েছিলাম, ওর দিকে তাকিয়ে থাকিনি। পাশে আর একটা চেয়ার ছিল, শিখা ঘুরে সেদিকে গিয়েছিল, কিন্তু বসেনি। আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, আরো অনেকটা কাছে। জিজ্ঞেস করেছিল, 'রাগ করলেন সুখেনদা?'

রাগ? আমি ওর দিকে ফিরে, তাড়াতাড়ি বলেছিলাম, না তো।'

'তবে?'

তবে? তবে মানে কী? আমি ওর মুখের দিকে চোখ তুলতে গিয়ে, ওর বুকটা দেখেছিলাম, চেয়ারের হাতলের কাছে ওর তলপেটটা ছিল, সেখানে শাড়ির কুঁচির কয়েকটা ভাঁজ। তার একটু ওপরেই ওর সেই কচি কচি রঙের পেটের একটুখানি–ঠিক এখনকার মত, কোমর থেকে পেটের এতটা দেখা যাবার মতন জামা আগে পরতো না, তারপরে বুক, তারপরে কণ্ঠা আর গলার মাঝখানে ছোট্ট একটা গর্ত, গলা, চিবুক, মুখ, ওর চোখদুটো আমার মুখের ওপরে চেয়েছিল একটু অবাক অবাক ভাবে। কিছু খুঁজে দেখার মত, জিজ্ঞেস করার মতন! কিসের একটা হালকা গন্ধও লাগছিল, ওর গায়ের বা চুলের বা জামাকাপড়ের, যারই হোক, আমি যেন ডুবে যেতে চাইছিলাম শিখার বুকের মধ্যে, সেই অনশনের সন্ধ্যারাত্রের মত। শিখা আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী হয়েছে সুখেনদা?'

আমি ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিলাম, কিছু না। আর আমি যেন একটা লগবগানো মগডালের মতন, ওর বুকের কাছে ঝুঁকে পড়েছিলাম, ওর কোমরের পিছনে হাত রেখেছিলাম। আর মাইরি, আশ্চর্য, আমার যেন কী রকম নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। অথচ ভাল লাগছিল—আবার একটা কী রকম কষ্ট, স্‌সাহ্‌, চিরদিন এরকম একটা ভুতুড়ে ব্যাপার আমার মধ্যে ঘটেই চলেছে। আর কারুর কাছে তো এরকম আজগুবি কিছু শুনিনি। আর মাথায় তো চুল

ছিল, তবু কী করে এরকম হয় কে জানে, আমি ওর বুকের তলার নরম দিকটা টের পাচ্ছিলাম। কিন্তু মুখটা বুকের দিকে ছিল না, পাশ ফেরানো ছিল, থাকলেও সেদিকে যে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম, তাও না, একবার এ কথাও মনে হয়নি, যেটা মনে হওয়াই সব থেকে আগে উচিত ছিল, শিখা রাগ করবে কিনা। শিখা যে কী করছিল, কেমন ওর মুখটা দেখতে হয়েছিল, কিছুই জানি না। আর তা একবারও আমার মনে আসেনি। আমি যেন ওর সেই মুখটাই দেখতে পাচ্ছিলাম, যে-মুখটা অনশনের সেই রাত্রে চোখ বুজেও বার বার ভেসে উঠেছিল। তারপরে, কতক্ষণ পরে আমি জানি না, ওর একটা হাত আমার কাঁধের উপর রেখেছিল। তখন আমি সেই অবস্থাতেই মুখ তুলে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম, আর আমার ঠিক মনে হয়েছিল, সেই যে, সেই যে, সেই যে, সেই তাঁবাটে চাঁদের আলোয় ওর মুখটা যেমন দেখেছিলাম। কেমন যেন একটা, চোখ সেই কান পর্যন্ত টানা। অথচ চোখের ভিতরে সাদাটা নেই, সবটাই কালো চিকচিকে, মুখের রঙটা যেন কেমন, আর চারদিকে অন্ধকার। আর ও আমাকে ছুয়ে আছে; সেইসব ভাবনা আর শরীরের ভাবগুলো জেগে ওঠায় আমি সত্যি সত্যি ওর বুকের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। আমি পাশ ফিরে দু'হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরেছিলাম, কোমরের ওপরে পিঠের কাছে—আর ওকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কষ্ট করে নিচু হতে হয়েছিল, যাতে আমি যেমন করে চাই ও তাই দিতে পারে। আমার কাঁধে রাখা ওর হাতটা আমার ঘাড়ে রেখেছিল। রোঁয়াগুলোসুদ্ধ শিউরে উঠেছিল। মনে করতে পারি না, তখন ওকে একবার নাম ধরে ডেকেছিলাম কিনা। আর একটা হাত ও চেয়ারের হাতলে রেখেছিল। সেখান থেকে তুলে, আমার পাঁজরের কাছে রেখেছিল—যেন সেই দিনই নতুন না, যেন কতই সহজ-স্বাভাবিক, কোনরকম লাফানি-ঝাঁপানি নেই। বরং সেইকী বলে একটা মায়া-মায়া, মমতা-মমতা ভাব, অথচ তার আগে যতগুলো ছুঁড়িকে গায়ে হাত দিতে গেছি সে সবের ভাবভঙ্গিই আলাদা। যেমন চাউনি, স্‌সাহ্‌ তেমনি হাসি, তেমনি ছটফটানি—হাত দিতেও দেবে, আবার ছাড়িয়েও দেবে। 'ও কি, না, ছি সুখেনদা' এমনি বলবে হাসবে, সেই অনেকটা ছেউটি ছুঁড়িদের কথা বলছিলাম না!

অনেকটা সেইরকমেরই, তার চেয়েও যেন একটা বদ গন্ধ বেরুনো ব্যাপারের মতন, 'হি হি হি, ভাগ আবার একটু; আবার, বেশ মজা, না? পালাব কিন্তু, হি, হি হি, আর না হয়তো, পাশাপাশি কাছাকাছি লাগালাগি ছোঁয়াছুয়ি সবই হচ্ছে, তবু যেন কে কার ঝাড়ে বাঁশ কাটছে, চালিয়ে যাও গায়ে গায়ে। সে সবের মধ্যে যেমন, কেমন একটা নোংরা ইতরামির গন্ধ থাকে, সেরকম কিছুই মনে হয়নি। কী বলব, ঠিক বলতে গেলে, শিখা যেন একটা রোগা ছেলেকেই, সেই অনশনে না-খাওয়া আমাকেই বুকের কাছে থাকতে দিয়েছিল, গায়ে হাত রেখেছিল। কারুর সঙ্গে ওকে মেলাতে পারিনি, কারুর সঙ্গে ওর মিল ছিল না, এমন কি, ওঁর যে ওভাবে ঝুঁকে পড়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল, তার জন্যে একটা কথাও বলেনি, তখন আমি, হাতটাও ওর বুকের কাছে নিয়ে এসেছিলাম, যেন আমার সবটাকে নিয়ে, আমার পুরো শরীরটাকে নিয়ে ওর বুকের মধ্যে মিশিয়ে যেতে চাইছিলাম, ডুবে যেতে চাইছিলাম। আমি মুখ তুলে ওর দিকে চেয়েছিলাম, আর ঠিক যা ভেবেছিলাম, তাই, যেরকম মুখ ভেবেছিলাম, ঠিক সেরকম মুখই দেখেছিলাম। ঠিক সেইরকম চোখ, যে-চোখ দিয়ে ও আমার দিকেই তাকিয়েছিল, অথচ একটা কথাও জিজ্ঞেস করেনি, আজও জানি না, কেন জিজ্ঞেস করেনি, কেন কোনরকম আপত্তি করেনি, যেন ও জানতো, এরকম হবে বা সেটা এমন একটা কিছু ব্যাপার না, যে কী জানি, হয়তো ওর ওইরকম ইচ্ছা করেছিল। আমি ওকে টেনেছিলাম, আমার দিকে নিচু করে টানতে গিয়ে, ও প্রায় পড়েই গিয়েছিল, হয়তো লেগেও ছিল, কিন্তু তার জন্যে ওর মুখে কোন কষ্টের ছাপ পড়েনি, যেমন করে আমার দিকে তাকিয়েছিল, তেমনি তাকিয়েই ছিল, যেন আমি যা করব, তাতে ও কোনরকম আটকাবে না, মেরে ফেললেও না। আমার শরীরের ওপর ওর অনেকখানি ভার পড়েছিল, ওর নিঃশ্বাস পড়ছিল আমার মুখে। জানি না কেন, নিশ্বাসটা যেন মিষ্টি ফলের গন্ধের মতন মনে হয়েছিল, ওর নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছিল, আর আমার কাঁধ আর গলার কাছে, ওর বুক

চেপেছিল, আমি ওকে চুমো খেয়েছিলাম। তখন চুমো খাওয়াটা আমার কাছে একটা সহজ ব্যাপার, কেননা, তার আগে অনেকবারই খেয়েছি, তবু মনে হয়েছিল, সেরকম চুমো জীবনে কখনো খাইনি এত সুন্দর একরকম থাকে না, একেবারে নিখুঁত করে আঁকার মত ঠোঁট—না না, রঙ মাখা না, শিখা রঙ মেখে আসেনি, অথচ লাল লাল আর নিখুঁত—মানে যেন অনেকটা ধারালো মতন, আর পাতলা মতন, আর পাতলা সরু মোটেও না, একটু ফোলা ফোলা, অদ্ভুত-সুন্দর। আমি ওর সেই ঠোঁটে আমার ঠোঁট চেপে দিয়েছিলাম, তারপরে মোটেই জোরে-টোরে না, চুমো খেয়েছিলাম—কিন্তু ও হাত দিয়ে মেছেনি, তখন কেবল একবার উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিল, আর ঘরের খোলা দরজাটার দিকে তাকিয়েছিল। আমিও খোলা দরজার দিকে তাকিয়েছিলাম, জানি না, তার আগেই শুলাদা দেখে গেছে কি না, আমি উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করেছিলাম, ও ঠিক সেখানেই, সেভাবেই দাঁড়িয়েছিল, ভেবেছিলাম, তখন কিছু বলবে, কিন্তু কিছুই বলেনি, কেবল আমার দিকে তাকিয়েছিল। আমি আবার ওকে দু হাত দিয়ে বুকের কাছে চেপে ধরেছিলাম, তখন লক্ষ্য করেছিলাম, ও আমার থেকে প্রায় ছ ইঞ্চি বেটে, কম না, প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু। শুধু ধরেই রেখেছিলাম, বুকের কাছে, খুব জোরে চেপে ধরে রেখেছিলাম অনেকক্ষণ। কতক্ষণ, এখন মনে নেই, তারপর এক সময়ে আমি ডেকেছিলাম ওর নাম ধরে, আর ও বলেছিল, 'দিলাম তো আপনার পড়া মাটি করে।'

তারপরে যে কেউ ওরকম কথা বলতে পারে, কোনদিন ভাবিনি, যেন ব্যাপারটা তেমন কিছুই না, অথচ ও মোটে ছটফটও করেনি, ভাবটা অনেকটা, বেশ তো, এসব না হয় হল, পড়াটা তো মাটি হল এইরকম। আমি আবার বলেছিলাম, 'আমি পড়ছিলাম না।' ও বলেছিল, 'আপনার পরীক্ষার তো আর বেশী দেরী নেই।' 'পড়তে ভাল লাগে না।' ও হেসেছিল। এখন আমার এভাবে বলতে ইচ্ছা করে, "দেন ইট স্টার্টেড।'

ওর সঙ্গে আমার, সেই শুরু, দেন ইট স্টার্টেড, যেমন আমাদের শহরের বাসের সহিসেরা ড্রাইভারকে চেঁচিয়ে বলে, 'ইস্টাট', সেইরকম, আর আমি যেন কেমন একটা শান্ত আর গম্ভীরভাবের হয়ে উঠেছিলাম, ভাল ছেলেরা ভালবাসায় পড়লে যেরকম তাদের অবস্থায় হয়, সেইরকম—মানে, আমার প্রেম হয়েছে, আমার জীবনের চেহারাটা অন্যরকম হয়ে যাবে এবার। সেইদিন ও অনেকক্ষণ ছিল, শুলাদা ওকে চা আর খাবার খাইয়েছিল, আমি ওর সঙ্গে ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম, দেখেছিলাম, কেশব বসে আছে, আরো দু তিনজনকে নিয়ে, শিখার এক দাদাও ছিল, যে দাদা ওর দলের, বেলাদিও ছিল। আমাকে দেখবার আগেই, কেশব, আমার বড়দা বলে উঠেছিল, "কোথায় গেছলে শিখা, আমরা তো তোমার খোঁজে থানায় লোক পাঠাব ভেবেছিলাম। শিখা বলেছিল, আপনাদের বাড়িতেই সুখেনদার সঙ্গে গল্প করছিলাম। ততক্ষণে আমি ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম, কিন্তু আমার একটুও ভাল লাগেনি। মনের ভিতরে যে একটা বেশ—কী বলব, তরতরানো আমেজ ছিল, অনেকটা জলভরা গেলাসের মতন, সেই ভাবটা কেমন একটা ছানা কেটে যাওয়া ভাব হয়েছিল। তবু আমি একটুখানি বসেছিলাম, কী দু-একটা কথাবার্তা বলেছিলাম, বড়দা ওদের দলের ছাত্রদের নিয়ে কী একটা কনফারেন্সের কথা বলাবলি করছিল, আমাকেও ওদের দলে চলে আসতে বলেছিল, আর একমাত্র শিখাই বলেছিল, 'উহ্, আপনাদের দল ছাড়া কথা নেই কেশবদা।' আমি উঠে এসেছিলাম, শিখা আমাকে সেইদিনই প্রথম তুমি বলে ডেকেছিল, আরো খানিকক্ষণ থাকতে বলেছিল, থাকিনি।

সেই থেকে শুরু হয়েছিল, কিন্তু সেই থেকেই গোলমাল, সেই ভুতুড়ে ব্যাপার, যতই শিখার সঙ্গে আমার দুধের জ্বলে জমছিল, ততই সেই ছানা কেটে যাওয়াও বাড়ছিল। যে ব্যাপারটা একটু আগেই হয়ে গেল, একটা রাগ, ঘেন্না, যেন আমাকে ছিঁড়ে খেতে আরম্ভ করেছিল, অথচ শিখাকে ছেড়েও যেতে পারছিলাম না। তারপরেই তো আস্তে আস্তে আমার খেল শুরু হয়েছিল, পড়াশুনো চুলোয়, পরীক্ষার হলে হাই বেঞ্চের ওপর একটা ছুরি গেঁথে রেখে, বই খুলে আমি লিখতে বসেছিলাম। তার আগের দিনের পরীক্ষাতে টুকতে গিয়ে

একটা ছেলের খাতা কেড়ে নিয়েছিল বলে, ছেলেটা কলেজ থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গিয়েছিল রেল লাইনে, একেবারে চলন্ত গাড়ির তলায় মাথা পেতে দিয়েছিল। এই স্‌লাদের যে কী বলতে ইচ্ছা করে-না, ওকে আবার ধরেছিল যশোদাবাবু—ধরবেই তো, ও তো অন্য দলের ছেলে ছিল, আমি ঢুকছি জেনেও, আমার কাছে এগোননি। কিন্তু ছেলেটা মরতে গিয়েছিল কী করতে, বুঝি না, যশোদাবাবুকে ধরে পেঁদিয়ে দিলেই তো হত, সে সাহস ছিল না, মাথাখানিকে ছেতরে দিয়ে, তিন-চার টুকরো লাস হয়ে উল্লুকটা চলে গিয়েছিল মুদাফরাসদের কাঁধে চেপে। আমি তো জানতাম, আমার দ্বারা পাশ করা হবে না, আর ঠিক করেছিলাম, ওটাই শেষ বছর, আর পরীক্ষা-টরীক্ষা দিতে পারব না, তাই ছোরা নিয়ে গিয়েছিলাম, দলের স্যার না থাকল, বে-দলের স্যারকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিতে হবে তো। আর স্‌সাহ্‌। সেদিন ইনভিজিলেন্টে এসেছিল সেই স্যারটি, যার চাকরি বহালের জন্যে হাঙার স্ট্রাইক করেছিলাম। সে স্যার তো আমার মেজদার দলের, আর সেই কয়েক মাসের মধ্যেই, আমাদের জোড় খাওয়া, সেই যাকে বলে ঐক্য, ভেঙে গিয়েছিল, আবার মারামারি কামড়াকামড়ি শুরু হয়ে গিয়েছিল, তাই অনসসনই কর, আর যা-ই কর, স্যারটি কোন কথাই শুনতে রাজী ছিল না। তা ছাড়া মাল সেদিকে বেশ দড়, চাকরিতে বহাল হয়েই, আগে টেক্কা মেরেছিল প্রিন্সিপালকে, তারপরে একেবারে গর্ভনিং বড়ির পেয়ারের লোক হয়ে উঠেছিল। আমাকে এসেই জিজ্ঞেস করেছিল, ছুরিটা এভাবে এখানে গাঁথা কেন ‘ বলেছিলাম, পেন্সিল-টেন্সিল কাটতে হবে কিনা, তাই ‘ স্‌সাহ্‌, একেবারে বাঘের মতন তাকিয়েছিল আমার দিকে—আমিও তার চেয়ে কিছু কম না, জানতাম ও আমাকে রেয়াত করবে না, তবু আমি বই খুলেই বসেছিলাম, ও আমাকে ওয়ার্নিং দিয়েছিল, কিন্তু কাছে ঘেঁষেনি, বলেছিল আমার খাতা বাতিল করে দেবে। তবু আমি শুনিনি, চালিয়েই যাচ্ছিলাম, শেষ পর্যন্ত ভাইসকে ডেকে আনা হয়েছিল, আমার খাতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, মেজদাদের দলের ছেলেরা খুশি হয়েছিল, আমি বাইরে এসে প্রথমে ঠিক করেছিলাম, ছুরিটা একেবারে শুকনো নিয়ে ফিরব না। কিন্তু বন্ধুরা সবাই বারণ করেছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম, সেই আমার শেষ পরীক্ষা, বাবার মুখটা মনে পড়ছিল, আর ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছিল, একটা কিছু না করতে পারলে শান্তি পাচ্ছিলাম না। আর ঠিক তখুনি সেই স্যারটি ক্লাস থেকে একবার বেরিয়ে আসছিল, আমি ডেকে বলেছিলাম, ‘এই, এই যে দ্যাখ, এই দ্যাখ’ বলে প্যান্টের বোতাম খুলে দেখিয়েছিলাম। মাইরি, লোকটা ভাবতেই পারেনি, ওরকম একটা কাণ্ড কেউ করতে পারে, প্রথমটা থতমত খেয়ে গিয়েছিল, আর পাগলের মত ক্ষেপে গিয়ে বলেছিল, ‘আই উইল সী ইউ রাসকেল।’ আমি বলেছিলাম, ‘আরে যা যা, পেঁদিয়ে খাল খিচে দেব।’ স্যারটি দৌড়ুতে দৌড়ুতে প্রিন্সিপালের ঘরের দিকে গিয়েছিল, আমিও বন্ধুবান্ধব নিয়ে হাওয়া।

রাস্তায় গিয়ে খুব হাসাহাসি করেছিলাম বটে, কিন্তু এটাও ঠিক, ভিতরে ভিতরে কেমন একটা অস্বস্তিও যেন হয়েছিল, যেমন হয়-না, একটা খচখচানি মতন, অথচ লোকটার মুখ মনে করে হাসিও ঠিকই পাচ্ছিল, তবু কেমন যেন একটা খচখচ করছিল। আমি সেখান থেকে সোজা শিখাদের বাড়ি চলে গিয়েছিলাম, সব কথা শুনে ও খুব ভয় পেয়েছিল, আমিও ওকে নিয়ে সেদিন তেমন মেতে উঠতে পারিনি। সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে ঢুকতেই ফাদার তো একেবারে গর্জন করে উঠেছিল, হাতের কাছে কী একটা ছিল—প্লাস্টিকের কলমদানি না কী যেন, সেটাই ছুড়ে মেরে বলেছিল, ‘বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে।’

একটু বোধহয় লেগেছিল, কপালে, মাথা নিচু করে ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলাম, ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। বাবা সেখানে এসেও বন্ধ দরজার ওপর জোরে ধাক্কা মেরেছিল, আর বারে বারে চেচাচ্ছিল, ‘বেরিয়ে যা বলছি, বেরিয়ে যা, কুলাঙ্গর ছোটলোক ইতর। আমি কিন্তু ঘরের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়েই ছিলাম, যেন কিছুই শুনতে পাচ্ছিলাম না, বুঝতে পারছিলাম না, অথচ হাতটাতগুলো কীরকম শক্ত হয়ে উঠেছিল, দাঁতে দাঁত চেপে বসেছিল—হ্যাঁ রাগই, কিন্তু কার ওপরে তা যেন বুঝতে পারছিলাম না। দাদারা বাড়ি ছিল না, বাবা তেমনি চেঁচিয়ে যাচ্ছিল, ‘আমি দরজা ভেঙে ফেলব বলছি, টেলিফোন করে পুলিশ ডাকব এখনি,

হারামজাদা, গুণ্ডা, লম্পট, তুই কি মানুষের বাচ্চা, তুই— এ সময়ে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল, বাবা মাকে নিয়ে শুয়ে আছে। বাবা চেঁচিয়েই যাচ্ছিল, 'তুই একটা কুকুর। এ বাড়ির ছেলেদের নামে যা কেউ কোনদিন বলতে পারেনি, তোর জন্যে তাও শুনতে হচ্ছে। বেরিয়ে যা, যা বলছি, বেরো?

আস্তে আস্তে মুঠো করা হাতটা আমি খুলেছিলাম, দরজার কাছে গিয়ে, খিল খুলে দিয়েছিলাম। খুলে দিতেই বাবা কিল চড় মারতে আরম্ভ করেছিল, আর আমি বারান্দা পেরিয়ে উঠোনের দিকে নেমে যাচ্ছিলাম, শুলাদা, ঠাকুর, ঝি—ঝিয়ের মেয়েটা তার কয়েকদিন আগেই ডাক্তারের কাছ থেকে পেট খসিয়ে এসেছিল, টাকা পয়সা মেজদাই দিয়েছিল, ঝিটার মেজাজ তাই ভাল ছিল, ভয় কেটে গিয়েছিল—আহা, মেজদার শাশুড়ি গো—ওরা সবাই দাঁড়িয়ে দেখছিল, কারুর সামনে আসবার সাহস ছিল না। আমি ছুটিনি, দৌড়ইনি, যেমন হেঁটে যেতে হয়, তেমনি বারান্দা দিয়ে উঠোনে নেমে গিয়েছিলাম, বাবা সমানে মারতে মারতে চলেছিল, অথচ আমার যেন লাগছিল না, যেন আমার ভিতরে এমন একটা গোলমাল চলছিল, মারধোরগুলো মোটেই কিছু মনে হচ্ছিল না। আমি যখন বাগানের কাছে, তখন বাবার একবার হোঁচট লেগেছিল, সেখানে যুঁইয়ের ঝাড় ছিল, আর দরজা অবধি আসতে আসতে, বাবা যেন হাঁপিয়ে পড়েছিল। দরজার বাইরে আর বাবা আসেনি, মনে হয়েছিল, বাবা তখন ওই সেই যাকে বলে বায়ু ত্যাগ করেছিল একবার, আর সেখান থেকেই বলেছিল, আর যেন এ বাড়িতে তোর মুখ দেখতে না হয়। বাবা বলছিল, আমি শুনছিলাম, কিন্তু কী যে ঠিক ঘটছিল কিছুই বুঝতে পারিনি, হেঁটেই চলেছিলাম, আর কিছু দূর যাবার পর দেখেছিলাম, আবার শিখাদের বাড়ির দিকেই যাচ্ছি। কিন্তু যেতে ইচ্ছা করেনি, কারণ আমি জানতাম, তখন ওদের বাড়িতে আড্ডা চলেছে, তাই আবার ফিরেছিলাম, যেখানে আমার দলের বন্ধুরা আড্ডা দেয়, চা খায়-—দল মানে, রাজনীতির না, এমনি, যারা আমার ভক্ত। সেরকম একটা জায়গায় গিয়ে শুটকার দেখা পেয়েছিলাম,—শুটকা, আশ্চর্য, ব্যাটার একটা সুন্দর নামও আছে—মুগ্ময় গুপ্ত, উহ্ রে স্‌সাহ্, মইরা যামু। শুটকাই আমাকে প্রথম বলেছিল, আমার মুখে লাল লাল দাগ, সত্যি, এত জোর ছিল ফাদারের হাতে। সেইদিন প্রথম আমি মদ খেয়েছিলাম, এ ব্যাপারে শুটকাই আমার গুরু, ওই আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল একটা জায়গায়—যে জায়গাটার নাম তার আগেও আমি শুনেছি, হলধরের জুয়ার আড্ডায়, আর এও শুনেছিলাম, হলধর আসলে কেশবের মাইনে করা লোক, মানে আমার বড়দার। তবে কেশব সেখানে যায়-টায় না, আড্ডাটাকে সবদিক থেকে রক্ষা করা—এই আর কি, পুলিশ-টুলিশের হাত থেকে, ও শুধু মাসে মাসে নিজের হিসাবের টাকাটা নিয়েই খালাস, বাকী যা কিছু সবই হলধরের। শুটকা একটা ঘরে আমাকে সেখানেই নিয়ে গিয়েছিল, তবে কোন জুয়ার ঘরে না, অন্য একটা ঘরে, আর বলেছিল, 'গুরু, একটু মাল খা। পেটে একটু মাল পড়লে দেখবি সব ঠিক আছে।'

আমার একবারও মনে হয়নি, দারুণ কিছু একটা পাপ করছি, আর খেয়ে বেশ ভালই লেগেছিল। কোথায় কীভাবে যে রাতটা কেটে গিয়েছিল, ভাল করে মনে করতেই পারিনি। শুটকাটা একটা ম্যানেজার লোক, সেখান থেকে রিক্সায় করে কোথায় যে নিয়ে গিয়েছিল, পাশের আর একটা শহরে, আমাদের শহরের বাইরে—যেখানে একটা বাড়িতে রাত কেটেছিল—না, বেশ্যাবাড়ি না, বাড়িটা আসলে রামকৃষ্ণ বলে একটা লোকের, যার কাজ হচ্ছে, রেলের ওয়াগন ভেঙে চুরি করা। ওদের একটা দলও আছে, আর এখন এও জানি, রামকৃষ্ণের সঙ্গে—হ্যাঁ, একে বলে নাম, রামকৃষ্ণ ওয়াগন ব্রেকার, যার সঙ্গে কেশবের ভাল লেনদেনই আছে। কেশব ওসব চোরাই মাল রামকৃষ্ণের কাছ থেকে কেনে, বেঁচে অন্য জায়গায়, অন্যভাবে, কিন্তু ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে, শত হলেও একটা দলের নেতা তো, একটা ইজ্জত আছে, তার পক্ষে খোলাখুলি কিছুই করা চলে না। কিন্তু শুটকার ওপর আমার একটু রাগ হয়েছিল, ও খালি আমার বাবার নামটা সব জায়গায় বলছিল, আমি অমুকের ছেলে, না হয়তো অমুকের ভাই। তাতে খাতির করেছিল সবাই, তবে আমার ভাল লাগেনি, রাগ হচ্ছিল, বলেছিলাম, পরিচয় পড়বার কী আছে।

সেই প্রথম রামকেষ্টর সঙ্গে আমার ভাব, প্রায় চারদিন ছিলাম ওর ওখানেই, অবিশ্যি কোনদিন ওয়াগন ভাঙতে যাইনি, এদিক ওদিক নানান জায়গায় ঘুরেছি। তার মধ্যে শুটকা রোজই এসে জানাতো, আমাকে খুব খোঁজাখুঁজি চলেছে, কেশব পূর্ণেন্দু তো খুঁজছিলই,

শুলাদাও শহরের সব জায়গায় সব বাড়িতে বাড়িতে খোঁজ করেছিল, কারণ ফাদার নিজেই নাকি সবাইকে খোঁজ করতে বলেছিল, এমন কি শিখাও খোঁজাখুঁজি করেছে, শুটকাকে জিজ্ঞেস করেছে, সে জানে কিনা, কোথায় আছি, শুটকা বলেনি, তবে শুটকাই আমাকে বাড়ি ফিরে যেতে বলেছিল বারে বারে, আমি শুনিনি। তারপরে একদিন শুটকার সঙ্গে শুলাদা একেবারে রামকেষ্টর বাড়ি এসে হাজির হয়েছিল, আর এই এক ধরনের লোক আছে পৃথিবীতে, শুলাদাদের মতন, কিছুতেই এদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যায় না। তা ছাড়া আমারও একটা কেমন ছিল, ওকে আমি এড়িয়ে যেতে পারতাম না। ও যেন অন্যরকম কিছু, ওই কালো কুচকুচে রঙ, গলায় কণ্ঠী, গরুর মতন ড্যাবা ড্যাবা চোখ, আর ওগো হ্যাগো করে কথা বলা—ওকে আমার মানুষ বলে গণ্য করতে ইচ্ছা করে না, অথচ ওর সঙ্গে ঠিক যেন পেরেও উঠি না। আমার মনে হয় শুলাদা আমার মাকে মনে মনে ভালবাসতো—মানে পুরুষেরা যেরকম মেয়েদের ভালবাসে, সেইরকমই, তবে তার মধ্যে একটা অন্যরকম ভাব ভক্তি ছেদ্দাটেদ্দা মেশানো, তার ওপরে চাকর-বাকর হলে যা হয়, চিরদিন মাথা নিচু করেই ছিল, মাকে ঠাকরুণ বলে ডাকতো, আর মায়ের কথার জন্যে এক পায়ে খাড়া থাকতো, মা ওকে শূল বলে ডাকতো।

শুলাদাই আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বাবা নাকি একদম "চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল, তখন তো রিটায়ার করে গেছে, সারাদিনই বাড়িতে, সবাইকেই খালি এক কথা নাকি জিজ্ঞেস করছিল, টুকুর কোন খোঁজ পাওয়া গেল? আমি মাথা নিচু করেই গিয়েছিলাম, কারুর সঙ্গে কোন কথা হয়নি, ফাদার যেন জানতেই পারেনি আমি বাড়ি ফিরে গিয়েছি, দেখা-সাক্ষাতও ছিল না। কিন্তু আহ্, এখনকার ফাদার আর সে ফাদার নেই, লোকটা যে বাড়িতে আছে তা পর্যন্ত জানা যায় না। লোকটার একটা কী গোলমাল হয়ে গেছে, সারাদিন চুপচাপ, রাত্রেও ঘুমায় না, ঘর অন্ধকার করে বসে থাকে। দাদাদের কারুর সঙ্গেই কথা বলে না, অথচ আশ্চর্য এই, আমার সঙ্গে মাঝে মধ্যে দু-একটা কথা হয়—তবে দিনের বেলা না, রাত্রে, যখন আমি মাল খেয়ে ফিরি। সত্যি ভাবা যায় না, আমি মাল খেয়ে ফিরলেও বাবা একদম চুপচাপ, আর তাতেই তো গোলমাল হয়ে গিয়েছিল একদিন।

আমি নিজেই কি জানতাম নাকি, দুম করে ফাদারের ঘরে ঢুকে যাব ওই অবস্থায়। কিন্তু ওই কী একটা পোকা একদিন মাথায় ঢুকেছিল, ওরকম চুপচাপ থাকা আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। আর পেটে রস পড়লে, মাথার মধ্যে এমন গোলমাল হয়ে যায়, কী করতে কী করে বসব, কিছুই জানি না। একদিন রাত প্রায় এগারোটায়, ফাদারের অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম, সুইচে হাত দিয়ে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম। দিতেই দেখেছিলাম বাবা একটা চেয়ারে চুপ করে বসে আছে, আর আলো দেখেই এমন চমকে উঠেছিল, যেন আচমকা কেউ মেরেছে, এমনিভাবে নিচু গলায় প্রায় ডুকরে উঠেছিল, 'কে? আহ্, নেভাও, বাতি নেভাও তাড়াতাড়ি।

এমনভাবে বলেছিল, না জানি কী ঘটেছে, যে জন্যে সঙ্গে সঙ্গে আলো অফ করে দিয়েছিলাম। খানিকক্ষণ পর্যন্ত একদম চুপচাপ, যেন আলোটা জ্বলে উঠে কী সব গোলমাল করে দিয়েছিল, সেটা ঠাণ্ডা হতে একটু সময় লেগেছিল। আমি তো ভেবেছিলাম, ফাদার উঠবে, একটি লাথি মারবে, কিক যাকে বলে। কিন্তু সেসব কিছুই হয়নি—কী বিচ্ছিরি অন্ধকার, মনে হয়েছিল, পৃথিবীতে এক ফোঁটা আলো নেই, সব অন্ধকারে ডুবে গেছে আর সেই অন্ধকারে, বাবার গলা শোনা গিয়েছিল, 'কী চাই।'

আমি বলেছিলাম, 'কী করছেন অন্ধকারে বসে বসে।'

'সে খোঁজে তোমার দরকার নেই।'

কিন্তু কী আশ্চর্য, আমার বাতিটা জ্বালতে ইচ্ছা করছিল, মানে অনেকটা বলতে গেলে, ফাদারের পেছনে লাগবার জন্যেই দেখতে ইচ্ছা করছিল, ফাদার কী রকম করে ওঠে আর কেমন করে ওঠে, সেটাও জানতে ইচ্ছা করেছিল। আমি বলেছিলাম, 'আমি আলোটা আবার জ্বালবো।'

'না, বারণ করছি আলো জ্বালবে না।' মোটেই ধমকের সুরে বলেনি বরং অনেকটা মিনতি বলতে যেরকম বোঝায় সেইভাবেই মোটা গলায় বলছিল আর যেন অনেক দূর থেকে বলছিল। আর সেই প্রথম যে কথা, আমি কাউকে বলিনি, সেই কথাই আমার মনে এসেছিল, কারণ সেখানে একটু সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতেই, আমার মনে হয়েছিল, ঠিক বুঝছি না, কিছুই ভাল লাগছে না, কেন আমি আছি, কেনই বা জন্মেছিলাম। তাই বলেছিলাম, 'আপনার ওপর আমার সব থেকে বেশী রাগ।

'রাগ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'কেন আমাকে এনেছিলেন।'

'এনেছিলাম?'

"হ্যাঁ, কেন জন্ম দিয়েছিলেন।'

'ফজিলামি করো না, যাও। 'ফাজলামি না, আমি জানতে চাই কেন এনেছিলেন। আপনি কি জানতেন, আমি আসব, আমি, এই আমি!'.

'তা কেউই জানতে পারে না।'

আমি প্রায় জেদ করে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, যেন অনেকদিনের একটা চেপে রাখা রাগ হঠাৎ একেবারে খেকিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, 'জানতে পারেন না তো এনেছিলেন কেন। আপনি তো এনে খালাস, এখন আম কী করব।'

'তুমি—'

ফাদার চুপ করেছিল খানিকক্ষণ, কোন কথাই বলেনি, যেন এমন একটা ধাঁধা দিয়েছিলাম তা সলভ করার উপায় ছিল না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে, একটু পরে ফাদার বলেছিল, 'আমি কেন জন্মেছি, তাও আমি জানতাম না।'

'সে কথা আপনার বাবা জানতো।'

'না, বাবাও জানতো না। সে কথা কেউ বলতে পারে না।'

'বলতে পারবে না, অথচ আনতে পারবে, আর তারপরে?'

'তারপরে—তারপরে—যার যার নিজের ব্যাপার।'

'সে মরুক বাঁচুক কষ্ট পাক বা যা খুশি তাই হোক—'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে ফাদার বলেছিল, 'হ্যাঁ। তুমি এখন যাও।'

'না, আমি আলোটা জ্বালব, আপনাকে দেখব।'

'না না, বারণ করছি—'

ঠিক সে সময়েই শুলাদা এসে আমার হাত ধরেছিল, 'ছোটখোকা, চলে এস' বলে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে, প্রায়ই আমি বাবার অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়ি। খুট করে লাও জ্বালিয়ে দিই, বাবা চমকে চোখে হাত চাপা দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'আহ্, নেভাও নেভাও।' আমি খানিকটা মজা পাই, আমার অবাক লাগে, লোকটা কী করে ওরকম বসে বসে—অথচ মালও খায় না যে, ভোম হয়ে বসে থাকে, যেন বসে বসে কী ভাবে। কিছুই বুঝি না আমি, তার ওপরে রাগ ঝাল কিছুই নেই, এমন কি আমার তো অবাকই লাগে, আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেও বলে না। বাইরে যা-ই করি, খাই তো বাড়িতেই, তার জন্যে কোন টাকা পয়সা দিতে হয় না, থাকিও বাড়িতেই। ইচ্ছা করলে ফাদার তো আমাকে যে কোনদিন তাড়িয়ে দিতে পারে, টাকা পয়সা চাইতে পারে, কিন্তু কিছুই বলে না। এইসব ব্যাপারগুলো সব মিলিয়ে ফাদারের ওপর আমার কেমন একটা মায়া-মায়া ভাব আসে। টাকা পয়সা কারুর কাছেই চায় না, কেশব পূর্ণেন্দুর কাছেও না, তবে ওদের সঙ্গে এখন কথা একেবারেই বন্ধ, আমার সঙ্গেই যা দু-একটা কথা হয়, নেহাত পেছনে লাগি বলে। পেছনে লাগি বটে, তবু কী রকম একটা মনের মধ্যে হয়, ওই মায়া মমতা ধরনের। কী জানি সেটা কী, ফাদারকেও বুঝি না, নিজেকেও না।

যাই হোক, সেই কলেজ-ছাড়া, তারপরে পুরোপুরি গুণ্ডা, শহরের এখন আমি নাম-করা সেরা মাস্তান, কিন্তু এই বড়দা, মেজদা ক্রমেই আমার সঙ্গে গোলমাল পাকিয়ে তুলছে, ওরা আমাকে রেগুলার শাসাচ্ছে, যে কারণে, কারখানার ম্যানেজার চোপরা পর্যন্ত বলেছে, আমি যেন কেশবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলি। কাঁচকলা, ওসব ভয় আমাকে দেখিয়ে লাভ নেই, আমি ওর সব কীর্তি জানি, ও রাজনীতির খচড়ামি ছেড়ে আসুক না, তা হলে আর ওর সঙ্গে আমার কতটুকু তফাত। যেমন শুটকা আজকাল প্রায়ই বলে, পূর্ণেন্দুদের দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে! কেননা, ওরা নাকি আমাকে একদিন হাপিস করে দেবে। দিলেই হল, কেন, ও কোথাকার পীর, গরীবদের নেতা সেজে বসে আছে। ওদের দলে গরীব কোথায়, ওরা যেসব গরবীদের কথা বলে, তারা তো ওদের চারপাশে নেই, নিজেরা গিলছে, কুটছে, দলাদলি করছে, আর বড় বড় বাত মারছে, ওই বাত মেরেই লোকের মন ভুলিয়ে রেখেছে, গরীবদের রাজা করে ছাড়ছে। ওদের দলের সব ক'টা ছেলেকে আর লোককেই আমি চিনি, জানি ওদের দলে গুণ্ডামি করবার ছেলেরও অভাব নেই, আমার সঙ্গে যে কোনদিনই লড়ে যেতে পারে, কিন্তু আমিও তো ওদের চিনি। মারামারি করবার লোক ওদের দুই দলেই আছে, কিন্তু আমি কেন যাব। আজ পর্যন্ত তো ওদের দলেব কোন মাস্তান আমার সঙ্গে এটে উঠতে পারেনি, বরং মার খেয়েই গেছে, তাতে আক্রোশ বেড়েছে, আর গালাগালি দিয়েছে। তবে হ্যাঁ, আমার দলের ছোঁড়াগুলো কেমন যেন একটু বেগড়বাই করছে, কোন-না-কোন দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে চাইছে। যাক, চলে যাক, আমি ওসবের মধ্যে নেই।

বড়দাটা তবু এক রকম, ওর চরিত্র লোকে জানে, কোন গুণেই ঘাঁট নেই, দল করে, টাকা মারে, চোরাই ব্যবসা করে, সবরকম আছে। মেজদা কেন গরীবদের নেতা, ওর জোচ্চোরিও তো অনেকখানি। চাকরি করতে গেলে, সাহেব আলাদা মানুষ—এই সেদিনও খবর পেয়েছি, কোম্পানি আটাশ বিঘা জমি কিনেছে, জমির যারা মালিক ছিল, সেইসব গরীবদের টাকা ওর হাত দিয়েই পেমেন্ট হয়েছে, বিরাশি হাজার টাকা থেকে আট হাজার টাকা কম নিতে হয়েছে সবাইকে। ও নিজে কিছুই করেনি, ওর কেরাণীবাবুই, মানে শিখার এক দাদা, সব ব্যবস্থা করেছে, আর গরীবরা টাকাটা তাড়াতাড়ি পাবার জন্যে আট হাজার টাকা ছেড়েই ভাগাভাগি করে নিয়েছে, খবর আমার সব জানা। আর এখানে দেখ, ধুতি পাঞ্জাবি পরে, রাজনীতি করছে, তাও আবার গরীবদের দল। ঘরের আলমারিতে গিয়ে দেখ, স্কচ হুইস্কির বোতল লুকানো রয়েছে। এখন আবার বলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে নাকি, পুরো রাজনীতিই করবে, ইলেকশনে দাঁড়াবে, উহ্‌রে স্‌সাহ্‌, আরো মারাত্মক।

তা যা খুশি তাই করুক গে, আমার দেখবার দরকার নেই, তবে ওই গরীব কথাটা ওদের মুখে শুনলেই আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। গরীব তো শিখার দাদার মত লোকেরা, যারা আসলে বুলি আর তেল দেওয়া, নচ্ছারিপনা ভাল জানে, জানি গরীবের থেকে ওরা সেটাই বেশী পারে, আর এদের দিয়েই বড়দা মেজদার দল চলছে, আর আসলি আদমিরা সব জাহান্নামে চলে গেছে। তা হলে বাবাও তো একরকেমর নেতাই ছিল, একজন—কী বলে এদের খবরের কাগজে—আমলা, হ্যাঁ আমলা, মস্ত বড় সরকারী আমলারা যেমন ঘুঘুদের দিয়ে কাজ চালায় সেইরকম। একবার জেকে বসতে পারলেই হল একটা উঁচু জায়গায়, তখন তাকে সরাও দেখি, সে তখন নেতা, বাবার মতন একটা বড় আমলা। সবাই তখন তাদের মানে, ভয় পায়, কারণ তখন তারা বেশ জমিয়ে বসেছে, যেমন কেশব আর পূর্ণেন্দু। তা যা খুশি তাই করুক গে, আমি দেখতে চাই না, তবে আমার পিছনে লাগতে এলে, আমি ছাড়ব না। তোমরা সব ভাল, আর আমি খারাপ, স্‌সাহ্‌ খচ্চর। তাই দেখেছি, দু'দলই এখন আমার পিছনে লাগছে, যেন ওরা হল, কী বলে, সুপ্রীম—সুপ্রীম, ওদের কবজায় থাকতে হবে, যা-ই করি না কেন।

এ সবের জন্যে আমি ভাবি না, এ সবে আমার কোন কষ্ট হয় না, কিন্তু শিখা—এই

শিখাকে নিয়ে এই অসহ্য একটা কষ্ট, একটা জঘন্য ঘেন্না আর রাগ, অথচ ছেড়ে যেতে পারি না, কেন তাও জানি না, এই একটা ভূতুড়ে ব্যাপার আমাকে যেন ছিঁড়ে খেয়ে ফেলতে চায়। আমি জানি না, কেশবের সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক, পূর্ণেন্দুর সঙ্গে কী সম্পর্ক, অনিলের সঙ্গে কী সম্পর্ক, ওরা মৌমাছির মত এখানে এসে জমেই বা থাকে কেন। অবিশ্যি, আরো অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক, সেটা তো আমি জানি, আমার তো খালি শিখাই না, তবু আমি শিখাকে ছাড়া তো আর ভাবতেই পারি না—মানে শিখাকে পেলে, আর কাউকেই চাই না—জানি না, এটা আমার মিথ্যা কথা কিনা, কেননা, মঞ্জরী বলে যে মেয়েটার সঙ্গে মিশি, ওকে দেখলেই তো মনে হয় দিনরাত চটকাই, তবু শিখার ব্যাপারটা একদম আলাদা মনে হয়। আর আমার অন্য মেয়েদের ব্যাপারের মত যদি শিখার অন্য ছেলেদের ব্যাপার হয়—অসম্ভব, তার চেয়ে মেরে ফেলাই ভাল। একটু আগে, আমি জানি না, ওকে কী করতে যাচ্ছিলাম, হয়তো মেরে ফেলতেই চাইছিলাম, অথচ পারি না, আর এসব কিছু ঘটলেই, আমার সেই কথাটা মনে হয়, দিশেহারা হয়ে যাই, আর মনে হতে থাকে, 'কেন, আহ্, জঘন্য ব্যাপার, কেন আমি এসেছিলাম এই পৃথিবীতে' এখন আমার সেই কথাটাই মনে হচ্ছে, কুকুর বেড়ালরা যেমন জানে না, তারা কেন এসেছে, আমিও তেমনি জানি না—না না, বাবা মায়ের জন্যেই আসা সেটা বুঝি, কিন্তু আমিই কেন—আমি এই সুখেন্দু-টুকু-আমিই কেন, যে জন্যে বাবার কথাও মনে পড়ে যায়, সে কথা কেউ বলতে পারে না, অথচ এই যে এসব যন্ত্রণা, আমাকেই ভোগ করতে হচ্ছে।

শিখা এখন আর আসবে না, আর এই চারদিকে নিঝুম চুপচাপ ঘরটাতে, এসব কথা আর ভাবতে পারি না। মনে হচ্ছে, কোথায় দু-একটা পাখী ওরকম চিকপিক করে ডেকে উঠছে, গিয়ে গলা টিপে দিয়ে আসি, কেননা, ঠাট্টার মতন লাগছে। আসলে আবার শিখাকে পাবার ইচ্ছাই মনের মধ্যে জাগছে, কারণ নিজের এই কষ্টটা তা নইলে যেতে চায় না, এই যে দিশেহারা একটা ভাব—তার চেয়ে যাই, কোথাও গিয়ে কষে খানিকটা মাল টানি। সেই চেয়ারটার কাছেই দাঁড়িয়ে আছি, একটু নড়তে পর্যন্ত ভুলে গেছি। বেলা যে বেড়েছে, বোঝা যাচ্ছে, ঘরের আলোটা বেড়েছে, তবে ঘরটার আশেপাশে এত গাছ আছে, যেন তাদের ছায়াও দেওয়ালের কোথাও কোথাও পড়েছে। যেখানে প্রজাপতিটা মার খেয়ে পড়েছিল, সেইদিকে একবার তাকিয়ে, আমি দরজার দিকে পা বাড়ালাম। তখনই, দরজায় শিখাকে আবার দেখা গেল, আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম, ওর হাতে এক কাপ চা। ও আমার দিকে তাকালো না, সোজা এল, টেবিলের ওপর চায়ের কাপ রাখলো, কিন্তু চলে গেল না, টেবিলের কাছেই মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েই রইল। ওকে দেখে এখন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, অন্ততঃ জামা-কাপড়ে যে, ওকে একটু আগেই কীরকম চেয়ারে ফেলে চটকানো হয়েছে। তেমনি চুল খোলা, শিকের গরাদ আলগা আলগা জামা, গোলাপী গোলাপী আঁচলটা পিছনে ফেলা। কেবল, এইটুকু বোঝা যাচ্ছে, ওর রাগ হয়েছে, কথা বলবে না, গম্ভীর আর ভার।

কিন্তু ও আমার জন্যে চা করে নিয়ে এসেছে এই দেখে, এই মনে হতেই, আমার একটা কষ্ট আর আনন্দ দুই-ই হল—জানি না, কষ্ট আনন্দ, দুই-ই এক সঙ্গে কী করে হয়—অথচ এর মধ্যে একটা অন্যরকম খচখচানিও আছে, কেন ও সব ব্যাপারটাকে এত সহজ করেই বা ফেলতে চায়।

আমি ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, পিঠে হাত রাখলাম, ও মুখটা একটু ফিরিয়ে ওর বড় বড় চোখে আমাকে একবার দেখল, রাগ আর দুঃখ মেলানো থাকলে যেরকম হয় অনেকটা সেইরকম চাউনি। আবার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো, 'চা।'

আমি দু' হাত দিয়ে ওকে আমার দিকে ফিরিয়ে নিলাম,আর আলতো করে ঠোঁটে একটা চুমো খেলাম, ও আবার বললো, 'চা খেয়ে নাও।' আমি আরো বেশী করে জড়িয়ে ধরে, ওর ঠোঁটের দিকে তাকালাম, যেখানে একটু আগেই রক্ত বেরিয়ে পড়েছিল। এখন আর একটুও রক্ত নেই, নিশ্চয় ধুয়ে এসেছে, বললাম, 'আমাকে একটু চুমু খাবে?'

'না।'

‘খাও না, প্লীজ!’

ও একবার আমার চোখের দিকে তাকালো, তারপরে মুখটা তুলে আমার নিচের ঠোঁটে চুমো খেল, তখন ওর ওপরের ঠোঁটটা আমার মুখের মধ্যে। একটু পরেই, ঠোঁট খুলে নিয়ে আবার বললো, ‘চা খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হচ্ছে।’

কিন্তু এখন আর আমার চা খেতে ইচ্ছা করছে না, ওকে ছাড়তে ইচ্ছা করছে না, কিন্তু পাছে ও আবার চলে যায়, তাই প্রায় এক ঢোকে চা খেয়ে নিলাম। নিয়ে কাপটা রেখে ওকে যখনই ফিরে ধরতে যাব, এমন কি মনে মনে দরজাটা বন্ধ করে দেবার কথাও ভেবেছি, তখনই ও বলে উঠলো, ‘তুমি একটা সর্বনাশ না করে ছাড়বে না, না?’

জবাব দেবার আগেই, আমি ভাবতে আরম্ভ করি, এ কথা বলছে কেন, আর ও এভাবে কথা বললেই এমন একটা ভাব করবে, যেন ও আর শিখা নেই। আমি ভুরু কুঁচকে তাকাতে ও নিজেই বললো, ‘তুমি তোমার ওই শুটকা বাঁদরটাকে বলেছ, কেশবদা এক জায়গায় দুশো কুইন্টল চাল আর একশো পাউন্ডের মত বেবী ফুড লুকিয়ে রেখেছে?’

আবার সেই কেশব পূর্ণেন্দু। বললাম, ‘কেন, মিথ্যা কথা বলেছি নাকি?’

‘সত্যি হোক, মিথ্যা হোক, তোমার এসব কথা বলবার দরকার কী। তোমাকে আমি কতদিন বলেছি, তুমি এসবের মধ্যে থাকবে না। লোকে তোমাকে আগে খারাপ বলবে, ওদের বিচার পরে করবে, লোকদের তুমি জান না?’

তার মানে, আমি তো গুণ্ডা, তাই একথা শিখা বলছে, আর কথাটা মিথ্যাও বলেনি, কারণ আমার ওদের মত রাজনীতির দল নেই, আমি নেতা না। কিন্তু একথা ভাবলেই, আমার মাথায় রক্ত উঠতে থাকে। আমি বললাম, ‘ওসব আমি মানি না। জানি, তাই বলেছি। আমার পেছনে ওরা লাগতে আসে কেন।’

শিখা মাথা নাড়তে নাড়তে, কেমন একরকম কষ্ট লাগার মত গলায় বললো, ‘না না, এসব করো না, মানতে তোমাকে হবেই। তোমাকে এত করে বলছি তুমি এসবের মধ্যে যেও না। তুমি শুটকাকে বলেছ, শুটকা আবার সে-সব পূর্ণেন্দুদাদের দলের কাকে বলেছে, কেশবদা একেবারে ঝড়ের মত আমার কাছে ছুটে এসেছে। কাল রাত্রে বলে গেল, টুকুকে সাবধান করে দিও, ও সাপের গায়ে পা দিতে যাচ্ছে, ভাই বলে পার পাবে না।’

আমি শিখার দিকে চেয়ে বললাম, ‘তোমাকে বলতে এল কেন?’

শিখা ভুরুটা তুললো এমনভাবে, আর চোখ দুটো একটু বড় করলো, যেন খুবই অবাক হয়েছে। বললো, ‘তোমার নামে সব নালিশ তো আমাকেই শুনতে হয়। কেশবদা, পূর্ণেন্দুদা সব নালিশ তো আমাকেই করে, নতুন নাকি?’

আমি জানি তা, তবু আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি, ভাবি, কেন, ওরা দু’জনে দু দলের হয়েও কেন শিখার কাছেই ছুটে ছুটে আসে। অবিশি, জানি, আমার কথা শিখাকে বললে, ঠিক আমার কানে আসবে, হয়তো সেই জন্যেই বলে, কিন্তু যারা নিজেরা দলাদলি করে, তারা কেন এই একটা মেয়ের কাছেই আসে। এ সময়ে শিখার একটা কথা আমার মনে পড়ে যায়, ‘পুরুষেরা সবাই এক, মেয়েদের কাছে ওদের চাইবার আর কিছু নেই। অবিশ্যি জানি না, চাইবার কী থাকতে পারে, পুরুষদের কাছেই বা মেয়েদের কী চাইবার থাকতে পারে, একখানি জিনিস ছাড়া; তবু আমার মনের মধ্যে গোলমাল হতে থাকে।

শিখাও আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল, আর তাকিয়ে থাকতে থাকতেই, কাছে—আমার খুব কাছে এসে বললো, ‘কী, ওরকম তাকিয়ে রইলে যে? সবাই ভাবে, আমি তোমাকে সব কথা বলতে পারব, তুমি আমার কথা শুনবে, তাই আমাকে সব বলে।’

আচ্ছা, শিখা কি বেশ্যা নাকি, যেরকম থাকে না, অনেক পুরুষের সঙ্গেই লেনদেন, কিন্তু নিজের একটা আলাদা পেয়ারের লোক থাকে, কী যেন একটা বলে তাকে—আমি কি সেইরকম নাকি। কিন্তু তা ভাবতেও আমার ইচ্ছা করে না, কেননা, ভাবভঙ্গি তো সেরকম না, অথচ নাহ, সারা জীবনে বোধহয় এর জবাব পাওয়া যাবে না। আমি বললাম, শুটকা যে বলেছে, কেশবকে সে কথা কে বললো। আমি তো শুটকাকে বলতে বারণ করেছিলাম।’

'তা আমি কী করে জানব, কেশবদা শুনে এসে, আমাকে বলতে এসেছিল। দেখলাম, চোখমুখ লাল; বলেই চলে গেল।'

'ওহ্, তাই বড়বাবু কাল সারা রাত বাড়ি ফেরেনি, ভোর রাত্রে ফিরেছে, তার মানে চোরাই মাল আর বেবীফুড আবার অন্য জায়গায় পাচার করে দিয়েছে।'

বলতে বলতে স্‌সাহ্‌, দারুণ হাসি পেতে লাগলো, কিন্তু শুটকা, শুটকা হারামজাদা তো গোলমাল আরম্ভ করেছে। আমি বললাম, 'শুটকা শুয়োরের বাচ্চাকে আমি ছাড়ব না। ও স্‌লা মেজদাদের দলের সঙ্গে হব্‌নব্‌স্‌ আরম্ভ করেছে।'

শিখা বললো, 'ঠিকই করেছে, শুটকা কাজ গোছাচ্ছে, যে কোন একটা দলে তো যেতেই হবে, তাই পূর্ণেন্দুদাদের দলে চলে যাচ্ছে। তোমার মত বোকা নাকি কেউ, তোমাকেও একটা দলে চলে যেতে হবে; তা নইলে টিকতে পারবে না। তা না, তুমি আবার পূর্ণেন্দুদার নামে কী সব বলেছ, কোম্পানীর টাকায় কেনা জমির টাকা মেরেছে, না কী করেছে।'

'তা তো মেরেছেই, তোমার দাদা তো সবই জানে, ওর হাত দিয়েই হয়েছে।'

'হোক, সে কথা তোমার বলার দরকার কী।'

'না, আমি বলছি, ও এত হাজার হাজার টাকা মাইনে পায়, গায়ে আঁচড়টি লাগে না, ও কেন গরীবদের নিয়ে রাজনীতি করে।'

'ওসব পুরনো কথা, তোমার মুখে অনেক শুনেছি, কিন্তু পূর্ণেন্দুদা একজন নেতা, সে ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারে, শুধু তা না, তুমি ওদের দলের রমেশকে নিয়েও নাকি যা-তা বলেছ।'

'কে রমেশ?'

'কেন, যে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে আছে, কেরানী—'

'ও, সেই মোটা কাচের চশমা, সব সময় কাটি দিয়ে দাঁত খোঁটে, আর শকুনের মতন এদিক ওদিক তাকায়?'

'সে সব আমি জানি না, তুমি রমেশের নামে বলেছ, "এই সাব-ডিভিশনের প্রাথমিক শিক্ষকদের কত হাজার টাকা গভর্নমেন্টের কাছে পাওনা ছিল, সেই টাকা থেকে সে টাকা মেরেছে। আবার এ সব লোকেরা মিছিলে বেরোয় কী করে জানি না।" বলেছ তুমি?'

'হ্যাঁ, বলেছি তো, প্রমাণ করে দিতে পারি, আমাদের এখানকার প্রাইমারী ইস্কুলের হেডমাস্টার নিরাপদবাবুই বলবে, আট মাস শুধু শুধু দেরী করেছে টাকাটা দিতে। অথচ সব রেডি হয়ে পড়েছিল, তারপরে যখন আড়াই হাজার টাকা মাস্টাররা ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছে, তখন চেক পাস হয়েছে।'

'প্রমাণ আবার করবে কী করে, লেখাপড়া আছে নাকি কিছু।'

'কেন, নিরাপদবাবু বলেছেন; উনি কোনদিন মিথ্যা বলেন না।'

'ওটা বুঝি প্রমাণ হল, কী যে ছাই বল না। নিরাপদবাবুই বা কীরকম লোক, ওঁরা ছাড়লেন কেন?'

'পেটে যে ইঁদুরে ডন মারছিল ওদিকে।'

শিখা হেসে ফেললো, হঠাৎ আর কথা যোগালো না মুখে। আমি আবার বললাম, 'ওরা আমাকে তো গুণ্ডা বলছে, ওরা কী? ওরা কি সত্যি সত্যি গরীবের দল করে? সেই সব আসল গীরবেরা কোথায়, কোনদিন দেখেছ? সব তো ওরাই।'

'না, সবাই তো আর পূর্ণেন্দুদা বা রমেশ না।'

'সে তোমার, লোম বাছতে কম্বল ফাঁকা হয়ে যাবে।'

শিখা প্রায় ভুরু কোঁচকাতে যাচ্ছিল, আমি একটা খিস্তি করতে যাচ্ছি ভেবে। আমি আবার বললাম, 'আরে গুণ্ডা বলে তো কানা না, দেখগে, গরীবেরা নিজেদের মতই আছে, এরা ফাটাফাটি করে যাচ্ছে।'

শিখা ওর খোলা চুলে ঝাপটা মেরে মাথাটা ঝাঁকিয়ে বললো, 'করুক, তুমি কিছু বলতে পারবে না। তুমি বলার কে?'

তার মানে, এটা ওর রাগ না, মাথা ঝাপটানো মানে ঝগড়া না, ও আমাকে বকছে, মানে, আছে না একরকম, ভাব থাকলে যেমন জোর করে বলা যায়, সেইরকম যে কারণে, এখন ওর চোখ দুটোর চাউনিও কীরকম হয়ে গেছে, একটু বাঁকা বাঁকা। বললাম, 'ওরা আমাকে যা-তা বলে কেন। বলবেই তো, তুমি তো যা-তাই-ই, তুমি ভাল নাকি। আর তা নইলে, তুমি ওদের কারুর একজনের দলে চলে যাও।'

কথাটা বলে, একটু একটু হাসতে থাকে শিখা৷ আমি বললাম, 'গেলে কী হবে?'

'তবু তোমার একটা দল থাকবে। তোমাকে একটা দল বাঁচাবে।'

বলতে বলতে শিখার মুখটা কীরকম হয়ে গেল। আমার ঘাড়ের পাশ দিয়ে, ও অন্যদিকে কীরকম আনমনাভাবে তাকিয়ে রইল, আঙুল দিয়ে আমার বুকের বোতামের কাছে একবার ছুঁয়ে দিল, আমার কোমরের বেল্ট একবার ছুঁয়ে দিল, বললো, 'না সুখেনদা, শোনো, তুমি সব ব্যাপারগুলোকে এভাবে নিও না, প্লীজ, তুমি বোধহয় বুঝতে পারছ না, দিন দিন কী রকম অবস্থা হয়ে উঠছে, তুমি সবাইকে শত্রু করে ফেলছ, দু'দলই তোমার ওপর ক্ষেপে যাচ্ছে, আমার ভাল লাগছে না।'

ওর এ কথাগুলো শুনে আমার যেন ভিতরে কীরকম একটা হতে থাকে, ঠিক কী, তা বুঝতে পারি না, কেবল মনে হয় ঘাড়ের কাছে কোথায় যেন একটা শিউরোনি শিউরোনি ভাব লাগে। ওরা আমার কী করতে পারে, তা জানি না, তবে হ্যাঁ, ওদের দল বড়, আমার কেউ নেই, কিন্তু ওরা কী করতে পারে আমার! মারলে, খুন করবে—কেননা, শিখা যেভাবে বলছে, এটা ঠিক ও বোধহয় সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছে। কিন্তু কেন যাব ওদের দলে। আমার থেকে কেশব পূর্ণেন্দু কিসে ভাল, আমি বুঝতে পারি না, অথচ দল আছে বলে, ওদের তাঁবে থাকতে হবে, কেন—ওরা কি আকাশ নাকি, মাটি নাকি, যার তলায়, যার ওপরে দাঁড়িয়ে আছি। যেমন বলে, ঈশ্বরের বিধান মেনে নিতে হবে, সেইরকম নাকি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কোন দলে?'

শিখা অবাক হয়ে বললো, 'আমি কোন দলে? আমি কোন দলে নেই, একটা সাধারণ মেয়ে, শিখা মজুমদার!'

'আমিও তো একটা ছেলে, সুখেন্দু—।'

'না, তুমি তা নও, তুমি কি সাধারণ নাকি। তোমাকে নিয়ে লোকের মাথাব্যথা, তোমাকে সবাই অন্য লোক বলে চেনে।'

তা ঠিক; আমি হলাম এ শহরের একটা গুণ্ডা, বড় মাস্তান, আমার অনেক রোয়াব, অনেকেই আমাকে মানে। আমাকে ওদের দলের লোকেরা মানে না ঠিকই, কিন্তু অনেকেই মানে। আমাকেও অনেকের দরকার হয়, যেমন কারখানায় বড়দা, মেজদার দু দল থাকলেও চোপরা আমাকে আলাদা ডেকে, বিশেষ বিশেষ লোকের কথা বলে, কেননা, চোপরা পৃথিবীর কাউকেই বিশ্বাস করে না। দরকার হলে কারখানার যে কোন লোককেই শায়েস্তা করতে যাই আমি। তবে আমার হল মাস্তান দল, আমার রাজনীতি নেই। শিখা ঠিকই বলেছে, আমি একটা ছেলে মাত্র না। ও যেমন বললো, ও একটা সাধারণ মেয়ে, কোন দলে নেই, আমি ঠিক তা না। আচ্ছা, আমি যদি একটা সাধারণ ছেলে হয়ে যাই, কোন দলেই যাব না—ভাবতেই হাসি পেয়ে গেল আমার, আর হাসতে হাসতেই বললাম, 'তা হলে আমিও তোমার মত সাধারণ একটা ছেলে হয়ে যাই, কোন দলেই যাব না।'

শিখা আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল, যেন অবাক না, হাসি না, কেমন একটা আনমনা আনমনা ভাবে। যেন কথাটা বুঝতেই পারেনি। বললো, 'কী করে হবে?'

'তা কী জানি।'

'আমি জানি।'

'বল।'

'চাকরি বাকরি করবে—!'

'সে তো মেজদাও করে।'

‘মেজদার মত না, শোন-না আমার কথা, তুমি সাধারণ লোক দেখনি? চাকরি বাকরি করে, খায়-দায়, বিয়ে করে, ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে।’

অবিশ্যি ভাবতেই পারছি না তা, কী করে ওরকম হওয়া যায়। তারপরে হয়তো শিখা বলবে, ঘাড়ে গদানে পাউডার দিয়ে, পান চিবুতে চিবুতে, রোববারে সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা। দুপুরে তাস পাশা খেলা, সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরেই খাটুনির কেলান্তিতে কেলিয়ে পড়ে থাকা। ছেলেমেয়ের চ্যাঁ ভ্যাঁ নিয়ে হাড় কালি করা, উহ্রে স্‌সাহ্‌, গা ঘিনঘিনিয়ে উঠছে। তবে হ্যাঁ, ওদের দলে না গিয়ে এটাও ভাল—জেনেশুনে ওসব করতে পারব না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘তখন ওদের খারাপ ব্যাপারগুলো বলতে পারব তো?’

শিখা বললো, ‘না। তা বলতে পারবে না।‘

‘বাহ, তা হলে সাধারণ লোক হয়েই বা লাভ কী?’

শিখা ভুরু বাঁকিয়ে তাকালো, বললো, ‘না, তোমার দ্বারা ওসব হবে না। আর তুমি যদি সব ছেড়েও দাও, তা হলেও ওরা তোমাকে কোনদিন বিশ্বাস করবে না, শহরে কিছু একটা ঘটলেই, তোমার কথা ওদের একবার মনে হবেই। কিন্তু তুমি কেন একটা সাধারণ ছেলে হলে না।‘

এমনভাবে শিখা বলছে, যেন আমি সুখেন্দু না হয়ে কেন নিরাপদবাবু হলাম না। এমনভাবে হাত ঝাঁকানি দিয়ে মুখটা এমন ভাব করে বললো, যেন তাতে ওর কষ্ট হচ্ছে। অথচ আমার ভীষণ হাসি পেয়ে গেল, আমি ওকে দু হাতে জড়িয়ে কাছে নিলাম, আর পায়রার মত ওর বুকটা ফুলে উঠলো, যেন ওরই চিবুকটা প্রায় বুকে ঠেকবে। ঠোঁট দিয়ে ওর একটা কানে ছুঁইয়ে দিলাম। ও কিন্তু মাথা নেড়ে আবার বললো, ‘না না, তুমি জান না, আমার এ সব কিছুই ভাল লাগছে না, আচ্ছা, সত্যি তুমি কি—।

আমি ওর ঠোঁটে আস্তে চুমো খেলাম, ও আবার বললো, ‘সত্যি, তুমি কি সব ছেড়ে ছুড়ে একটা সাধারণ ছেলে—।‘

‘চেষ্টা করব।’ বলে, এবার অনেকক্ষণ ধরে খেলাম, আর ভাবলাম ওকে যে তখন রেগে গিয়ে এত কষ্ট দিলাম, সে বিষয়ে ও একটা কথাও বললো না। খালি এসব কথাই বললো। আর এখন যেন ও কী রকম নরম তুলতুলে হয়ে উঠেছে। আমি ওকে মেঝে থেকে তুলে ফেললাম গায়ের ওপরে, কোণের চৌকিটার কাছে নিয়ে গেলাম। শোয়াতে চাইলাম, কিন্তু ও জোর করে বসে বললো, ‘না, দিদি এসে পড়তে পারে, অনেক বেলা হয়েছে।’

‘দরজাটা দিয়ে আসি।‘

‘না, এখন না, তুমি একটা কী?’

বলে, চোখের দিকে এমনভাবে তাকালো, যেন কী একটা কথা বলছে, আর তখনই আমার মনে পড়ে গেল, হুম, অসুবিধা আছে। তাই উঠে পড়ে ডান হাতের কব্জিতে ঘড়ি দেখে নিজেই চমকে উঠে বললাম, ‘উহ্‌রে, বারোটা বেজে গেছে। চলি, ওবেলা আসব।‘

বলে দরজার দিকে যেতে যেতে শুনলাম, শিখা আবার বলছে, ‘আমার কথাগুলো একটু মনে রেখো।’

আমি কোন জবাব না দিয়েই বেরিয়ে গেলাম। বারান্দা দিয়ে ওদের বাড়ির বেড়ার কাছে গিয়ে যা ভেবেছিলাম তা-ই, মোটরবাইকটার ওপরে রোদ পড়েছে। যখন রেখেছিলাম, তখন ছায়া ছিল। হ্যাণ্ডেলে হাত দিতে গিয়েই একবার থমকে গেলাম, একটা প্রজাপতি উড়ে গেল হ্যাণ্ডেলের ওপর থেকে। কী জানি, আমার হ্যাণ্ডেলে বসে কী করছিল ওটা—দেখছি, শিখাদের পাড়ায় মেলাই প্রজাপতি। হাত বাড়িয়ে একবার ধরবার চেষ্টা করলাম, পালিয়ে গেল। এটা একটু হলদে হলদে মতন। মোটরবাইকটা ঠেলে, কেরিয়ার থেকে নামিয়ে, টিনের ঝাপের দরজাটা ঠেলে বেরিয়ে গেলাম, আর পা ঠুকে স্টার্ট দিতেই গোটা পাড়াটা যেন চমকে উঠলো। লোকেরা নিশ্চয় বলাবলি করছে, ‘গুণ্ডাটা যাচ্ছে।‘

শহরের ঘিঞ্জিতে এসে প্রথমেই গেলাম পেট্রল পাম্পে, পাঁচ লিটার তেল দিতে বললাম। পাম্পের মালিক মণ্ডলকে দেখা গেল, ঘরের ভিতর কাচের মধ্য দিয়ে আমাকে দেখছে। তেল ভরতে ভরতেই, লোকটা খালি গায়ে, খালি পায়ে, গাবদা শরীরটাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে এল। আসবে জানতাম—মেলাই টাকা আমার কাছে পাওয়ানা হয়েছে কি না। আশ্চর্য, লোকটা হিসাব কেন রাখে বুঝতে পারি না—চুরি করার এত ফন্দি জানিস, তবু আমাদের কাছে তাগাদা! এসেই গলার স্বর নামিয়ে বললো, ‘সাড়ে তিনশো টাকার ওপর হয়ে গেল কিন্তু।‘

আমি ট্যাংকের মুখ বন্ধ করতে করতে বললাম, ‘তাতে কী হয়েছে, সেদিন যে আপনার সেই খচ্চর ভাড়াটেটাকে পেছনে লেগে উঠিয়ে দিলাম, সাত বছর ধরে তো পারছিলেন না, আমাকেই তো ডেকে নিয়ে গেছলেন।‘

‘তা ঠিক, তা ঠিক, তোমরা না হলে কি ওসব লোক সজুত হয়, তবে— ‘

‘তবে আবার কী, লোকটা ছিল সত্তর টাকায়, এবার তো দেড়শো টাকায় ভাড়া দিয়েছেন

—ডবল যাকে বলে।‘

বলে আমি স্টার্ট দিলাম, মণ্ডল বললে, ‘তা ঠিক—তবে—।‘

‘ইচ্ছে হয় তেল দেবেন, না হয় দেবেন না।‘

স্‌সাহ্‌, মুখটা আমার পাথরের মত হয়ে যাচ্ছে, আমি চলতে আরম্ভ করলাম, আর পিছনে শুনতে পেলাম, ‘ন না, তা বলছি না…’

কী বলছ তুমিই জান স্‌লা। ই কি মাইরি, একটা কৃতজ্ঞতা বলে কথা নেই। একটা নিরীহ লোককে বিপদে ফেললাম ওর জন্যে—অবিশ্যি নিরীহ কি না জানি না, তবু এই মণ্ডলের থেকে ভাল। বাড়ি ভাড়া কোনদিন বাকী ফেলেনি লোকটা, পাড়ার লোকেরা খারাপ বলেনি। কোনরকম এদিক ওদিক ছিল না—এক-একজনের যেমন থাকে, পাড়ার মধ্যে একটু গেরামভারি চাল, একটু হিড়িক মেরে চলা, সেরকম কিছু না। এমনও না যে, লোকটার দু’ চারটে বড়সড় মেয়ে আছে, যাদের জন্যে পাড়ার ছোঁড়ারা দিন-রাত্রি হিড়িক দিচ্ছে, রক আর আশপাশ ছেড়ে নড়ছে না, যাতে মেয়েগুলোকে ঢলানে বলে, বাপকে তাড়ানো যায়। তবু লোকটার পিছনে লেগে, ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি, কেননা, মণ্ডলের আরো মোটা টাকার ভাড়া চাই। আর বেইমানটা বলে কিনা, পেট্রলের অনেক টাকা বাকী পড়ে গিয়েছে। বাকী পড়ল কী করে চাঁদ, এতদিন কাজ বাগাবার মতলবে ছিলে, তাই টাকার কথাটা মনে করিয়ে দিতে চাওনি। এখন হাসিল, এখন তাগাদা–দিচ্ছি তোমাকে টাকা। এই শহরে করে খেতে হলে আমাকে তেল না দিয়ে তোমার উপায় নেই, তোমার চোরাই পথের ঠিকানা আমার জানা আছে। যাক গে এসব কথা, তেল ওর বাবা দেবে—কিন্তু—আচ্ছা আমি ভাবছি, সত্যি, আর দশটা সাধারণ লোকের মত আমি না-ই বা হব কেন, হওয়াটা কি খুবই কঠিন। এই চাকরিবাকরি করলাম, একটা বিয়ে—কিন্তু শিখাকে ছাড়া তা হবে না, বিয়ে করতে হলে ওকেই চাই। বেশ, ওকেই বিয়ে করলাম….দেখ দেখ স্‌সাহ্‌, গরুর গাড়িটা কীভাবে আসছে, আর একটু হলেই ওই কাঠের চাকায় ধাক্কা লাগতো, আর একেবারে উল্টে গিয়ে নর্দমায় পড়তাম। আমি একটা চিৎকার করলাম, ‘হে-ই স্‌সাহ্‌ বয়েলগাড়ি!’…

বললে কী হবে, গাড়ি টানছে বলদে, চালাচ্ছেও বলদেই, তা নইলে এই বেলা বারোটায় কেউ গান গাইতে গাইতে যায়। তার ওপরে যেমন রাস্তার ছিরি, ঠিক চোট্টা চেয়ারম্যানটার মতই খুবলানো গা, সেটা আবার কেশবের দলের লোক। এইসব মফস্বল শহরের মিউনিসিপালিটির কোন চেয়ারম্যান সম্পর্কে আজ অবধি আমি ভাল কথা শুনিনি। আর দু একটা ভাল লোক, যাদের কথা শুনেছি, যেমন ডাক্তার গঙ্গাপদ রায়, বিচ্ছিরি সোজা আর সাচ্চা লোক, একটু ন্যালাখ্যাবলা মত আছে। ছারপোকার মত ডাক্তার না যে, খালি রুগীর ট্যাকের দিকে নজর, বরং লোকটাকে জগ দেয় অনেকেই, তাকে একবার সবাই মিলে চেয়ারম্যান করেছিল, আর গঙ্গাপদ ডাক্তার ছ' মাসের মধ্যেই কাছা খুলে পালিয়ে এসেছিল, যেন জীবনে এমন ভয় সে আর কখনো পায়নি। বলেছিল, 'মাথা খারাপ, ও সব কাজ করতে গেলে যে পাঁচ-পয়জার জানা থাকা দরকার, সে এলেম আমার নেই। আমি চুরি করতে পারব না, করতে দিতেও পারব না, তার চেয়ে বাবা তাঁতীর তাঁত বুনে খাওয়াই ভাল। তার মানে, গঙ্গাপদ ডাক্তারকে নিরীহ লোক ভেবে, তাকে সামনে রেখে, যে যার গোছাবার তালে ছিল। ব্যাপার দেখে, ডাক্তার দে দৌড়, বোধহয় চোর ধরিয়ে দিতেও পারবে না, অথচ নিজেকেও দলে থেকে যেতে হবে, এই সব দেখেশুনে, কেটে এসেছে। আচ্ছা, কেন এরকম হবে, আমি বুঝতে পারি না, মিউনিসিপালিটির টাকায় গড়বড় হবেই, চেয়ারম্যানের নিজের পাড়ার রাস্তা ভাল হবেই, দশটার জায়গায় কুড়িটা লাইট পোস্ট হবেই, আর বাদবাকী সব গোল্লায় যাক, যেন বাপের জমিদারিতে এসে বসলেন উনি। দেখ দেকিনি শহরের রাস্তার ছিরি —যেখানে হাত দেবে চোরের উৎপাত—তবে কি না, লোকগুলো ভদ্দরলোক, আমার ইয়ে। শুটকা হারামজাদাটা এখন কোথায় আছে কে জানে, ওকে আমার চাই—এই যে, থানার বড়বাবু, ভ্যানের মধ্যে, ড্রাইভারের পাশেই বসে আছে, 'হ্যাল্লো স্যা—! আমি হাত তুললাম, লোকটা কোনরকমে একবার হাতটা নাড়লো মাত্র, ভুরুটা তুললো একবার, যেন হাতে কুষ্ঠ হয়েছে, ঠুটো জগন্নাথ, ওর বেশী তোলা যায় না! তা না, আসলে শহরের রাস্তায় দশজনের সামনে গুণ্ডাটাকে বেশী খাতির দেখানোটা ঠিক হবে না, তা-ই। আমার বয়েই গেল, যাক গে, ওটাও ভদ্দরলোকের চুক্তির মধ্যেই পড়ে, কেউ কাউকে ঘাঁটাবে না, ডিসটর্ব করবে না ....এটা আবার কী হচ্ছে, বেলা বারোটার পর। মোড়ের মাথাতেই, গাড়ি ঘোড়া থামিয়ে কাদের মিটিং হচ্ছে এটা। আর দেখতে হবে না, পূর্ণেন্দু—মানে মেজদাদের দল, রমেশ বক্তৃতা দিচ্ছে; ভাই, বন্ধুগণ, মহকুমা শাসকের এই জুলুমের জবাবে আমরা আগামীকাল আমাদের সমস্ত মহকুমাব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিচ্ছি। আপনারা...। রাস্তাটা এমনভাবে জুড়ে দাঁড়িয়েছে সব, যাবার পথ রাখেনি একটু। দেখছি যশোদাবাবুর দলও আছে, কত দল যে আছে, যাক, তার মানে কাল হরতাল—কাল কী বার যেন—হ্যাঁ, বেস্পতিবার। আমি মেশিনটা বন্ধ না করে দাঁড়ালাম, শব্দে অনেকেই পিছন ফিরে তাকালো, আমি রমেশের দিকে তাকিয়েছিলাম—আর কেন জানি না, হঠাৎ কিছু লোক সরে পড়তে লাগলো। আমি রাস্তার পাশে, কয়েকটা দোকানের সামনেই দাঁড়িয়েছিলাম, আর রমেশ তখন গলা আরো তুলে বলে উঠলো, 'আমি জানি বন্ধুগণ, শহরের অসামাজিক লোকেরা গুণ্ডা এবং দালালেরা নানাভাবে আমাদের...।' তার মানে, আমাকে দেখেই আমার সম্পর্কেই বলছে, আমি রমেশের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতেই মেশিন বন্ধ করলাম, আর তখন একদল লোক আমার দিকেই বারে বারে তাকাতে লাগলো—যেন আমি একটা সঙের পেরু—কিন্তু আজ বুধবার এত বেলায় এ লোকগুলো কারা, যারা ভিড় করে আছে। তারপরেই দেখি, নিরাপদবাবু একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁর মোটা কাঁচের চশমাটা প্রায় নাকের ডগায়, তাই রমেশকে দেখবার জন্যে মুখটা তুলেছেন প্রায় আকাশের দিকে, আর মুখটা কুঁচকে হাঁ-মুখটা এতখানি খুলে রেখেছেন, আর জিভটা বেরিয়ে পড়েছে, জিভটা নড়ছে এমনভাবে যেন উনিও কথাগুলো বলছেন, না কি ওভাবে গিলছেন, কে জানে। এমন সময়ে, কে যেন আমাকে ডাকলো, 'সুখেনদা। পাশ ফিরে দেখলাম, একটা জুয়েলারির দোকানের ছোকরা আমাকে ডাকছে, বললো, 'মোটর-সাইকেলটা রেখে দোকানে এসে বসুন না।' তার মানে, এ শুধু গুণ্ডার খাতির না, মেজদাদের

দলের উপর রাগ আছে নিশ্চয় কোন কারণে, আর বুঝতে পারছে তো, রমেশ আমাকেই গালাগাল দিচ্ছে, তা-ই একটু দেখিয়ে দেওয়া। স্‌সাহ্‌ চোরাই সোনার কারবার করছে, আর খদ্দেরের মালে যত খুশি পান দিচ্ছে। আমি ঘাড় নেড়ে বলি, ‘না ভাই, এখন যাব।‘

বলে আমি আবার স্টার্ট দিই। ভিড়টা একটু পাতলা হয়েছে, একটু যেন কেমন ছানা কেটে যাওয়াই, আমি আবার রমেশের দিকে তাকালাম। ও কি নিরাপদবাবুকে দেখতে পাচ্ছে, আর নিরাপদবাবু কী ভাবছেন, আমার একটু জানতে ইচ্ছা করছে। এই রমেশই তো প্রাথমিক শিক্ষকদের পাওয়ানা টাকার থেকে টাকা মেরেছিল। অবিশ্যি জানি না ওদের অফিসারও সেই টাকা থেকে টাকা খেয়েছিল কি না। না খেয়ে কি আর সই করেছিল, ছাহেব কি আর তাঁর কেরানী বাবুদের চেনেন না, তাও কি কখনো হয়। এমন কি অফিসের বেয়ারাটাও নিশ্চয় সে টাকার ভাগ থেকে বাদ যায়নি। ফাইল-টাইল সব তো আবার ওদের হাতেই থাকে, কোথায় কোনটা আছে, খোঁজ-খবর ওরাই ঠিক রাখে। আসল প্রস্তাবটা তো বেয়ারার মারফতই এসেছিল, নিরাপদবাবু তো সেভাবেই বলেছিলেন, ‘সেদিনও আশা ছেড়ে দিয়ে চলেই আসছিলাম, ভিখিরির মত মনে হচ্ছিল নিজেদের। হঠাৎ বেয়ারাটা বাইরে এসে বললে, “মাস্টেরবাবু, এতগুলো সরকারি টাকা কি আর এমনি এমনি বেরয়? আপনারা দাবী করলেন, বলতে গেলে মুফতেই তো পেয়ে গেলেন। কিছু যদি ছাড়েন-টাড়েন—মানে খুশি হয়ে একটু খাওয়ানো-টাওয়ানো আর কি, বোঝেনই তো কোন দেবতার কী পুজো, শুধু শুধু কেন এতগুলো টাকার চেক পড়ে থাকবে, রাজী থাকেন তো একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।” প্রথমটা ভাবলাম, লোকটা বদমাইসি করছে, এ কি কখনো হয়, যেখানে রমেশ রয়েছে, আমাদের আন্দোলন সমর্থন করছে, যে-আন্দোলনের জন্যে টাকাটা পাচ্ছি, সেই টাকার ভাগ দিতে গেলে রমেশই তো ক্ষেপে যাবে। বেয়ারার বেয়াদপিতে আমি গিয়ে রমেশকে সব বলে দিলাম, রমেশ আমনি অফিসারের নামে গালাগাল দিতে লাগল, তারপরে বললে, “তবে ও ব্যাটা যখন একবার তাল করেছে, তখন না ঝেড়ে সই করবে না। তা নইলে আরো দশ মাস ফেলে রাখবে।” “আরো দশ মাস ” “হ্যাঁ, একেই তো বলে লাল ফিতের ফাঁস, জানেন না? আঠারো মাসে বছর কি আর এমনি বলে। বেশি বললে দেখবেন চবিবশ মাসে বছর হয়ে যাবে, হেঃ হেঃ হেঃ....। তাই বলছিলাম, ও ব্যাটাকে যা দেবার দিয়েই দিন, নইলে ছাড়বে না, তারপরে দেখুন না, ওর বিরুদ্ধে তো শীগগিরই আমরা লড়াইয়ে নামছি, ওর অত্যাচার আমরা মুখ বুজে সইব না.... ” কিন্তু রমেশ একটা দলের লোক হয়ে যে টাকাটা দিতে বলবে, ভাবতে পারিনি। আর আমাদের তো জান, এদিকে আনতে ওদিকে কুলোয় না, আমরা মাস্টাররা সবাই মিলে ঠিক করে ফেললাম, নিয়েই নিই, নিয়েও নিলাম। কী জানি, বাবা, শেষে মূলে হা-ভাত হবে। সব দেখেশুনে কেমন যেন লাগে, ভিরমি যাকে বলে, কিছুই বুঝি না।‘...

মাস্টারমশাই এখনো যেভাবে রমেশকে দেখছেন আর ওর বক্তৃতা শুনছেন, তাতেও বোধহয় ভিরমিই খাচ্ছেন। দেখলাম, রমেশ আমার দিকেই তাকিয়ে আছে, ও বোধহয় একটা বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখগুলো ধকধক জ্বলছে, ওর আশেপাশে আরো কয়েকটা চোখও ঠিক সেইরকম জ্বলছে, যেন আমাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। হঠাৎ আমার ঘাড়ের কাছে কী রকম শিউরে উঠলো—কীরকম একটা অস্বস্তি অস্বস্তি ভাবের। আমি এগিয়ে চলে গেলাম, রমেশ চিৎকার করে চলেছে—শিখার মুখটা আমার মনে পড়ে গেল, আর ওর কথাগুলো, কিন্তু—হ্যাঁ, আমি যদি একটা সাধারণ মানুষই হই—নিরাপদবাবুর মতন। আমরা তো ছেলেবেলার নিরাপদবাবুর কাছে পড়েছি, অনেকবার ওঁর বাড়িতে গেছি, তখন মাস্টারমশাই অন্যরকম ছিলেন, ওঁর গোঁফ ছিল, আর গোঁফের রঙ কালো ছিল, আর ওঁর বউ দেখতে খুব সুন্দরী ছিলেন। একটা ছোট বাড়ি, দু তিনটে ছোট ছোট ঘর, উঠোন জুড়ে গাদা কেষ্টকলির ঝাড়, তিনটে নারকেল গাছ—এখনো সেই বাড়িতেই আছেন—ওটা ওঁর বাবার বাড়ি। এখনকার নিরাপদবাবুকে দেখলে, সেই মাস্টারমশাইকে ভাবাই যায় না। ওঁর বউ খুব মিষ্টি মিষ্টি হাসতেন, সব সময়েই—অথচ মাস্টারমশাই কিন্তু বেশীর ভাগ সময় মুখটা ভার

করেই রাখতেন, যেন রাগ রাগ ভাব, যে কারণে আমরা ভাবতাম, উনি খুব রাগী, আমাদের মত উনি নিশ্চয়ই বউকে খুব বকেন। কিন্তু ছেলেবেলায় একদিন দেখেছিলাম, মাস্টারমশাইয়ের চোখ থেকে ওঁর বউ কাপড়ের আঁচল দিয়ে পিচুটি মুছিয়ে দিচ্ছেন— মাস্টারমশাইয়ের অসুখ করেছিল, তাই। শুধু তাই না, মাস্টারমশাইয়ের চোখ মুখ মুছিয়ে, একটা ন্যাকড়া দিয়ে সিকনি অবধি ঝাড়িয়ে দিয়েছিলেন ওঁর বউ, আবার বলেছিলেন, 'আর একটু জোরে ঝাড়ো। মাস্টারমশাই হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিলেন, 'পারছি না যে! ঠিক যেন ছেলেমানুষ, আর ওঁর বউ নাকটা ভাল করে পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন, যেন, যেমন মায়েরা দেয় না মুছিয়ে-মাছিয়ে, সেইরকম, অথচ মুখে হাসি হাসি ভাবটাও ছিল। ওঁদের তিনটে ছেলেমেয়ে তখন এদিকে ওদিকেই খেলে বেড়াচ্ছিল। সেই কালো গোঁফওয়ালা ভয়ংকর মাস্টারমশাইকে কীরকম আদুরে আর ছেলেমানুষের মত লাগছিল, আমি হাঁ করে দেখেছিলাম, যেন একটা অদ্ভুত ব্যাপার, তখন মাস্টারমশাইকে ভয় করছিল না। তারপর থেকে, কোন কারণে উনি রেগে গিয়ে বকলে, আমার এই ব্যাপারটা মনে পড়তো, মনে হত, রাগী লোকটা যেন আসল লোক না, সেই লোকটাই আসল। এখন যেমন মনে হয়, সেই ব্যাপারটার মধ্যে কেমন যেন একটা প্রেম প্রেম-ভালবাসাবাসি জড়িয়ে আছে, যেটা আমরা ভাবতেই পারি না—মানে, আমরা তো অন্যরকম ভাবি, আর বুঝি, আমাদের যেমন প্রেম করার রকম-সকম একেবারে অন্য রকম, তার জেল্লাই আলাদা, ছবির মতন। বয়স কাঁচা না হলে আবার ভালবাসা কী, যেন ওটা আমাদের হয়, যে জন্যে এক-এক সময় আমার মনে হয়, প্রেম করাটাও একটা ফুটানি করার মতই।... আচ্ছা, আমি যদি নিরাপদবাবুর মতই একটা সাধারণ মানুষ হই—শিখা হয়তো আমার পিচুটি সিকনি মুছিয়ে দেবে না—না না, তা অবিশ্যি জোর করে বলা যায় না, ওর মধ্যে আবার একটা কীরকম আছে, হয়তো দিতে পারে, মাস্টারমশাইয়ের বউয়ের মতই হয়তো আমাকে ভালবাসবে। লোকে হয়তো বলবে, শহরের একটা এঁটো মেয়েকে, নিজের দাদাদের এঁটো মেয়েটাকে—নাহ, কী বিচ্ছিরি একটা ভাব লাগে এসব ভাবলে, ইচ্ছা করে বাইকটা নিয়ে লাফ দিয়ে উঁচুতে উঠি, আর ঠাস করে রাস্তায় পড়ে, ছেতরে ছরকুটে মরি। কিন্তু আমি—আমিই বা কী একেবারে নৈবেদ্যের আস্ত কলাটি। লোকেরা কী না বলে, বলুক গে, আমি তো জানি, লোকেদের বলার থেকে শিখা অনেক বেশী, অনেক বড়—কারণ ও যদি আমাকে মাস্টারমশাইয়ের বউয়ের মতন ভালবাসে —যেখানে কোন লজ্জা নেই, ঘৃণা নেই, ভয় নেই, আর আমি চাকরি করি—আমাদের কয়েকটা ছেলেমেয়ে—আমি একটা সাধারণ মানুষ—কী রকম সেই অনশনের দিনের মত মনে হচ্ছে, খবরদার আমাকে কেউ ছুঁতেও পারবে না—কাজ করি, খাই, বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকি....। কিন্তু রমেশ আমার দিকে ওভাবে তাকাচ্ছিল কেন; ও কি আমার থেকে ভাল!

এখন আমার মনে পড়ছে, মেজদা একদিন আমাকে বলেছিল, গুণ্ডামি না করে খেটে খা, খেটে খা। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাতে তোর কী সুবিধা ' ও বলছিল, "যেদিন খেটে খাবি, সেদিন আমাদের দলের মর্ম বুঝবি। আমি বলেছিলাম, 'কেন, তোরা কি খেটে খাওয়া মানুষদের দল করিস নাকি। নিশ্চয়ই। 'ওসব, শালুককে গিয়ে গোপাল ঠাকুর চেনাস। তুই ঘরে বসে স্যাণ্ডউইচ প্যাঁদাবি, এদিকে ওদিকে মাল মেরে বেড়াবি, আর আমি খেটে শুকনো বাসী রুটি চিবুবো, আর তোকে নেতাগিরি করতে দেব, তা মোটেই ভাবিস না ' ও যেন বেশ মজা পেয়ে হাসছিল, বলেছিল, কী করবি? 'কেন, খেটে খাওয়া মানুষদেব কী ভাবিস তোরা, তোদের চ্যাঙ নাকি। যে, তোরা নেতাগিরি না করলে তাদের চলবে না। তাদের নেতা তারাই হবে।' ও বলেছিল, 'গাধা, বুলি তো শিখেছিস মেলাই, আমরাও তো তাই চাই। আমার একেবারে ফ্যাক করে থুথু ফেলতে ইচ্ছা করছিল, বলেছিলাম, 'চাস নাকি, মাইরি, ছত্যি! তোর এই কাঠামোয়? যা পানসি চালাচ্ছিস চালা, ওসব বলতে আসিস না। মনে করেছিস, এই করেই চালিয়ে যাবি, আর বাকীরা চোখে ঠুলি এঁটে থাকবে।' বলে অ্যায়সা শরীরে ঝাঁকুনি দিয়েছিলাম না, জাদুর চোখে একেবারে আগুন জ্বলে উঠেছিল। চিবিয়ে

চিবিয়ে বলেছিল, 'নোংরা , ইতর। আর তুই একেবারে ধোয়া তুলসী পাতা, ভারী সসভ্য। ওর যে আর কিছু বলার ছিল না, তা জানতাম, তাই গালাগালি দিয়েই সরে গিয়েছিল। সে কথা আমার এখন মনে পড়ছে—হ্যাঁ, সাধারণ মানুষ, মানে খেটে খাওয়া মানুষ আমি যদি হই, তখনো ওদের কারুর মোড়লি মানতে আমি রাজী না। খেটে খাওয়া গরীবদের সবাই রাজা করে দিচ্ছে। যাত্রার দলের সঙের মত, খালি তলোয়ার ঘোরাচ্ছে আর তড়পাচ্ছে—কিন্তু দেখ ময়দানে সে নেই। যেন খালি পার্ট বলে হাততালি নেবার তাল, মুখে বুলি মেরে যাচ্ছে, শুনলে মনে হবে, কালকেই গরীবদের সব দুঃখ ঘুচিয়ে দেবে। যেন চিরদিনই কিছু না করে হাততালি পেয়ে যাবে, আর খেটে খাওয়া গরীবেরাও চিরদিন ওদের কথায় আশায়-আশায় কাটিয়ে দেবে। গরীব লোকেরা সব বোকা, তোমাদের চেনে না, না? দিব্যি রসেবশে চালিয়ে যাচ্ছে, দূর থেকে ফতোয়া দিচ্ছে, গরীবেরা উদ্ধার হয়ে যাচ্ছে। যেন গরীবেরা জানে না, তাদের জন্যে পূর্ণেন্দু, রমেশের মত লোকেরা লড়ে দেবে না, নিজেদের জন্যে তারা নিজেরাই লড়বে। নিজের পেটের ক্ষুধা, অন্যের খাওয়া দিয়ে ভরে না। স্‌সাহ্‌ খচ্চর! কিন্তু শুটকা হারামজাদা গেল কোথায়, আশেপাশের একটা দোকানেও তো দেখতে পাচ্ছি না, ওদের ওই সভার মধ্যেই ছিল নাকি ....কিন্তু এ আবার কোথায় চলে এলাম, হঠাৎ এদিকে চলেছি কেন। আজ তো বাজারের দিকে বা বাজারের মহাজনদের কারুর সঙ্গে দেখা করার কথা ভাবিনি, তবু দেখছি, সেই রাস্তাতে চলে এসেছি। এ রাস্তায় আসতে আমার ঘেন্না করে, এমন জঘন্য রাস্তা-ভিড় আর ধারে ধারে রাস্তা জুড়ে যমপেষ দোকান, যেন গোটা রাস্তাটাই গিলে বসে আছে। বাজারের এই রাস্তাটা দেখলে মনে হয়, লোকেরা কেবল খেয়ে পরে বাঁচবার জন্যেই হন্যে হয়ে আছে, খালি কিনছে—জামাকাপড়, খাবার, যেন কোন অভাবই নেই, পয়সা টগবগাচ্ছে, আর ঘরে গিয়ে দেখ, হাঁড়িতে ইদুরের ডন। তা করুক গে, কিন্তু লোকজন চলাফেরা করবে তো, রাস্তাটা তো আর বাজার না যে, মেয়েরা মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে খিকখিক করে হাসবে আর ছিট কাপড় দেখবে, খাবার গিলবে, আর ছোঁড়ারা এপাশে ওপাশে ভিড় জমিয়ে হিড়িক দেবে। কোন কোন মহাজনের কাছে যাবার জন্যে, এ রাস্তায় আমাকে আসতে হয়—মালকড়ির জন্যেই আসতে হয়, কারণ শহরের যে-সব কাঁচাখেকো দেবতাদের ঠাণ্ডা রেখে, মহাজনদের স্বাধীন ব্যবসা চলে—চুরির স্বাধীনতা যাকে বলে, খুশি খুশি দর, নেবে তো নাও, নইলে কাটো, ওসব আইনকানুন দেখিও না, ওসব আমার ট্যাঁকে বাঁধা, এরকম রোয়াবে ব্যবসা চালাতে হলে যাদের পুজো দিতে হয়, আমি তাদেরই একজন। ওই সেই ভদ্দরলোকের চুক্তি যাকে বলে আর কি, এরকম চুক্তি না থাকলে কি ভদ্দরলোকদের চলে!

কিন্তু আমার তো আজ সেরকম কোন মহাজনের কাছে আসবার কথা ছিল না। তবু কেন যে এ রাস্তাটায় ঢুকে পড়লাম জানি না। নাহ, মাথার কোন ঠিক নেই, শিখার মুখটা খালি মনে পড়ছে, আর অন্য সব কথা—তা-ই ঠিক জানি নাকি কী সব কথা। এলোমেলো সব কথা, যেমন শিখার সেই কথাটা, আমার কী রকম ভয় হয় অথবা আমি তো একটা সাধারণ বাঙালী মেয়ে' মোটর বাইকের চিৎকারে অনেকে ফিরে তাকাচ্ছে, রাস্তা করে দিচ্ছে, কিন্তু যেন সেই রাস্তায় শুয়ে থাকা কুকুরের মত, গা নেই, তবু উঠতেই হয়, আর ভিতরে ভিতরে দাঁতে দাঁত পেষে, মনে মনে গালাগাল যা দেয়, চেহারা আর জামাকাপড় দেখলে তা বিশ্বাসই করা যায় না, এত খারাপ। তবে, সেই কী বলে, 'মার্জিত রুচিবান মানুষ তো সব, তাদের বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। তবে, আমার কাঁচকলাটা, এঞ্জিনের আওয়াজটা আমি আরো বাড়িয়ে দিই, যাতে ভয় পেয়ে সরে যায়। তবে, এর মধ্যেই কেউ কেউ ডাকাডাকি করছে, 'সুখেন, "সুখেনদা'–না, বসবার জন্যে না, জানান দেবার জন্যে, তারা আমাকে দেখেছে, বেশীর ভাগই দোকানদার, আমি হাত তুলে তাদের জবাব দিয়ে, এগিয়ে চলেছি—কিন্তু আচ্ছা, আমি কেন এরকম হলাম—মানে এইরকম একটা লোফার গুণ্ডা—সবাই ভয় পায় আর ঘেন্না করে —একমাত্র একজন ছাড়া। আমি বুঝতে পারি, আমাকে সবাই তা-ই করে, ভয় আর ঘেন্না, যেন তারা সবাই ভাল, ভাল ভাল কথা ভাবে, চিন্তা করে, ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না,

রাজ্যের যত খারাপ কাজ, সব আমি একলা করছি, আর ওরা সব দেশটার মঙ্গলস্‌সাধন করছে। তবু যদি গোপালঠাকুরগুলোকে না চিনতাম, কিন্তু সে যাক গে, আমি কেন এরকম হলাম, আমি কেন একটা সাধারণ বাঙালী ছেলে হলাম না, শিখা যেরকম…

ডানদিকের রাস্তায় বেঁকে গেলাম, তবু যা হোক একটু ফাঁকা—কিন্তু এ কী রে স্‌সাহ্‌, আমি কি মালের ঘোরে আছি নাকি, তা না হলে, ন কড়ি হালদার, 'দেশটা অধঃপাতে গেল, চারদিকে অসততা, ছেলেমেয়েরা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে' এইসব বলে বলে সব সময় এগলি ওগলির মোড় গরম করে রাখে, 'গভর্নমেণ্টের উচিত—' মাইরি, কেন যে লোকটা লাট বা মন্ত্রী হয়নি, কে জানে। সবাইকে সব শিখিয়ে দিতে পারে; সে-ই লোক কি না আমার দিকে চেয়ে চেয়ে গলে যাওয়া ভাবে হাসছে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে, আবার হাত তুলে থামতে ইশারা করছে! এ যে বাবা ইতিহা—স্‌! যে-লোক কোনদিন আমার সঙ্গে একটা কথা বলেনি, ছুচিবেয়ে বিধবাদের মত এড়িয়ে এড়িয়ে চলে, যেন আমি স্‌সাহ্‌ রাস্তার পেয়াজের খোসা, মাছের কাঁটা, ডিমের খোলা; যে-লোক সব সময় সততা আর কী যেন—হ্যাঁ, 'বিহিত করতে হবে বলে, সে কি না আমার দিকে চেয়ে হাসছে, উহ্রে বাবা, হাসিটিতে যেন আবার একটু স্তেহও গলে পড়ছে, হে হে হে, দাঁড়াতেই হয়। হালদারের কাছে গিয়ে, রাস্তার ধারে মোটরবাইক থামিয়ে, জিজ্ঞেস করলাম, কী বলছেন। ওহরে বাবা, আরো গলে পড়ছে যে হাসিতে। কী হতে পারে, কেউ পিছনে লেগেছে নাকি ন' কড়ি হালদারের, না কী রাত্রে বাড়িতে ঢিলটিল ছুড়ছে কেউ, ভয় দেখাবার জন্যে বা মেয়েদের জন্যে—বড় মেয়েও তো দু-একটা আছে, সে-ই একটাকে তো চিনি, প্রায় আমাদের সমবয়সী, বীণা না কী যেন নাম। শহরে খুব নামডাক অবিশ্যি সেই মেয়েটার, হিড়িঙ্কি মেয়ে যাদের বলে। রাস্তা-মজানো।

হেঁ হেঁ, কোথায় চললে, বাড়িতে নাকি?

নাদুসনুদুস চেহারায়, মোটা জামা গায়ে দিয়ে, ফরসা লোক ময়লা দাঁতে হেসে এভাবে কথা বললে কী বিচ্ছিরি যে লাগে। তার ওপরে সে লোক যদি গলির মোড়ের লেকচারবাজ হয়, আবার এভাবে হাসতেও পারে, তখন কেমন যেন চোরা চোরা খচ্চর বলে মনে হয়। বললাম, 'এই ফিরব এবার আস্তে আস্তে। কিছু বলছিলেন নাকি?'

আবার সেই গলে পড়া হাসি, আর তার মধ্যেই ফোলা ফোলা মাংসের মধ্যে ঢাকা চোখ দিয়ে চারপাশে একবার দেখে নিল। কী মতলব রে বাবা, লোকটা আমাকে দিয়ে কাউকে খুন করাতে চায় নাকি, সেই কথাই বলবে নাকি, যে-ভাবে ফাঁকা রাস্তায় আশেপাশে তাকাচ্ছে, যেন প্রাইভেট কথা কিছু বলবে। বলল, "কাল রাত্তির থেকেই তোমাকে খুঁজছি, একটু বিশেষ দরকার, বুঝলে না? সকালে তোমাদের বাড়িতেও গেছলাম, শুনলাম বেরিয়ে গেছ—বিশেষ দরকার, মানে—।'

আর মানে করতে হবে না, যথেষ্ট পেয়াজি হয়েছে, এবার বাত ছাড় তো বাবা, আসলে কী বলতে চাইছ। কিন্তু আবার সেই মানে দিয়েই বলতে থাকল, 'মানে, সব কাজ তো সবাইকে দিয়ে হয় না, হেঁ হেঁ হেঁ, দেশটা একেবারে রসাতলে চলে গেছে, সব জায়গায় দেখবে জোচ্চোরি, সে তোমার ক্যালিবার থাকুক না থাকুক, টাকা বের করলে, দিনকে রাত করতে পার...।'

মরেছে, স্‌সাহ্‌ ন' কড়ি হালদার যে আমাকেই বুঝাতে আরম্ভ করল সব—দেশ রসাতলে, টাকাই ক্যালিবার, কিন্তু ঝেড়ে কাশো না বাবা!—"তা কী আর বলব বাবা, কথাটা যখন কানে এসেছে—আমাকে কাল রাত্তিরে শশধর বোস বললে, সে বাজে কথা বলবার নয় জানো তো বাবা, খবরটাও সে নিয়ে এসেছে, সে-ই তোমার কথা বললে, বললে যে, সুখেনকে দিয়ে কাজটা হতে পারে। তাই তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি—মানে, ও সব হেঁজিপেজি মেনীমুখো ছেলে দিয়ে এসব কাজ হয় না। আমার ছেলেগুলো যেমন হয়েছে। আর আমার তো বুঝতেই পারছ, হেঁ হেঁ, শরীরে পোষাবে না, তবে বীণাটার জন্যে, আমার মেয়ের কথা বলছি....। ওহ রে স্‌সাহ্‌, মেয়ের কথা বলছে যে, তার আবার কী হল, কারুর সঙ্গে সটকে পড়েছে, তা-ই আমাকে খুঁজে দিতে হবে নাকি! মেয়ের নাম করে, থেমে আবার চারপাশে যে-ভাবে দেখে নিচ্ছে, আবার আমার মুখটাও দেখছে—মানে আমি কী ভাবছি, কেমুন কেমুন যান লাগে, বাগিয়ে বসে নেই তো, এখন খসাবার তাল, অথচ নিজে কোন ডাক্তারের কাছে প্রকাশ করতে পারছে না, তাই আমাকে দরকার, কারণ জানে, আমার হাতে ডাক্তার আছে—আছে মানে, আমি বললে ডাক্তার না বলতে পারবে না, টাকার বেলাতেও একটু কমসম হবে। সেই যেমন হয়েছিল, শিবু—শিবের বোন মঞ্জরীর বেলা, ওর প্রথমবার এ্যাবরসনের ব্যবস্থাও তো আমিই করে দিয়েছিলাম, যার জন্যে ডাক্তার ভেবেছিল, ওটা আমারই কর্ম, অথচ তখনো মঞ্জরীর গায়ে কোনদিন হাতই লাগাইনি, এখন যেমন গেলেই লাগাই। তারপরে অবিশ্যি আরো দু বার না তিন বার খালাস করতে হয়েছে, আর ডাক্তারও সেই একই—সেই ডাক্তার, অনশনের সময় যে আমাদের দেখাশোনা করেছিল। তবে মঞ্জরীটা একটা বলের মত, দেখলে কিছু বোঝা যায় না, কোন রকমেই না। মঞ্জরী ছাড়াও কয়েকজনের ব্যবস্থা করে দিয়েছি, যে জন্যে ডাক্তার আমাকে খুব পেয়ার করে, আর সেই কথাটা হয়তো ন' কড়ি হালদার শুনেছে, তাই এখন বীণার জন্যে—'বে-থা তো আজ অবধি দিতে পারলাম না, যা দিনকাল পড়েছে, এদিকে ছেলেদের মেলাই বক্তিমে শুনবে, সব মুখেন মারিতং জগৎ, পণ ছাড়া বে করতে বল, অমনি গুটি গুটি সরে পড়বে, তার ওপরে আবার মেয়ের রূপ চাই, গুণ চাই, নিদেন ইস্কুল ফাইনাল পাশ না হলে তো, সে মেয়ে জাতেই উঠল না। তা আমার তো আর পণ দিয়ে বে দেবার ক্ষমতা নেই, কোনরকমে একবার যদি ইস্কুল ফাইনালটা পাশ করাতে পারি, হেঁ হেঁ হেঁ ....' হেঁ হেঁ হেঁ, তো আমি কী করব! কী খিস্তি যে করতে ইচ্ছা করছে না, অথচ লোকটা কোনদিন ডেকে কথা বলে না, তাই কাঁচকলা দেখিয়ে কেটে পড়তেও পারছি না, তা ছাড়া মালটিকে একটু বোঝাও দরকার, কিন্তু আমি তো আর ইস্কুল ফাইনাল পাশ করিয়ে দিতে পারব না। লোকটা কী আমাকে পড়াতে বলবে নাকি, মরেছে স্‌সাহ্‌, বীণার মুখটা এখন আমার মনে পড়ে যাচ্ছে, ড্যাবরা ড্যাবরা চোখ, ছোট মত একটা নাক—হ্যাঁ, ওর নাকটা বোঁচা বোঁচা, অথচ ছোট ছোট মনে হয়, পাতলা পাতলা ঠোঁট আর লম্বা চিবুক, ঠিক বাঙলা পাঁচ-এর মত লাগে মুখটা, দেখলেই মনে হয়, ইস্কুল ফাইনাল তো অনেক দূরের কথা, ওর দ্বারা প্রেম করাও হবে না, কেমন যেন ভিখিরিদের মত লাগে ওকে, একটা কেমন দুঃখী দুঃখী ভাব, যেন ও একটা দুঃখিনী মেয়ে, দেখলে কষ্ট হয় .... আর অনেক বছর তো হয়ে গেল ঘষতে ঘষতে, বয়সকালের একটা ইয়ে আছে তো, এদিকে দেখতে তো ক্রমেই বুড়ি হয়ে যাচ্ছে, কোনদিন কী একটা করে-টরে বসবে, একেবারে মাথা কাটা যাবে, সেই জন্যেই বুঝলে তো বাবা, ছেলেমেয়েদের সব সময়ে একটা কিছুতে লাগিয়ে রাখতে হয়। আমিও তাই রেখেছি, কিন্তু, তুমি বাবা এ মওকাটা আমাকে ধরিয়ে দাও, মানে তুমিই পারবে! ন' কড়ি হালদারের গলা আরো চেপে এল, আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে

এল, বললো, ‘আমি খবর পেয়েছি, ইস্কুল ফাইনাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কলকাতায় লুকিয়ে বিক্রী হচ্ছে, একশো টাকায় সব পেপার, বুঝলে তো। আজকের মধ্যে না হলে আর পাওয়া যাবে না, ফুরিয়ে যাবে। এখন মুশকিল হয়েছে, ওসব লোকজন ঘাতঘোত আমি তো জানি না, শুনলাম, তোমার দাদা কেশব সব জানে—আর সে তো জানবেই, ওদের দলের ক্ষ্যামতা বেশী, ওপরের সব বড় বড় ব্যাপারে ওদের হাত আছে, মানে প্রশ্নপত্র বের করতে হলে, ওদের হাত না থাকলে হয় না, ওদের দয়াতেই তো সব…।‘

যত শুনছি, আমারই ভিরমি খাবার যোগাড়। মোড়ের লেকচারবাজ ন’ কড়ি হালদার, স্‌লা মহাস্‌সত্যবাদী, একটি অন্যায় বা খারাপ কথা বলেছ তো তোমার বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে, এমন গরম গরম বাত ছাড়বে, সে কিনা চোরাই প্রশ্নপত্র কিনে এনে দিতে বলে মেয়ের জন্যে। ধুকড়ির মধ্যে খাসা চাল, এই লোক কিনা ছুঁচিবেয়ে বিধবাদের মত, আমাকে পেঁয়াজের খোসার মত ডিঙিয়ে চলে। আমি বললাম, তা হলে কেশবকেই বলুন না, ও-ই তো এনে দিতে পারবে।

‘হেঁ হেঁ হেঁ, সেটা বাবা একটু ইয়ে লাগছে, মানে, আমি আবার বলতে যাব, এই আর কী। তোমার হাত দিয়েই যদি হয়ে যায়, মানে, আবার কলকাতায় যাওয়া-টাওয়া, তার চেয়ে তুমিই যদি খবরটবর নিয়ে একটু এনে দাও। তুমি ঠিক পারবে। তোমার ওপর ভরসা করা যায়, বুঝলে না। যেমন করে হোক, এই মওকাটা …।’

বুয়েছি বাওয়া, তুমি ডুবে ডুবে জল খাবে, শিবের বাবাও টের পাবে না, যে কারণে আমাকেই বেছে নিয়েছ। কেশব নেতা, ক্ষমতাবান, ভদ্রলোক, তার কাছে গিয়ে নাক কাটার চেয়ে গুণ্ডাটাকে কাজে লাগানোই ভাল। কোনদিন যদি কথাটা ফাঁসও হয়, তখন অস্বীকার করলেও চলবে, “আরে দূর, গুণ্ড বদমাইসের কথায় কেউ কান দেয় এই রকম বলবে, শহরে ন’কড়ি হালদার যে ভদ্রলোক সেই ভোদরলোকই থাকবে। হুম, ওদিকে মোটা জামাটার পকেটে টাকার করুকর শব্দও শোনা যাচ্ছে, টাকা বের করছে। বললো, সব টাকাটাই তোমাকে দিয়ে দিলাম, একশো টাকা, আজকের মধ্যেই এটা তোমাকে করে দিতে হবে।’

লোকটার কোন তাল জ্ঞান নেই দেখছি। আমি যে আমি, তাও ভাবছি টাকাটা নেব কিনা, আর লোকটা জীবনে আমার সঙ্গে কোনদিন কথা বলেনি। আজ একশোটা টাকাই হাতে তুলে দিচ্ছে, একে কী বলে, বুঝতে পাবি না। একেই বোধহয়, সেই কী বলে, লোভীর মরণ, না কী জানি, না কি প্রাণের দায়ে আর দিগবিদিক জ্ঞান নেই—তো দে স্‌সাহ্। আমি কী করব, আসছে যখন নিয়ে নিই, তারপরে দেখা যাবে, কাকে বলে প্রশ্নপত্র, কোথায় তা পাওয়া যাচ্ছে। দেখছি, পুরো একশো টাকার একটা নোট—মুখটা আমাকে একটু ইয়ে করতেই হয়, মানে খুবই সীরিয়াস ভাব, এত বড় একটা কাজ, বীণা ইস্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেবে, চোরাই প্রশ্নপত্র থেকে আগেই সব দেখে রাখবে, তারপরে কে ঠেকায় পাশ, একেবারে সস্বামীর ঘরে চলে যাবে। টাকাটা নিয়ে, পকেটে গুজতে গুজতেই মোটরবাইক স্টার্ট দিই আমি, একবার শব্দ করি, “আচ্ছা”, কিন্তু ন’কড়ি হালদার যে কী বললো, ইঞ্জিনের হাকাড়ে তা ডুবে গেল, আমি এগিয়ে চলে গেলাম। উস, কী রাস্তা পাড়ার মধ্যে, প্রায় নাচতে নাচতে চলেছি, কিন্তু আশ্চর্য, অন্ধকারের মধ্যে যেমন মেঘ করলে, অনেক দূরে—অনেক দূরের আকাশে চিরিক চিরিক করে বিদ্যুৎ চমকায়, আমার ভিতরে যেন সেই রকম হচ্ছে। তার মানে, ওই সেই কথাটাই, আমি আর যেন ঠিক থাকতে পারছি না, কোথায় একটা গোলমাল লেগে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমার চারপাশে কারা যেন ঘোরাফেরা করছে, ছায়া ছায়া মত, অথচ চোখে দেখতেই পাচ্ছি, কেউ নেই, তবু মদ খাওয়ার খোয়ারির মত একটা ব্যাপার যেন। শিখার মুখটাই আবার আমার মনে পড়লো, আর ওর কথাগুলো, কিন্তু কেন তুমি একটা সাধারণ ছেলে হলে না’, অথচ, তাই যদি আমি হতে পারি, তবু দাদাদের কারুর বিষয় কিছু বলতে পারব না। কেন, এটা আবার কী রকম ব্যাপার যে, গুণ্ডা না, বদমাইস না, একটা অর্ডিনারি লোক। কোন দলের লোকেরা কী কী শয়তানি করছে, তা বলতে পারবে না, যেন তারা সব গরু ভেড়া। কারুর মন্দ ব্যাপারে কিছু বলত পারবে না। তার মানে, একমাত্র দল থাকলে,

কোন দলের লোক হলে, অন্য দলের লোকদের গালাগালি দিতে পারে। যেমন পূর্ণেন্দু দেয়. কেশবকে বা এ ওকে, কিন্তু তুমি চুপ করে থাক। তোমার কোন কথা শুনতে চাই না। ব্যাপারটা কি এরকম নাকি, শিখা কি তা-ই বলছিল। ওর কথা থেকে, ঠিক তা তো মনে হয় না, বরং ওর কথা থেকে এই মনে হয়, ব্যাপারটা যেন খুব কঠিন। আর সত্যি, কঠিন তো বটেই, কারণ আমি তো ঠিক জানিই না, কী করে একটা সাধারণ মানুষ হওয়া যায়, কারণ, সাধারণ মানুষ মানে, সব ছেড়েছুড়ে টাটের ঠাকুর হয়ে বসে থাকা না। যেমন কি না, শিখার বাবাকে যদি কেউ সাধারণ মানুষ বলে—অসম্ভব, ওরকম একটি ফেরেববাজ রাম খচ্চর লোক তা হতেই পারে না, কিন্তু লোকটাকে তো সাধারণ বলেই মনে হয়। আসলে, আমি যাদের দেখছি, যাদের কথা ভাবছি, তারা কেউ শিখার সেই সাধারণ লোক না। যেমন নিরাপদবাবু, অনেকটা সাধারণ মানুষ বলেই মনে হয়। একটা লোক, সারা জীবন মাস্টারি করলেন, চুরি জোচ্চোরি বা ইস্কুলের পয়সা চুরি, কারুর পিছনে লাগা, মাস্টারি করতে করতে অন্য কোনরকম ব্যবসা করা, যা অনেকেই করে—বই বিক্রী করা থেকে সুদ খাটানো,কিছুই না, যেটা ভাবাই যায় না, এরকম একটা লোক থাকতে পারে। অন্ততঃ কিছু না হোক, অন্য মাস্টারদের হিংসে করা, ছাত্রদের বাপ মাকে বা ইস্কুল কমিটির কাছে কোন মাস্টারের নামে লাগানো, যে-সব আখচারই ঘটছে, সে সবও ওঁর সম্পর্কে কেউ শোনেনি। জামাকাপড় চিরদিন একরকমই দেখলাম, কোনদিন যে একটু সাজগোজ করেছেন, তাও দেখিনি, সিগারেটবিড়ি খান না, অন্য কোন নেশা তো অনেক দূরের কথা, এক বউ ছাড়া কোন মেয়েমানুষের কথা ওঁর ব্যাপারে ভাবাই যায় না, কেউ কোনদিন শোনেনি। এই সমস্ত ব্যাপারটাই তো আমার কাছে ইম্পসিবল বলে মনে হচ্ছে। অসম্ভব, একটা মানুষ কী করে এরকম হতে পারে, সারা জীবন কাটাতে পারে, আমি ভাবতেই পারি না। আমাকে ওরকম হতে হলে, আমি মরেই যাব। কী করে ওরকম হওয়া যায় জানি না। মাস্টারমশাই অনেকটা শিখার 'সাধারণ মানুষের মত। কেননা, রমেশ যখন মাস্টারদের টাকাটা মেরে দিল, তখনো উনি কিছুই বললেন না। হয়তো মনে মনে খুব রাগ করেছিলেন, কষ্ট পেয়েছিলেন, কারণ আমাকে যখন চুপি চুপি ব্যাপারটা বলেছিলেন, তখন ওঁকে কী রকম কাঁদো-কাঁদো লাগছিল। রাগের থেকেও অনেক সময় ওরকম হয়। কিন্তু শিখা যে বলেছিল, 'নিরাপদবাবুরাই বা কী রকম লোক, ওঁরা ছাড়লেন কেন, যে-কথা থেকে মনে হয়, সাধারণ মানুষেরা তা ছাড়ে না, একটা সাধারণ মেয়ে হিসাবে শিখা হলেও ছাড়তো না। তার মানে, সাধারণ মানুষ—কিন্তু, একি, কারখানার রাস্তায় কখন চলে এলাম আবার। আমি তো এখন এ রাস্তায় আসবার কথা ভাবিনি বা কারখানায় কারুর সঙ্গে দেখা করবার চিন্তাও করিনি—ওহ বাবা, কেশববাবুদের দল যে পোস্টার সাঁটছে দেখছি দেওয়ালে। গাড়িটা থামালাম, পোস্টারটা পড়লাম। আগামীকাল প্রকাশ্য অধিবেশন, দলে দলে যোগ দিন '.হুম, তার মানে আগামীকাল শহরটি গরম। ওদিকে হরতাল, এদিকে প্রকাশ্য অধিবেশন, একেবারে জমজমাট ব্যাপার। যে দুজন পোস্টার লাগাচ্ছিল, দুটোকেই চিনি, বড়বাবুর চেলা, আর একটা সেই কিষেণ, যেটাকে জুয়ার আড্ডায় একদিন পেঁদিয়েছিলাম। এসব কাজের জন্যে, কেশবের এরাই চেলা—কিন্তু বড়বাবুটি গেলেন কোথায়, এখনো চোরাই মাল সামলাতে ব্যস্ত নাকি। কাল রাত থেকে তো মাথার ঠিক নেই—কিন্তু শুটকাটা গেল কোথায়—ওকে তো আমি বলতে বারণ করেছিলাম, কারণ আমার কী কাঁচকলা যায় আসে, কারুর চোরাইমাল আছে না আছে। আমার পেছনে লাগতে এলে আমি বলব।

গাড়ির মেশিনটা চালু থাকায়, শব্দ পেয়ে কিষেণরা তাকালো, আর তাকাতেই ওদের দুজনের চোখ দুটো ঠিক রমেশদার মতই জ্বলে উঠলো, যেন আমাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। আবার দুজনে বিড়বিড় করে কী যেন বলাবলি করছে, স্‌সা, চোরের দালালি করছে, তার আবার কুলোপনা চক্করা ' হেই কিষেণ, কিসের পোস্টার লাগাচ্ছিস রে' ডেকে জিজ্ঞেস করলাম।

বেশ তেরিয়ান হয়ে, ঝেজে জবাব দিল, 'চোখ থাকে দেখে নাও।

আচ্ছা, খুব রোয়াব দেখছি, আবার চোখ পাকিয়ে দেখছে, স্‌লা—কিন্তু আমার ঘাড়ের কাছটা এরকম শিউরে উঠছে কেন, আবার, আর যেন শিরদাঁড়ার কোথায় একটা চিক চিক করে কেপে গেল। কেন, এরকম হচ্ছে কেন, শিখার মুখটা আমার মনে পড়ছে, আর ওর সেই কথাটা, 'আমার কী রকম ভয় হয়। একটা কীরকম অস্বস্তি হচ্ছে, তবু আমি মাটি থেকে পা তুলে নিতে নিতে বললাম, 'খুব বেড়েছিস মনে হচ্ছে ' বলে চলে যেতে শুনলাম, 'তুমিও বেড়েছ, তোমারও বেশী দিন নেই আর' আচ্ছা, হবে, জবাব পরে হবে, কিন্তু আমি দেখছি সেই কারখানাতেই এলাম, গেলাম একেবারে সোজা অফিসের কাছে।

মোটরবাইক রেখে চোপরার চেম্বারে গলাম, ঠাণ্ডা ঘর, বেশীক্ষণ থাকলে শীত করে। আমাকে তো আটকাবার কেউ নেই, দারোয়ান না, বেয়ারা না, চোপরার হুকুম, আমার অবাধ গতি। লোকটা বাঙলা বলে মন্দ না। এমনিতে দেখলে মনে হয়, বেশ ঝকঝকে চোখা মানুষ, কিন্তু ওর আমি ক্ষ্যাপা বাঘের চেহারাও দেখেছি, চাকরি রাখতে সব করতে পারে। এখনো সাহেবের লাঞ্চ টাইম হয়নি দেখছি। বাড়িতে তো যায় না, খানা চোপরা-বউদি এখানেই পাঠিয়ে দেয়—তবে একটাই যা রেয়াত, চেম্বারে বসে মাল খায় না, ওটা ছুটির পরে—সন্ধ্যাবেলায়। আমাকে দেখেই বলে উঠলো, 'হ্যালো সুখেন, এখোন কী মনে কোরে, বস বস।'

'এই—এদিক দিয়ে যেতে যেতে একবার এসে পড়লাম।

'হালচাল?'

'খারাপ, কাল তো হরতাল।'

'সে তো জানি।'

'চালাবেন নাকি!'

'ইচ্ছে তো আছে, তবে তোমরা কোন মদদ দেবে না তো কী কোরে হোবে। তোমার বড়দার দলের সঙ্গে মেজদাদারা লড়ছে, আমরা মার খাচ্ছি।'

খচ্চর। এ ছাড়া কিছু মনে আসে না আমার, তোমরা সব সাধু, তাই পড়ে পড়ে মার খাচ্ছ। চালিয়ে যাও, যদিন এই দুই দাদারা আছে; চিরদিন এই চার হাজার টাকা মাইনে, আরো অনেক আমদানি, মেলাই র্‌্যালা রপোট চলবে না। তবে আমার এসব কথা আজ ভাল লাগছে না, বললাম, 'আমাকে একটা চাকরি দেবেন?'

চোপরা হেসে উঠলো, 'ইউ আর আসকিং সামথিং নিউ, উম?'

বললাম, 'হ্যাঁ, ভাবছি একটা চাকরিবাকরি করব।'

'কেনো, তোমার টাকার কম হচ্ছে নাকি?'

'না, তার জন্যে না, আর এসব ভাল লাগে না।'

চোপরা বোম্বাই হিরোর মতন হেসে উঠলো, বললে, 'সচ? ক্যায়া বাত বোলা তুম নে। তোমার বাবা এতো বড়লোক, তোমার দাদারা এতো বড় লীডর—'

আমি বলে উঠলাম, 'তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি তো গুণ্ডা।'

চোপরা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করবার মত শব্দ করলো, 'উম?' তারপরে যেন অবাক হয়ে বললো, 'তুমি গুণ্ডা আছে? না না না, আজ তোমার মেজাজ খারাপ আছে, তা-ই ও বাত বলছে। তোমাকে লোকে কতো রেসপেক্ট কোরে, ভয় পায়।'

শুয়োরের বাচ্চা, এই কথাই আমার মনে হচ্ছে, তবু আমি বললাম, 'কিন্তু এসব আর আমার ভাল লাগছে না।'

'কেনো, আমাদের তোমাকে ভাল লাগে। আমরা তোমাকে মদদ দেব সব সময়।'

কথা বলছে না, যেন ঠোঁট বাঁকিয়ে ভেংচাচ্ছে, আর ঘাড় নাড়ছে।

আমি বললাম, 'সেইজনেই তো আপনাদের কাছেই একটা চাকরি চাইছি।'

চোপরা হাসতেই লাগলো, আর আমার দিকে বারে বারে তাকাতে লাগলো—যে তাকানোটা আমার একটুও ভাল লাগছে না, কারণ মনে হল, সেখানে হাসির হা-ও নেই, একটা অন্যরকমের চাউনি, যে চাউনি দেখে আমার আবার যেন ঘাড়ের কাছটা শিরশির করে

উঠলো, সেই রকম শিউরোনি ভাব। চোপড়া আবার বললো, ‘তোমার মেজাজটা কেনো খারাপ আছে?’

‘কিছু ভাল লাগছে না।’

‘আমাদের ক্লাবে যাও না একবার।‘

মাল খেতে যেতে বলছে। মন্দ হয় না একবার গেলে, ওর অ্যাকাউন্টেই প্রচুর গিলে আসা যায়, আর আমি গেলে, এই অসময়েও বেয়ারা ঠিক খুলে দেবে, কিন্তু আমার যেন কেমন, কিছুই ঠিক ভাল লাগছে না। বললাম, ‘এখন যাব না।’

‘রিয়ালি, ইউ আর আসকিং ফর এ সার্ভিস?’

‘সত্যি। ‘

‘হুম্।’

চোপরা হঠাৎ গম্ভীর হল, চোয়াল দুটো শক্ত করলো, যেন সত্যি ভাবলো কিছু, কিন্তু কিছুই বললো না, কেবল একটা ফাইল দেখতে লাগলো চুপচাপ। এরকম একটা ভাব—একেবারে নতুন লাগছে আমার কাছে, এরকম, আমাকে সামনে বসিয়ে রেখে, চুপচাপ ফাইল দেখে যাওয়া, স্‌সাহ্‌ যেন আমি ওকে চিনি না। আমি উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, ‘এখন চলি তা হলে।’

‘হুম, পরে কোথা হবে?’

স্‌লা, মুখই তুললো না। আমি চেম্বারের দরজাটা টেনে ধরে, আবার ওর দিকে ফিরলাম, আর তৎক্ষণাৎ, দেখলাম, চোখ দুটো কুঁচকে, খুঁচিয়ে আমাকেই দেখছে। চোখে চোখ পড়তেই বললো, ‘কী?’

আমি বললাম, ‘ওবেলা আসব আমি।’

‘ঠিক আছে ঠিক আছে।‘

যেন তাড়াবার জন্যে ব্যস্ত, অথচ আমি এলে, কত কথা জিজ্ঞেস করে, উঠতে চাইলে খালি বস বস করে, হঠাৎ যেন গিদধড়টার কী হয়ে গেল। চাকরি করতে চাই শুনে যেন লোকটা বিগড়ে গেল—তার মানে, আমার আবার চাকরিবাকরি, এ সব কী, আমি তো একটা গুণ্ডা, ওটাই আমার চাকরি। বাইরে বেরিয়ে আমি মোটরবাইক স্টার্ট দিয়ে কারখানার ভিতর থেকে রাস্তায় এসে পড়ি।

কিন্তু কী, ব্যাপার কী, সকলেরই যেন চোখ জ্বলছে। কেন, সব কি বাঘ হয়ে গেছে নাকি, আমাকে ছিঁড়ে খাবে? বিমলেটা তো ঠিক সে ভাবেই যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কারখানার খাবার ছুটি হয়েছে। তাই অনেকেই বাইরে। ছোটখাটো চায়ের দোকানগুলোকে ঠিক গুড়ের ওপর মাছির মত ছেঁকে ধরেছে। বিমলে—ভাল করে বললে বিমল—বিমল ব্যানার্জি, আসলে বিমলে-ই। ওর চেহারা চরিত্র ফিটার মিস্তিরির কাজ, সব মিলিয়ে, তা ছাড়া আর কিছু না। সেই জন্যেই তো পূর্ণেন্দুদের গরীবদের দলের, ও হল—কী যেন—উস্—কী যেন কথাটা—হ্যঁা, লড়াক্কু! আসলে বাড়ুজ্জেদের আকাট মুখখু ছেলে, ছেলেবেলা থেকেই কারখানার কাজে লেগে গিয়েছে। ওর কেরানী বাবা আর দোকানদার দাদা আবার অন্যরকম। তারা সব ভদ্দরলোক, আর বিমলে ছোটলোক। ও হল খাঁটি গরীবদলের লড়িয়ে, দলের মধ্যে ওর খুব খাতির, কেননা, ওদের তো গরীবদের দল, আর বিমলে তেলকালি মাখা হাফপ্যান্ট পরে, তেলকলি মাখা ছেঁড়া জামা গায়ে দেয়, কচর কচর পান চিবোয়, লাল ছোপ ধরা দাঁতে বিড়ি কামড়ে ধরে নাকের পাটা ফুলিয়ে, ও চিৎকার করে বক্তৃতা দেয়, বন্ধুগণ, আমরা সবাই এক। আমরা গরীবরাজ কায়েম করব, শেষ লড়াইয়ের জন্যে আমরা তৈয়ার। ওহরে বাস, কথা শুনলে মনে হয়, করলো বলে, কিন্তু আমি ভাবি, ওরা গরীবদের নিয়ে নিজেরাই যে সব বাত মারে, তার সঙ্গে বিমলের মিল কোথায়। রাত পোহলেই তো তুই নেয়েধুয়ে, পৈতাটাকে ঘস ঘস করে মেজে ঘষে, মন্তর-টন্তর জপে পুজোয় বসিস, প্রসাদ খাস, তোর বউ তোকে পান দেয়, চিবোতে চিবোতে বউকে বলিস, কারখানার ধোঁকড়াগুলোন দাও তো। যার মানে, ওটা হল কারখানার পোশাক, পরে ঠাকুর চললেন কারখানায়, গরীব লড়াকুটি, যে-কারণে ওর বাবা দাদা ওকে রেগুলার সম্মান দিয়ে কথা বলে, অর্থাৎ নেতা তো, পূর্ণেন্দু রমেশের তুলনায় তাদের ছেলে কম কিসে—একদিন হয়তো ভোটে দাঁড়াবে, চাই কী, মন্তীরও হতে পারে—লে হালুয়া! আমি তো জানি ওদের বাড়ির সবাইকে, বিমলেকেও ছেলেবেলা থেকেই চিনি, লড়াকুটির এখন বেজায় গ্যাস, কারখানায় এসে সারাদিন কাজের চেয়ে বেশী বকে, তারপরে বক্তিমে-টক্তিমে দিয়ে, আবার যখন বাড়ি ফিরলেন, তখন তিনি অন্য মানুষ—রোজগেরে ছেলে, নেতা, ইস্তিরি সোয়ামি—ই বাববা, এমনি এমনি নয়, করকরে হাজার টাকা পণ, হাতঘড়ি, সসোনার বোতাম নিয়ে লড়াকুটি বিবাহ করিয়াছেন। একঠো সাইকেল ভি মাঙিয়েছিলেন। মগর শ্বশুর মস্‌সাইয়ের ধকে কুলোয়নি। গরীব নেতাটি বাড়ি ফিরে গিয়ে, ধোয়া-মোছা করে, আদ্দির পাঞ্জাবী পরে, ঘাড়ে গর্দানে পাউডার মেখে বউকে নিয়ে চললেন সিনেমা দেখতে, পান চিবোতে চিবোতে তখন ও খাঁটি ভদ্দরলোক, কারখানা-টারখানার কথা এখন ছাড়'—রাজকায়েমের লড়াই এখন না—যার মানে, কী যেন বলে একে, সেই কী একটা সুন্দর কথা আছে না—আহ্, সেই যে—হাঁ হ্যঁা, যাকে বলে, দ্বৈত সত্তা। স্‌সাহ্ পানের পিচু। আমি ভাবি, আসল গরীবেরা কি সত্যি ধোকাখোর, তারা এসব বোঝে না। কী জানি বাবা, কিন্তু খচ্চরটা আমার দিকে ওরকম করে তাকিয়ে আছে কেন, যেন পাড়ার কুকুর বে-পাড়ার কুকুরকে দেখে কটমট করে তাকায়, আর গর্‌গর্ করে।

যাবার আগে আমি ইচ্ছা করেই, মোটরবাইক ঘুরিয়ে ওর পাশে একবার দাঁড়াই। এঞ্জিন বন্ধ না করেই, জিজ্ঞেস করি, 'কী রে ফটিচার। আমাকে দেখিসনি কোনদিন?'

লড়াক্কুটি সব সময়ে এত লড়াইয়ের কথা বলে, যে-জন্যে আমি ওকে ওই নাম দিয়েছি। ফটিচার—মানে গুল আর বোকাবাজ। ওর চোখ দুটো লাল হয়ে উঠলো। আর পান চিবিয়ে কালো ইয়ে যাওয়া মোটা ঠোঁট দুটো ঠিক ক্ষ্যাপা শুয়োরের মত করে খুলে বললো, 'দেখছি বৈ কি, তবে তোর দিন ঘনিয়ে এসেছে, ফটিচার কে, সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে।'

'তাই নাকি রে?'

'হ্যঁা, দালালি বেশীদিন চলবে না। গরীবরা তাদের লড়াইয়েই তোর মত দুষমনকে হালাল

করবে।'

ছত্যি, আ কুতু কুতু। ইচ্ছা হল, ওর গরীবের পোশাক হাফপ্যান্টটা নেড়ে দিয়ে, ছেলেমানুষের মত আদর করে দিই। কিন্তু তা করতে গেলে, ওদের দল এসে পড়বে। একলা পারব না-—হারামজাদা শুটকা, শিবে—ওরা যে কোথায় থাকে! বললাম, আর তুই তো সেই গরীব, না? ব্যাটা লেখাপড়া শিখলি না কেন, তা হলে পূর্ণেন্দু হতে পারতিস। বিমলের মুখটা সত্যি ভয়ংকর হয়ে উঠলো, আমি ওর দাঁতের কিড়মিড়ি পর্যন্ত শুনতে পেলাম, বললো, 'তোর মত লোচ্চা আর গুণ্ডার কাছ থেকে লেকচার শুনতে চাই না, তোকে আমরা—'

কথা শেষ করলো না, আর একবার দাঁত কড়মড় করলো, মানে, আমাকে চিবিয়ে খাবে। আমি হেসে শিস দিয়ে মোটরবাইক নিয়ে এগিয়ে চলে যাই, কিন্তু আমার ঘাড়ের পিছনটা কেমন শিরশির করছে, সেইরকম শিউরোনি শিউরোনি ভাব। শিখার কথাগুলো আবার আমার মনে পড়ছে, 'তুমি সবাইকেই শত্র করে ফেলছ"—তা হবে হয়তো, তা বলে, এইসব ফটিচারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমি চলতে পারব না; আমার চেয়ে ওরা কিসে ভাল! যাক গে, তার কোন দরকার নেই, শিখা যাকে একটা সাধারণ মানুষ বলে, একটা সাধারণ বাঙালী ছেলে—ও যেমন একটা সাধারণ বাঙালী মেয়ে, বিমলে কি তাই! কিন্তু, তা কী করে হবে, সাধারণ লোক তো আর বিমলের মত একটা খচ্চর না। তবে, আচ্ছা, এটাই বা কেমন কথা যে, সাধারণ লোকেরা এদের বা কেশবদাকে বিশ্বাসই বা করে কী করে। সাধারণ বলতে কি তাই বোঝায়! কিন্তু নিরাপদবাবু—কী বিচ্ছিরি ঘাড়ের কাছে শিউরোনি ভাবটা লেগেই থাকছে, ঠিক যেন, সেই ছেলেবেলায় শ্মশানের পাশ দিয়ে যাবার সময় হত, যেন ভয়ংকর ভয়ংকর ভূতগুলো হাওয়ায় চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অনেকটা যেন সেইরকমই মনে হচ্ছে আমার। শহরের প্রায় বাইরে, একটা রাস্তা দিয়ে আমি বাড়ির দিকে চললাম। এদিকে আমাদের একটা আড্ডা মারবার জায়গা আছে, আর এখানে এসেই দেখলাম, শিবে বসে আছে। এটা একটা চায়ের দোকান—তবে, অন্যান্য জিনিসও পাওয়া যায়। থামিয়ে শিবুকে জিজ্ঞেস করলাম, শুটকাকে দেখেছে কিনা : ও বলতে পারলো না। জিজ্ঞেস করলো, 'এক পাত্তর চা হবে গুরু?'

বললাম, 'হোক। তারপরে একটা বেঞ্চে চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম। হাতটা কপালের কাছে তুলে আনতে গিয়ে দেখলাম, দুটো বাজে। আর ঠিক এ সময়েই সেই—

সেই যে একটা গুরগুরনো ভয়, না, ঘাড়ের কাছে না, আমার ভিতরটা কীরকম করে ওঠে, সেই রকম করে উঠলো অনেকদিন পরে, যে ভয়টা ভিতর থেকে গুরগুরিয়ে উঠলেই, মনে হয় হাত পা অবশ হয়ে যাবে, আর আমি মূছ রুগীর মত পড়ে গিয়ে মাটি খামচে ধরে, মুখ ঘষটাতে থাকবো, ঠিক সেই রকম। ঠিক যেন মনে হল, চারিদিকটা খা খা করছে, আর কে যেন আমার ঘাড় মুচড়ে দিতে আসছে—অথচ আজ এখন তো আমি একলা ঘরে বসে নেই, কয়েকজন তো রয়েছে। আমি লাফ দিয়ে উঠে বসলাম, আর তখনই দেখলাম, আমার সামনে চায়ের গেলাস, সেটাকে হাতের এক ধাক্কায় ফেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, 'হটাও চা, আমাকে এক পাট মাল দাও দয়ালদা।'

দয়ালদা, যে এ দোকানের মালিক, তাড়াতাড়ি গদির নিচে থেকে একটা রাম-এর পাট বের করে দিল, এক মোচড়ে মুখটা খুলে, কাঁচাই খানিকটা ঢেলে দিলাম, এক ঢোক, দু ঢোক, তিন ঢোক, চার—পাঁচ–ছ ....। শিবে বলে উঠলো, 'এই গুরু, ওরকম খাসনি মাইরি, কলিজা ফেটে যাবে।'

আমিও ওর দিকে একবার তাকালাম, হয়তো কিছু বলতাম, কিন্তু আমার সেই ভাবটা যেন কেটে যাচ্ছিল, গা-টা গরম হয়ে উঠছিল, তবু আমি বোতলের মুখটা আমার মুখে লাগিয়ে বসে রইলাম, একটু একটু খেতে লাগলাম, শিবেটা হা করে তাকিয়ে রইলো, আর দয়ালদা—সত্যি দয়ালু মাইরি, রসের দয়াল, যখন চাইবে, তখনই পাবে, দয়ালদাও আমাব দিকেই চেয়েছিল, আর যে ছোকরাটা চা নিয়ে এসেছিল, সে তো একেবারে দেওয়াল সেটে দাঁড়িয়ে গেছে। আমি বোতলটা মুখ থেকে সরিয়ে, একবার দয়ালদার দিকে তাকালাম।

হাস্‌লাম একটু আর বোতালটা শিবের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। শিবে বোতলটা নিতে নিতে বললো, 'কী হল রে গুরু, ওরকম করলি কেন?'

'কী আবার, মাল খেতে ইচ্ছা করলো, তাই।'

'তাই বলে ওভাবে, তোর মুখটা আর চোখ দুটো দাখ দিকিনি, কী রকম হয়েছে?'

'কী রকম?'

'লাল, আর খুনীর মতন।'

'খুনীর মতন?'

কাকে খুন করব, তা তো বুঝতে পারছি না, আজ সকালে, সেই প্রজাপতিটাকে ধরবার সময়, শিখাও বলছিল, আমাকে নাকি খুনীর মত দেখাচ্ছে, আমাকে খালি খুনীব মতই দেখায়। শিবে বাকী মদটা খেতে খেতে বললো, 'বাড়ি যাবি না? অনেক বেলা হয়েছে।'

'তুই কোথায় যাবি।'

'বাড়ি।'

'চল।'

শিবের বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে বেশী দূরে না। ও মুখটা কুকুরের পাছার মত করে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। মোটরবাইকে আমার পিছনেই বসলো, এটাই ওর আসল দরকার ছিল, আমি মুখ ফিরিয়ে বললাম, 'দয়ালদা, দামটা কাল নিও।'

দয়ালদা ঘাড়টা দোলালো, জানে, ওর টাকা আমরা বিশেষ ফাঁকি দিই না, তা ছাড়া দয়ালু দাদাটির দাম একটু আলাদা। কিন্তু হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, ন'কড়ি হালদারের একশো টাকার নোটটা আমার পকেটে রয়েছে-—আশ্চর্য, ভুলেই গিয়েছিলাম। বীণার মুখটা আমার মনে পড়লো, 'কী করব বীণা, তোর বিয়ের পাসপোর্ট আমি এনে দিতে পারলাম না—পকেট থেকে নোটটা বের করে দয়ালদার দিকে ছুড়ে দিলাম, বললাম, পরে হিসাব হবে। তবু তো মালের জন্যে খরচ হচ্ছে, এ টাকাটা মাটিতে রেখে পেচ্ছাব করতে আরো ভাল লাগতো, কিন্তু তারপরে আবার হাতে করে তুলতে হবে তো। কিন্তু বীণা—মাইরি, সেই বাঙলা পাঁচের মত মুখটা—যাচ্ছেতাই। একটা ছেলেও ঘায়েল করতে পারছে না ও। কত মেয়ে তো কত কী করছে! গাড়িটা স্টার্ট দিতেই আমার আবার শিখার কথা মনে পড়লো, যা দিনকাল হয়েছে .... তার মানে কী, সকলের চোখ আমার দিকে বাঘের মতন জ্বলবে! শিবে বলে উঠলো, একটু আস্তে চালা গুরু, কাঁচা মাল টেনে চালাচ্ছিস।

'স্‌লা ভয় লাগে, নেমে যা।'

'না, তা তোর মত হাত আছে কারুর, তবে—!'

কথা শেষ করলো না ও—কিন্তু আমি ভাবছি, একটা সাধারণ মানুষ হওয়াটা কি খুব কঠিন? আমার তো যেন তাই মনে হচ্ছে, একটা ভীষণ কঠিন ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে, ঠিক যেন শিখার মুখটা সেই কষ্টের ভাব করে বলার মতন, কেন তুমি একটা সাধারণ ছেলে হলে না। কিছুই তো না, কাজ করা, খাওয়া, ছেলেমেয়ে নিয়ে আর বউ, মানে শিখার মত বউ নিয়ে, নিরাপদবাবুর মত—উহ্রে স্‌সাহ্। কী করে তা হব, ভাবতেই পারছি মা! কেননা, আমার মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা যা ভাবছি, ঠিক তা না।

'দাঁড়া।'

শিবেদের বাড়ি। মোটরবাইকটা দাঁড় করাতেই ও নেমে গেল, আমি এঞ্জিন বন্ধ করে দিলাম, তাই দেখে শিবে বললো, 'কী হল, বাড়ি যাবি না?"

'না, একটু ঘুমোব তোদের বাড়িতে।'

'ঘুমোবি? খাবি না?'

'না, খিদে নেই।'

আমিই আগে ওদের বাড়ি ঢুকি। এককালে ওদের অবস্থা বেশ ভালই ছিল, এখন হাফ-গেরস্থদের থেকেও খারাপ, ওর বোনই তো মঞ্জরী! প্রকাণ্ড এই পুরনো বাড়িটা ওদের নিজেদেরই, বোধ হয় দেড়শো দুশো লোক আছে—ভাড়াটে না, ওরা নিজেরাই, অবিশ্যি অত

লোক নাও হতে পারে, আমার মনে হয়। শিবে বোধহয় এখন আমাকে মনে মনে গাল দিচ্ছে —দিক গে স্‌লা, তোর খাবারে তো ভাগ বসাতে যাচ্ছি না, আমি চিৎকার করে বললাম, ‘মঞ্জরী, আমাকে এক গেলাস খাবার জল দিও তো ‘ বলে শিবের অন্ধ কুঠরিটাতে ঢুকে পড়লাম। স্‌সাহ্‌, ব্যাঙও থাকে না এরকম ঘরে, একটা তক্তপোষ পর্যন্ত নেই, খালি মাদুর আর কাঁথা মেঝেয় পাতা। গিয়েই চিত হয়ে পড়লাম, আর একটু পরেই মঞ্জরী এল একটা ফাটা কাচের গেলাসে জল নিয়ে। গেলাসটা ধরে, খাবার আগেই, মঞ্জরীর শাড়ির আঁচলটা ধরলাম—যে কাপড়টা থেকে কাপড়-কাচা সাবান আর তেলের বিচ্ছিরি গন্ধ বেরুচ্ছে, তারপর খেলাম। মঞ্জরী আঁচলটা টেনে বললো, ‘কী করছেন, দাদা আসবে।‘

‘আসুক গে, দাদা কি জানে না!’

মঞ্জরীর যেন হঠাৎ খেয়াল পড়ে, বলে, ‘এ কি, খেয়ে এসেছেন নাকি?

‘কী?’

‘কী আবার। যা খান, গন্ধ বেরুচ্ছে।‘

আমি মঞ্জরীর দিকে তাকালাম। সাবান আর তেল মেশানো চকচকে শাড়িটার মধ্যে শুধুমাত্র ব্রেসিয়ার। কোলের কাছে ওকে টেনে নিলাম—এরকম অনেকবারই নিয়েছি, শিবেও জানে, আর মঞ্জরী তো জানেই। আমি শিখাকে কখনো কিছুই দিইনি, কিন্তু ওকে প্রায়ই দিই, যা পারি জিনিসপত্র, কাপড়চোপড়, টাকা-পয়সা, যখন যা পারি, কিন্তু শিখাকে কোনদিন দিইনি। শিখা চায়নি আমিও দিইনি—ওকে কিছু দেবার কথা মনে হলেই আমার ঘাড়টা যেন কেমন বেঁকে যায়, ‘না, থাক’ এইরকম মনে হয়। মঞ্জরীকে দিই, ও চায়, ওকে আমি দিই, অনেকেই দেয়, শিখাকেও হয়তো অনেকে দেয,আমি দিই না। মঞ্জরীকে আমি দিই, ও আমাকে দেয়, অথচ শিখাকে আমি দিই না, শিখা আমাকে দেয়, সেইজন্যে আমি ওদের মেলাতে পারি না, আমি কখনো মঞ্জরীকে মারতে পারি না, থাপ্পড় বা ওইরকম কিছু, কিন্তু শিখাকে মেরেওছি। মঞ্জরীকে আমার শুধু ডলতে পিষতে কাতুকুতু দিতে ইচ্ছা করে, শুতে ইচ্ছা করে, এখনো তাই করতে লাগলাম : ওর গা-টা ঠাণ্ডা, ভেজা ভেজা, জলে ভেজানো বলের মতন। ও এখন চান করে এসেছে, তাই বললো, এইমাত্র চান করে উঠেছি। তা হোক, ওকে আমি আটকে রাখব না, এখুনি ছেড়ে দেব,–কিন্তু এই মেয়েটার এই এক বিচ্ছিরি, মুখে কী রকম উনুনের ছাই ছাই গন্ধ। তা হোক গে, ওকে কাঁথার ওপরে টানলাম। ও কী বুঝলো, বললো, ‘দাঁড়ান, দরজাটা দিয়ে আসি।‘

তাই এল, আমি ওকে টেনে নিয়ে বললাম, ‘তোমার ঠাণ্ডা গা-টা খুব ভাল লাগছে। আচ্ছা, তুমি একটা বে-থা করতে পার না, মানে সাধারণ মেয়েরা যা করে—!’

মঞ্জরী বললো, ‘দাঁড়ান, আমার চুলে টান লাগছে।‘

চুলটা ছাড়িয়ে নিতে আবার বললাম, ‘বে-থা করে ঘর-সংসার যদি কর।‘

ও বললো, ‘খুব খেয়েছেন নাকি? ‘

‘না। আচ্ছা, এখন সেটা তোমার পক্ষে খুব শক্ত, না?’

‘আমি একটু খেয়ে আসি, কেমন? আড়াইটা বেজে গেছে।‘

‘আচ্ছা, যাও।‘

আমার গা-টা যেন নরম হয়ে এলিয়ে পড়ে গেল, আর চোখটা বুজে কোথায় তলিয়ে যেতে লাগলাম, আর কী আশ্চর্য, দেখলাম, প্রজাপতিটা দেওয়াল ঘেষটে ঘেষটে পড়ছে, শিখা শব্দ করে উঠলো, ‘ইস্‌!’…

যখন চোখ মেলে চাইলাম, তখন একেবারে অন্ধকার। প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলাম না, উঠে বস্‌লাম, আর তখনই বুঝতে পারলাম শিবেটার শ্মশান চাটাইয়ে শুয়ে আছি। এখান থেকে অন্ধকারে, আর একটা দালান পার হতে হয়, তবে উঠোন, অন্ধকারে যেতে পারব তো! মঞ্জরীর নাম ধরে ডাকলাম, কেউ জবাব দিল না, তারপরে শিবের। তাও না। তখন শুনতে পেলাম, কে যেন শিবের নাম ধরে ডাকছে। গলা শুনেই চিনতে পারলাম শুটকা ডাকছে— আর ডাকতে ডাকতে ও একেবারে ঘরের কাছে এসে পড়লো, আর বলতে লাগলো, 'ধূ-র, ভূতের বাড়ি মাইরি, কেউ নেই!'

'আমি আছি।'

'কে, গুরু?'

'হ্যাঁ।'

'আরে, আমি তো তাই দেখলাম, তোমার মোটরবাইকটা রয়েছে দরজার কাছে, অথচ কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না।'

তখন শুটকার কথা আমার মনে পড়লো, ওকে আমি খুঁজেছিলাম, কেশবের লুকনো মালের কথা বলে দেবার জন্যে কিন্তু এখন ওর ওপরে আমার রাগ হচ্ছে না, কেন তা জানি না। মিথ্যা কথা তো বলেনি। শুটকা আবার বললো, সারাদিন কি এখানেই ছিলি?'

'না, দুপুর থেকে।'

শুটকা ফস করে একটা দেশলাইয়ের কাটি জ্বালালো, আর এগিয়ে গিয়ে, একটা কুলুঙ্গিতে মোমবাতি ধরালো। ও সব জানে এ ঘরের। বললো, একটা দিশি রেখে গেছলাম, দেখি আছে না সেঁটে দিয়েছে!'

ওর মধ্যেই কোথা থেকে একটা বোতল টেনে বের করলো। আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'খাবি?'

বোতলটা নিয়ে খানিকটা খেলাম। পেটটা কীরকম জ্বালা জ্বালা করে উঠলো, কিছু তো নেই পেটে। আরো খানিকটা খেয়ে, বোতলটা ওকে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় ছিলি রে সারাদিন, দেখতে পেলাম না।'

যেন খেতেই ব্যস্ত, এইভাবে খানিকক্ষণ কাটিয়ে বললো, 'বাড়িতেই।' মনে হল মিথ্যা কথা বলছে। কিন্তু আমার রাগ হল না। উঠে পড়ে বললাম, 'চলি। এদের বাড়িতে কেউ নেই নাকি? বোনেরা, ওদের মা?'

'কাউকে তো দেখতে পেলাম না। তুই এখন কোথায় যাবি গুরু?'

'বাড়ি।'

'চ', তোর সঙ্গে চলে যাই।'

শুটকার সঙ্গে বেরিয়ে এলাম, ও পিছনে উঠলো, ডায়নামোটা অন করে এগিয়ে চললাম। রাস্তায় বেশ ভিড়, কাল তো হরতাল, তাই সবাই বাজার-টাজার করে নিয়ে যাচ্ছে, সিনেমাও নিশ্চয় বন্ধ থাকবে, তাই সেখানেও ভিড়, কালকেরটা আজই মিটিয়ে নিতে হবে।

শুটকা বলে উঠলো, 'বাড়ি যাবি বললি যে?'

তা-ই নাকি, কিন্তু আমি তো শিখাদের বাড়ির দিকে যাচ্ছি, শিখাকে বলে এসেছিলাম, এবেলা যাব। হাত তুলে ঘড়ি দেখলাম, সোয়া আটটা। বললাম, 'শিখাদের বাড়ি যাব।'

'তবে আমাকে এখানেই নামিয়ে দে।'

ব্রেক কষে দাঁড়ালাম, আর তখনই দেখলাম, কেশব দাঁড়িয়ে আছে তিন-চারজনের সঙ্গে৷ একবার কোনরকমে চোখাচোখি হতেই, চোখ দুটো সরিয়ে নিল ও। আর আমার মনে পড়লো, 'ওকে বলে দিও, ও সাপের গায়ে পা দিচ্ছে '....রোয়াব! চোট্টা কোথাকার, বেশী বললে, আজই শহরের সব লোককে বলে দেব। ওর চোখ জ্বলছিল, আর তখন রমেশের চোখ দুটোও আমার মনে পড়ে গেল, গরীবদের নেতা। নিরাপদবাবুরা কিছু বলেন না কেন,

ভয় পান, না কি ভাবেন, রমেশদের কথা ফাঁস করে দিলে তাঁকে বিশ্বাস করবে না? আচ্ছা, আসলে কেশবের আলমারি থেকে সেদিন মালের বোতল ফাঁক করেছিলাম বলে ওরকম চটে নেই তো! না, তা হলে শিখা বলতো।

শিখাদের বাড়ির ভিতরে গাড়িটা রেখে, বাইরের ঘরে দেখি, শিখা একলা বসে আছে। তার আগেই, কোথা থেকে যেন ডাক্তারের হাসি-কাশি মেলানো শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। বোধ হয় বেলাদির আসরে। শিখা আমার দিকে চেয়েই চমকে উঠলো, বললো, 'এ কি, কোথেকে এলে?'

আমি বসে পড়ে বললাম, 'কী জানি স্‌লা, মনে পড়ছে না।'

শিখা আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল, আমার আপাদমস্তক দেখলো, যেন বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো, তারপরে জিজ্ঞেস করলো, 'বাড়ি যাওনি তখন থেকে?'

'না।'

শিখা বারে বারে আমার প্যান্টের দিকে তাকাতে, আমিও তাকালাম। বিচ্ছিরি, তাড়াতাড়ি বোতাম লাগালাম, খেয়ালই ছিল না। জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় ছিলে?'

'শুটকাদের বাড়ি।'

মিথ্যা কথা না বলে উপায় ছিল না, কারণ আমি জানি, শিবেদের বাড়ির কথা বললেই, মঞ্জরীর কথা ওর মনে হবে। অবিশ্যি জানি না, ও বিশ্বাস করলো কিনা, সেরকম ভাবেই তাকিয়ে রইলো, যেন বিশ্বাস করছে না, ও চোখ দুটো নামিয়ে রাখলো।

বললাম, 'বড্ড খিদে পেয়েছে।'

ও আবার অবাক হয়ে বললো, 'খাওনি সারাদিন?'

'না।'

সেই মুহূর্তেই নাক কোঁচকালো, ঠোঁট কুঁচকে বললো, 'কাড়িখানেক মদ গিলে এসেছ দেখছি।'

'কিছু ভাল লাগছিল না।'

শিখা আমার দিকে একবাব তাকিয়ে, ঘরের বাইরে চলে গেল, খানিকক্ষণ বাদে ফিরে এসে বললো 'রুটি আর কুমড়োর তরকারি খাবে?'

'খাব।'

'তবে একটু বস।'

বলে আমার হাতখানেক দূরের চেয়ারে বসলো। আমি শিখার দিকে চেয়ে কী যেন বলব বলব ভেবে বললাম, 'আমি শিবেদের বাড়িতে ছিলাম দুপুরে।'

বলে যেন নিজেই অবাক হয়ে গেলাম, আর শিখার ভুরু দুটো কেমন একরকম ওপর দিকে ঠেলে উঠলো, জিজ্ঞেস কবলো, 'কোনটা সত্যি?'

'এটা।'

'বলতে গেলে কেন?'

'কী রকম খারাপ লাগছে।'

শিখা চেয়ে রইলো। এখন ওর চুলে বিনুনি, কালো আর চকচকে, বাসন্তী রঙের জামা, সবুজ একটা এমনি সাধারণ শাড়ি। কিন্তু ওবেলার মতন শুধু জামা না, নিচেও কিছু আছে। আমি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালাম, একটু পায়চারি করে হঠাৎ বললাম, 'জান শিখা, ছেলেবেলা থেকে-না, আমার-না, আমার কীরকম একটা ভয় ভয় ভাব আছে, আমি কোনদিন কারুকেই বলিনি, কীরকম একলা একলা থাকলে—মানে একা একা কারুকেই বলিনি, কীরকম একলা একলা থাকলে—মানে একা একা লাগলে, বুক গুরগুরিয়ে ওঠা একটা ভয় হয়, তখন আমি চেঁচামেচি করি, যা-তা...।"

শিখা যেন কীরকম অবাক হয়ে গেছে, আর শক্ত হয়ে বসে আছে। সেই অবস্থাতেই জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কী হয়েছে?'

আমি কীরকম একটা চাপ ফীল করছিলাম বুকের কাছে, তাই বুকের কাছে হাত রেখে

শিখার সামনে এসে বললাম, 'জানি না, কিছু ভাল লাগছে না। আমি আজ চোপরার কাছে কাজ চাইতে গেছলাম, মানে চাকরি—শুয়োরের বাচ্চাটা কীরকম যেন প্রায় তাড়িয়েই দিল, মাইরি—আচ্ছা শিখা—!'

শিখা উঠে দাঁড়ালো, আর বুকের ওপর রাখা আমার হাতটার ওপরে ওর একটা হাত রাখলো, আবার জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে তোমার বল তো?'

আচ্ছা, কেন, শিখা আমার মুখের এত সামনে, মদের গন্ধ তো পাচ্ছে, বলছে না তো! যেন এখন ওর সেকথা মনেই নেই। আমি বললাম, 'আচ্ছা, আজ তুমি একলা কেন?'

'আজ তো সবাই ব্যস্ত, কাল হরতাল, কেশবদাদেরও কী একটা আছে, আমার খুব খারাপ লাগছে, কাল একটা কাণ্ড না ঘটায়। কিন্তু শোন—'

'আচ্ছা শিখা, আমি তো খুব খারাপ—তবু আজ আমার মনে হচ্ছিল, আমি যদি নিরাপদবাবু হয়ে যাই—তুমি হয়তো আমাকে—উহ্, শিখা, আমার ভীষণ বমি পাচ্ছে—'

কিন্তু শিখা আমাকে ছাড়লো না, হাতটা ধরে তাড়াতাড়ি বাইরে টেনে নিতে গেল, বললো, 'চল, কুয়াতলায় চল।'

যেতে গিয়েও পারলাম না, শিখার গায়ের ওপরেই বমি করে ফেললাম—ভাবলাম, শিখা ছিটকে সরে যাবে। কিন্তু ও আমাকে টেনে বসিয়ে দিয়ে বললো, এখানেই কর। ইস, কেন এসব ছাইপাশ খাও, কী দুর্গন্ধ।'

'ওয়াক-ও-ও-ওয়াক, শিখা, আমি তোমার গায়ে—ওয়াক...।'

তখন আমি বসে পড়েই বমি করছি মেঝেতে। আর শিখা আমার ঘাড়ের কাছে হাত রেখেছে, বললো, আমি কাপড়টা ছেড়ে আসি, উঠো না যেন।'

আমি মেঝেতে একটা হাত রেখে, শুধু মদ বমি করতে লাগলাম। মনে হল, কে যেন একবার এল, কার যেন একটা ছায়া পড়লো, আবার সরে গেল, তারপরেই শিখা এল, বেলাদিকে সঙ্গে নিয়ে। বেলাদির হাতে একটা জলের বালতি আর ঘটি। শিখা তখন একটা অন্য শাড়ি পরে এসেছে। জিজ্ঞেস কবলো, 'হয়েছে?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

ঘটি থেকে ও আমাকে জল ঢেলে দিল, আমি মুখ ধুয়ে নিলাম। তারপরে ও জল-হাত দিয়ে আমার মুখে মাথায়, জামার কয়েক জায়গায় বুলিয়ে দিল, বললো, 'যাও, বস গে ওখানে।'

বলেই, আমার কোমরের বাঁ দিতে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এটা কী?'

আমি জবাব দেবার আগে, ও নিজেই আবার বললো, 'আবার তুমি ছুরিটা নিয়ে বেরিয়েছ। বারণ করেছি না?'

এখন আর জবাব দিতে পারছি না, আসলে ওটা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে, সারাদিনই ওটা আমার কোমরে আছে, ওবেলা শিখা টের পায়নি। আমি উঠে গিয়ে চেয়ারে বসলাম।

পাখাটা খুলে দিল, আর দুজনেই জল দিয়ে বমি ধুয়ে পরিষ্কার করলো। বেলাদি তিনবার তিন বালতি জল নিয়ে এল, শিখা একটা ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করলো। বেলাদি একবার বললো, 'কেন যে খাও।'

বেলাদি যেন আমাকে বললো না, হয়তো ওর বাবার বন্ধু সেই ডাক্তারকেই বললো, তবু বেলাদির বলাটা যেন কষ্টের মত। তারপরে শিখা এসে আবার বসলো, বেলাদি চলে গেল। আমি চেয়ারের পিছনে মাথাটা এলিয়ে দিয়েছিলাম—এমন কিছু না, একটু দুর্বল লাগছিল। মাথাটা আস্তে আস্তে তুলে তাকালাম, দেখলাম, পাশে শিখা আর-একটা চেয়ারে বসে আছে, আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। কী যে বলতে যাচ্ছিলাম, কিছুই মনে করতে পাবছিলাম না। শিখা জিজ্ঞেস করলো, 'খাবে বলছিলে?'

'এখন আর খেতে পারব না। আমি বাড়ি যাই।'

'না, না, এখন না, একটু বস। এখন তুমি মোটর-সাইকেল চালাতে পারবে না।"

'পারব।'

‘একটু বস-না!’

‘আস্তে আস্তে যাব। শিখা—।‘

‘বল।‘

কিছু না বলে, হাত বাড়িয়ে আমি ওর একটা হাত ধরলাম, তারপরে উঠে দাঁড়ালাম। শিখাও উঠলো। আমি ওর হাত ধরে বাইরে গেলাম, সেখানে অন্ধকার—বিশেষ করে এ বাড়িটার চার পাশেই গাছপালার জন্যে অন্ধকার। বারান্দা থেকে নামবার সময়, তখনো ওর হাতটা ছাড়িনি, ও বললো, ‘কাল বাড়ি থেকে বেরিও না, বলা যায় না, কী গোলমাল হবে?’

‘বিকেলের দিকে টুক করে একবার তোমার কাছে চলে আসব।’

ও বললো, ‘সত্যি চালিয়ে যেতে পারবে?

‘পারব। এইমাত্র বমি করেছি—সত্যি, মদের গন্ধ, তবু একটা চুমু খেতে দেবে?’

নিশ্চয়ই দেবে না, কিন্তু ঠোঁটটা অন্ধকারে এগিয়ে নিয়ে এসে, নিজেই খেল, বরং আমাকেই দিল না। গাড়িটা ঠেলতে আমার কষ্ট হল, তবু ঝাঁপের বাইরে নিয়ে গেলাম, ডায়নামো অন করে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম, মনে হল, একবার যেন শিখার গলা শুনতে পেলাম, ‘সাবধান।‘

মনে হয়, মোটরবাইক-এব এঞ্জিনের সঙ্গে আমার রক্তের কী একটা মাখামাখি আছে, শব্দটা কানে গেলেই প্যাডেলে পা বাখলেই, মনে হয়, আমার শবীর-খারাপ বলে কিছু নেই, একেবারে ঈজি চলে যেতে পারি। তা হলেও, বুকের কাছটা কী রকম ঢকস ঢকস করছে, যেমন কোনো আলগা জিনিস ধাক্কা খেলে ঢকস ঢকস করে, সেই রকম। ওবেলা যে-রাস্তা দিয়ে ফিরেছিলাম, সে-ই রাস্তা ধরেই ফিরে চলি, এবার বাড়ি যেতেই হবে, আমার চান করতে ইচ্ছা কবছে। কিন্তু আবাব-আবার সেই শিউরোনি ভাবটা ঘাড়ের কাছে শিরশিরিয়ে উঠছে, স্‌সাহ্‌, কী যে হচ্ছে! প্রায় সেই জায়গাটায় চলে এলাম, শহরের রাস্তাটা যেখানে সব থেকে চওড়া, ওবেলা রমেশ যেখানে গরীবদেব উদ্ধার করছিল। এখানটায় শহরের দুটো বড় রেস্টরেন্ট, সিনেমাটাও কাছে, তাছাড়াও বড় বড় দোকান, তাই এখানে রাস্তার পারে দাড়িয়েই শহরের ছোড়ারা আড্ডা দেয়—এই আর কি মেয়েটেয়ে দেখা, টিকা-টিপ্পুনি কাটা, হিড়িক মারা যাকে বলে আর কী। রাস্তায় দাঁড়িয়ে, রেস্টুরেন্টের সামনে বেঞ্চি পেতে বসে, একটু রয়ালা না করলে চলবে কেন, আমিও করি। কিন্তু বিজে ছোড়াটা আমার দিকে ওর কম তাকিয়ে আছে কেন, খালি তাকিয়ে না, হাসছেও যেন, হাসছে অথচ চোখ নামিয়ে নিচ্ছে না, বাপার কী। ওদের একটা নেড়ি মাস্তানের দল আছে, আসলে কেশবেরই ফাইফবমায়েস খাটে। এই—এই সেই জিনিস, আবার আমার ভয়ের গুর গুরোনিটা চেপে এল—না, ঘাড়ের শিউরোনি না, সেই ভয়, শিরদাঁড়ার কাছটা কী রকম করে ওঠা, যেটা হলেই, হাত-পা অবশ হয়ে আসতে চায়, কে যেন আমার ঘাড় মুচড়ে ধরতে আসে, মূর্ছা রুগীর মত মুখ গুজরে পড়ে যাবে হয়তো ...

মনে হতেই, রাস্তার ধারে, একেবারে পাঁচিলের পাশে, মোটরবাইকটা কোনরকমে থামিয়ে, ঠেকিয়ে রেখেই প্রায় পাগলের মত চিৎকার করে উঠলাম, আর বিজে—বিজয়টাকে ক্যাত করে একটা লাথি কষলাম, 'শুয়োরের বাচ্চা, বড় যে হাসি দেখছি।' বলতে বলতেই, ঘুষিও চালালাম, নাকে মুখে পেটে, আর সঙ্গে সঙ্গে এদের দলের দু-তিনটে নেড়িও ছুটে এল, 'খবরদার সুখেন' বলে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে আমি তখন কী যে করছি, নিজেই জানি না, ভয়ের ভাবটা কাটাবার জনো পাগলের মত হাত চালিয়েছি। আমার সেই চেহারাটা দেখে, বিজেদের নেড়ি দলটা প্রায় হকচকিয়ে যাবার মত, তবু পাল্টা দু-একটা ঘুষি আমার গায়ে লাগতেই, ভয়ের ভাবটা যেন কেটে যেতে লাগলো, ভীষণ চিৎকার করে আমি আরো জোরে হাত চালালাম। এ সময়ে আমার দলেরও কেউ নেই, হঠাৎ মনে পড়ে গেল কোমরে ছুরি আছে। মনে হতেই, সেটা টেনে বের করলাম, একটা নেড়িকে তার আগেই পাঁজরায় লাথি মেরেছি, বাকীরা দৌড়ুতে আরম্ভ করেছে। শুধু নেড়িগুলোই না, রাস্তার লোকেরাও দৌড়ুতে আরম্ভ করেছে। কে যেন 'খুন খুন' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন, আর কয়েকটা দোকানের ঝাঁপ ঝপ ঝপ বন্ধ হয়ে যেতে লাগলো। আমি তখন ভয়ের ভাবটা একেবারে কাটিয়ে উঠেছি, আর ঠিক এ সময়েই আমার চোখে পড়লো রমেশ একলা দূর দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে, ঠিক একটা ল্যাজ গুটানো কুকুরের মত। আসলে একলা বলেই ভয় পেয়েছে, ভেবেছে, গুণ্ডাটা চোখে পড়ে গেলে যদি ভুকিয়ে দেয়। 'কেন, এখন আয়!' মনে হল রাস্তাটা প্রায় ফাঁকা, আর ট্রাফিকের জন্যে যে-সেপাইটা দাঁড়িয়েছিল, সে ছুটে এল আমার কাছে, বললো, এই সুখেনদা, কী করছেন, ছুরিটা রাখুন। হ্যাঁ, এখন আর আমার কোন ভয় নেই। ছুরিটা বন্ধ করে, আস্তে আস্তে কোমরে গুজে রাখি, সেপাইটা তখনো বলতে থাকে, 'ওরা কখন চলে গেছে। যান চলে যান, থানায় খবর গেলে আবার ও. সি. আসবে, একটা হাঙ্গামা হুজুক...।' ও বলেই যাচ্ছে, আর আমি মোটরবাইকটা সোজা করে, চেপে স্টার্ট দিই। এখন ভরসা পেয়ে, অনেকেই আড়াল-আবড়াল থেকে বেরিয়ে আসে, ভয়ে ভয়ে আমার দিকে তাকায়, সসুখেন গুণ্ডাকে দেখছে সবাই। আমি বলতে থাকি, কিন্তু কি জানি, আমার যে কী রকম একটা হচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। বিজে আমার চোখের দিকে

তাকিয়ে হাসবে, ঠোঁট বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে, সেটা টলারেট করতে পারি না, কিন্তু আসলে তো আমার সেই ভয়ের কাঁপুনিটা লেগেছিল বলেই ওরকম করছিলাম। এখন মনে হচ্ছে, আমি দুর্বল, হাঙ্গার-স্ট্রাইকের পরে যেরকম হয়েছিল, সেই রকম, অথচ তার সঙ্গে আরও একটা যেন কী হচ্ছে—কী একটা—কে জানে স্‌সাহ্‌, কেঁদেই ফেলব কি না। লাও, দেখ আবার কোথায় চলে এলাম। আবার সেই দয়ালদার দোকানেই। আসলে, সেই টাকাটার কথা ভুলতে পারিনি বলেই বোধহয় এসেছি, কিন্তু মদের কথাই তো বেশী মনে হচ্ছে। তা হলে বোধহয়, মদ খেতেই এসেছি।

এখানে, এ রাস্তার নিরিবিলি ভাবটা আমার এখন বেশ ভাল লাগছে, একটা লোকও দেখছি না, কেবল দয়ালদা টিমটিমে লণ্ঠন জ্বালিয়ে বসে রয়েছে, তার কাছেই বেঞ্চির ওপর একটা মেয়েমানুষ, শুনেছি দযালদা নাকি এ মেয়েমানুষটার সঙ্গেই সারা জীবন রয়েছে। বউ তো না, এ শহরেরই বেশ্যা ছিল, তারপরে দয়ালদার সঙ্গেই সারা জীবন—ছেলেপিলে কিছু নেই। রোজই সন্ধ্যেবেলা আসে, আর রাত্রে ঝাঁপ বন্ধ করে দুজনে একসঙ্গে ঘরে ফিরে যায় —কী জানি এদের স্বামী-স্ত্রী বলে কি না। মোটরবাইকটা দাঁড় করিয়ে বললাম, একটা পাট দাও তো দয়ালদা। বললাম, কিন্তু দোকানের পিছনে, ঢালু বেয়ে, নদীর দিকে নেমে গেলাম। নদীর ধারেই এ রাস্তাটা। দোকানের পিছনে একটা ভাঙা ঘাট আছে, সেখানে কাউকে দেখতে পেলাম না, ভাঙা ধাপের ওপর দিয়ে সাবধানে নামতে লাগলাম, আর প্রায় জলের কাছে গিয়ে, হঠাৎ একটা মানুষ দেখে, থমকে দাঁড়ালাম। থমকে দাঁড়াতে গিয়েই, একটা শব্দ হল, বসে-থাকা লোকটা আমার দিকে ফিরে তাকালো, আর তখুনি আমার বা পা একটা গর্তে পড়ে যেতে, আমি হুমড়ি খেয়ে প্রায় লোকটার ঘাড়ের ওপর পড়লাম। লোকটা আমাকে পড়তে না দিয়ে ধরে ফেললো। আর একটু হলেই আমি জলে পড়ে যেতাম। এটাই সব চেয়ে নিচের ধাপ, আর না ধরলে, জুতোসুদ্ধ আমার পা মচকে যেত। লোকটা আমাকে বললো, “বস একটু! মেলাই খেয়ে এসেছ মনে হচ্ছে।'

কে রে লোকটা, গলার স্বরটা অদ্ভুত, যাকে বলে ভরাট আর মোটা। তা ছাড়া, আরো একটা কী ভাব আছে যেন, যে-ভাবটা শুলাদার কথায় প্রায়ই ফুটে ওঠে। যেন—এই আর কী, একটা ভালবাসা-ভালবাসা ধরনের। মদের গন্ধটা ঠিক টের পেয়েছে, ভেবেছে আমি মাতাল বলেই পড়ে গেছি, কিন্তু পেটে তো মদের আর ম-ও নেই, সবই তো বমি হয়ে গেছে। রাস্তার ওপরে বুড়োদের চোখের মত যে টিমটিমে আলো ছিল, তাতেই আমি লোকটার মুখ দেখতে পেলাম, মনে হল, মুখটা ধুলোমাখা, পাতলা বড় বড় চুলগুলো উসকোখুসকো, খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর মস্ত বড় গোঁফ চিনতে পারলাম, বচন, কারখানায় কাজ করে, পূর্ণেন্দুদের দলের লোক। আমি বস্‌লাম না, দাঁড়িয়েই রইলাম খানিকক্ষণ, তারপরে জলের দিকে পা বাড়াতেই, বচন—বচন কাওরা, লোকে তা-ই বলে ওকে, আমার হাতটা চেপে ধরলো। বললো, ‘একটু বসই না স্থির হয়ে, এখুনি পেছল সিঁড়িতে পা দেবার কী দরকার, আবার পড়ে যাবে হয়তো।'

কথা শুনলে, এ লোকটাকে ঠিক দলবাজদের মত মনে হয় না, তার ওপরে আবার আমার সঙ্গে, যাকে ওরা শত্রু মনে করে। আর সত্যি বলতে কি, না কি, এও আমার সেই ভুতুড়ে বিদঘুটে ব্যপারের মতই একটা কিছু। লোকটা যে আমার হাত ধরেছে, তার মধ্যে কেমন যেন একটা—কী বলব—একটা মন-টানা মন-টানা ভাব, ওই আর কি, ভালবাসাবাসি মত। ও যদি মেয়ে হত, আর বয়স কম হত, তা হলে এই হাত ধরাটা শিখার হাত ধরার মতই মনে হত বোধহয়। অথচ ও হচ্ছে পূর্ণেন্দুদের গরীব দলের লোক, আমাকে কেন ঘেন্না করছে না কে জানে! হয়তো ঘেন্নাই করছে ‘তুমি তো আবার গরীব দলের নেতা?’

‘নেতা?’

লোকটার কয়েকটা দাঁত নেই, শব্দ না করে হাসতে বোঝা গেল। যেন এমন মজার কথা সে কোনদিন শোনেনি। হাসিটাও এমন, লোকটাকে কেমন চালাক চালাক বিটলে বলে মনে হচ্ছে। বললাম, ‘তোমরা তো মাতালদের ঘেন্না কর।'

‘ঘেন্না করব? কেন, আমিও তো মাল খাই, মাতাল হই।'

ওহ্ স্‌সাহ্‌, তাও তো বটে, অনেকদিন তো নিজের চোখেই বচনকে মাল খেতে দেখেছি। বললাম, ‘তবে, গুণ্ডাকে তো ঘেন্না কর।‘

‘তা করি, সে তো তোমার গুণ্ডাদের সবাই ঘেন্না করে।‘

‘তবে আর কি, এবার আমাকে ছেড়ে দাও, আমিও তো গুণ্ডা।‘

লোকটা এ কথার কোন জবাব দিল না। বলল, ‘একটু বস না।‘

খচরামি করছে নাকি আমার সঙ্গে। বললাম, ‘আমি মাতাল না, মাল সব বমি করে ফেলেছি।‘

‘সেটা তো আরো খারাপ। খেলে, আবার পেটেও রাখতে পারলে না। তা হলে তো নদীর ধারে একটু বসাই ভাল, ভাল লাগবে।‘

এ-সব, কথাবার্তা নেই, হুটাপুট পীরিত আমার ভাল লাগে না। ‘নাহ, ছাড়। ‘

হাত টানলাম, আশ্চর্য, লোকটা হাত ছাড়লো না, তেমনি করে হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, আর মনে মনে সন্দেহ হলেও, আমি যেন রাগ করতে পারছি না। আচ্ছা, লোকটা বোধহয় বোকা, নিশ্চয়ই বোকা, ভাবভঙ্গিটা বোকার মতই। একথা মনে হতেই আমি বলে উঠলাম, ‘আচ্ছা, পূর্ণেন্দু, রমেশ, বিমলে, এরা তোমাদের দলের লিডার কেন?‘

লোকটা খানিকক্ষণ একেবারে চুপচাপ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপরে সেইরকম বিটলে ভাবে হেসে বললো, ‘ওরা লিডার হয়েছে, তা-ই।’

‘ওরা আবার লিডার কিসের? ওরা তো সব জোচ্চোর-ফেরেববাজ।‘

‘তবু, গরীবদের জন্যে বলে তো।‘

‘ও, বললেই নেতা?’

বচন কোন জবাব দিল না, চুপ করে, আগের মতই খানিকক্ষণ চেয়ে রইল, তারপর বললো, ‘তোমার আবার এসব কথা কেন। তুমি অত বড়লোকের ভদ্দরলোকের ছেলে হয়ে, দাদাদের মত হলে না কেন?’

‘কী জানি, আমি তা জানি না, ওদের সঙ্গে আমার মিল নেই। তুমি তো চাঁদ আমার কথার জবাব দিলে না। তার মানে ধোকা খেয়ে খেয়ে মগজে কিছু নেই।‘ বচন কয়েকটা দাঁত দেখিয়ে হেসে বললো, তা হবে। আমার তো দেখ, তিন পুরুষ কারখানায় কাজ করছি, তার আগে,ঠাকুদার বাপেরা শুয়োর চরাত—আই, কী আর বলব বল, অনেক তো দেখলাম, দিন এক রকম যায় না। গায়ে ঘা থাকলে একদিন সে ধরা পড়েই।‘

আমার বলতে ইচ্ছা করলো, ‘ইয়ে পড়ে’, কিন্তু লোকটার গলার স্বরটা আর কথাগুলো এমন যে, সেরকম কিহচু বলতে পারছি না, অথচ রাগ হচ্ছে এই ভেবে যে, এ যেন বচন ক্যাওড়া না। একজন, কী বলে—‘জ্ঞানী সাধু-সন্ত। ধূ-র স্‌সাহ্‌, হাতটা ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে, সাবধানে পেছল ধাপে নেমে চোখে মুখে জল দিই। দিয়ে, একবার অন্ধকার নদীটার দিকে তাকাই, একটাও নৌকা নেই, একেবারে ফাঁকা, কোন শব্দ পর্যন্ত নেই, যেমন অন্য সময় ছলছল কলকল করে। আমার যেন মনে হয়, জলের তলায় কারা সব চুপিচুপি চলাফেরা করছে, কথাবাত বলছে। এইসময়ে যদি শিখা এখানে আসতো—আচ্ছা, মা কি এখানে কাছাকাছি বা জলের তলায়-টলায় কোথাও আছে। বাবার কথা আমার মনে পড়ে গেল—ঠিক বাবা যেন এইরকম অন্ধকার নদীর তলার লোক। আমি এবার বাড়ি যাব। ফিরে, উঠতে যাব, দেখলাম, বচন ক্যাওরা আমার দিকে ঠিক তেমনি চেয়ে আছে। আমি বললাম, ‘তোমরা সব বোকা।‘

বলে, উঠতে লাগলাম, আর বচনের যেন হাসি হাসি ভাবের কথা শুনতে পেলাম, ‘তুমি আমাদের চেয়ে বেশী।‘

সে কথার আর জবাব দিতে ইচ্ছা করলো না, লোকটা শুলাদার মত মনে হচ্ছে, ওর কাছে বেশীক্ষণ থাকা বা চোখে চোখ রাখতে ভাল লাগে না। ওপরে উঠেই মোটরবাইক-এ চেপে স্টার্ট দিলাম, দয়ালদা চেঁচিয়ে বললো, ‘পাঁট বের করতে বললে যে?’

‘না, খাব না।‘

চলতে চলতে, প্রথমেই আমার মনে হল, না, ও স্‌লা চোপরার কারখানাতে আমি চাকরি করব না। আচ্ছা, আমি যা লেখাপড়া শিখেছি, তাতে যদি একটা গাঁয়ে গিয়ে প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টারি করি, কোঁচা দিয়ে কাপড় পরে, মাস্টারমশাইয়ের মত একটা জামা গায়ে দিয়ে—স্‌সাহ্‌, মারাত্মক হাসি পাচ্ছে মাইরি। নিজেকে ওরকম ভেবে, দারুণ হাসি পাচ্ছে, ঠিক যেমন বাঁদরনাচওয়ালাটা বাঁদরকে পায়জামা পাঞ্জাবী পরিয়ে ঘুরিয়ে বেড়ায়, সেটা যেমন অদ্ভুত—সেই রকম। কিন্তু আমাদের বাড়ির রাস্তার মোড়ে, লোক তিনটে কে যে, বাইক-এর শব্দ শুনেও সরছে না। শেষটায় আমাকে দাঁড়াতেই হল। উহ্‌, শরীরটা ঢিলঢিল করছে, জিজ্ঞেস করলাম, 'কে রে?'

তিন জনেই ফিরে দাঁড়ালো। ওহ বাব্বা, বড়বাবু যে, দুজন পেটেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, মানে আমার বড়দা কেশববাবু। আমি থামতেই দুজন সরে গেল, কেশব আমার দিকে এগিয়ে এল। মতলব কী! উহ্‌রে বাব্বা, আমার মায়ের মত সুন্দর মুখ হয়েও, কেশবকে এখন ছুঁচোর মত দেখাচ্ছে। বললো, 'একটা সত্যি কথা বলবি?'

'কী?'

'চাল আর ফুডের কথা কার কাছ থেকে জেনেছিস তুই?'

ও, বাছাধনের ভাবনা ধরেছে, এমন সিক্রেট খবরটা আমি পেলাম কোথা থেকে। তাও আবার জানতে চাইছে আমার কাছ থেকে, অততো সহজ না চাঁদ। বললাম, 'যার কাছ থেকেই শুনি, তোকে বলব কেন?'

'আমাদের কেউ কী?'

সেটাই আমার—কী বলে, জ্যেষ্ঠ স্‌সহোদরের ভাবনা হয়েছে, সর্ষের মধ্যেই ভূত আছে নাকি। বললাম, 'বলব না, যেতে দে।'

উ-উ-উ-স্‌লা, মুখখানি দেখ একবার, বিম্‌লের থেকেও যেন বেশী দাঁত কড়মড় করছে। বললে, 'দ্যাখ টুকু, একটা কথা বলে দিই, ভাগ চাস তো দিতে পারি—একদিন তোকে আমার কাছে আসতেই হবে, তোর আর কোন ফিউচার নেই, কিন্তু যদি এভাবে—।'

আ রে লে লে, আমি গিয়ারটা হ্যাঁচকা ছেড়ে এগিয়ে চলে যাই, আর যেতে যেতেই বলি, 'বেশী পেঁয়াজি করিস না।' কিন্তু আমার ভিতরটা যেন কী রকম হয়ে গেছে, শুকিয়ে সব কাঠ। তবু কেমন যেন জ্বলছে শরীরটা-—মনটাও, খচ্চর আমাকে ভয় দেখাতে এসেছে। না, আমি একটা কথা জানতে চাই, রাজনীতির দল না-হয় একটা মন্দিরের মত—যেমন কেষ্ট বা বিষ্টু বা কালী, দুর্গা, যা হোক, আর লোকেরা তো তাদেরই চায়—মানে দেবতাকে—মানে আসল পাওয়া যেটা, কিন্তু পূজারীগুলো যেমন ভাব দেখায়, দেবতারা সব ওদের হাত-ধরা, ওদের চাল-কলা দিতে হবে, ওরা ঘণ্টা নাড়লেই ঠাকুর চোখ মেলে তাকাবে, তা-ই ওদের পুষতে হবে, ওদের কথা শুনতে হবে—অথাৎ দেবতা মানেই সলা গজুরাম হরেরাম পূজারী। সে-ই সব। এইসব পূর্ণেন্দু, কেশবরাও তা-ই যেন। যেমন পূজারীই মন্দিরের মালিক, সে-ই সব পাইয়ে দেয়, এ খচ্চরগুলোও সেই রকম, ওরাই যেন দলের সব। পূজারীর মন্দিরের মত দলটাও ওদের দখলে, ওরা যেমন মন্দির চালাবে, তেমনি চলবে। স্‌সাহ্‌, গোপালঠাকুর!

বাড়ি ঢুকে রান্নাঘরের কাছেই, ছোট ঘরটায়, যেখানে মোটরসাইকেলটা থাকে, রেখে বারান্দায় উঠে ঘরের দিকে গেলাম। তখনই বাবার কথা মনে পড়ে গেল, খোলা দরজা দিয়ে, অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে, আগেই সুইচটা অন করে দিলাম। বাবা অমনি বলে উঠলো, 'আহ্ নেভাও, নেভাও বলছি।'

'আচ্ছা, অন্ধকারে কেন বসে থাকেন, বলতে পারেন?'

'না, তুমি বাতি নেভাও।'

বলছে, কিন্তু তেমন রাগ রাগ ভাবে না, কখনোই আজকাল তা বলে না, কেবল দেখি চোখ দুটো, অবাক অবাক, চমকানো, যেন হঠাৎ কোথায় নিয়ে আসা হয়েছে। আমি বললাম, 'আপনি মার কথা ভাবেন, না?'

'বাতি নেভাও আগে, কথা শোন।'

সুইচটা অফ করে দিলাম, বললাম, 'বলুন না, রোজ রোজ এরকম বসে থাকেন কেন?'

'ভাল লাগে।'

'অন্ধকারে?"

'হ্যাঁ।'

'মায়ের সঙ্গে কথা বলেন?'

'জানি না। তুমি সারাদিন বাড়ি আসনি আজ?'

'না, আমার ভাল লাগছিল না। আমি চাকরি খুঁজছি, জানেন!'

'তাই নাকি। তুমি চাকরি করতে চাও?'

'চাই।'

'বেশ তো, তা হলে—'

'না, আপনার কাছে চাই না, নিজেই জোগাড় করে নেব। আপনি মেজদা বড়দা, আপনাদের কিছুই চাই না...। আমি যে কেন আপনার ছেলে, আর ওদের ভাই, কিছুই বুঝতে পারি না।'

বলতে বলতে আমি বেরিয়ে এলাম, বাবা যেন কী বলতে যাচ্ছিলেন, 'তুমি—।' থাক্ দরকার নেই, শুনতে চাই না, গুড্নাই! কিন্তু একটু মাল খেতে ইচ্ছা করছে, আগে মেজদার ঘরটাই দেখলাম, বাতি জ্বেলে, নাহ্, আলমারিতে তালা। তারপরে, বড়দার ঘরে—একই অবস্থা, স্‌সাহ্—খচ্চরগুলো সব বন্ধ করে রেখে গেছে।

ঘরে ঢুকেই শুয়ে পড়লাম। এমন কি জুতোও খোলা হল না, কিন্তু আমি চিত হয়ে শুতে পারলাম না, যেন কেমন সব ফাঁকা লাগছে। তাই বুকটা মুখটা বিছানায় খুব জোরে চেপে শুয়ে পড়লাম। বাতি জ্বালিনি, দরজাটাও খোলাই রইল। এ সময়ে শুলাদা এল, গায়ে হাত দিয়ে বললো, ' ছোট খোকা, খেতে চল।'

'না। '

'সারাদিন খাওনি, এখন আবার—'

এ লোকটা নিশ্চয় আমার মাকে মনে মনে পুরুষের মত ভালবাসতো, কথাটা এখন আমার আবার মনে হচ্ছে, কিন্তু আমি পা দাপিয়ে চেঁচিয়ে বললাম, 'না, বলছি ঘুম পাচ্ছে, উঠতে পারছি না।'

টের পাই, একটু পরেই শুলাদা চলে গেল। কিন্তু সত্যি আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে, আর শিখার মুখ দেখতে পাচ্ছি, 'আমাকে একটা চুমে দেবে।'...

পরদিন ঘুম ভাঙলো অনেক বেলায়। বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে ঘড়িটা তুলে নিতে দেখি, এগারোটা বেজে গেছে। এখন মনে পড়ছে, কাল শুলাদা খাবার জন্যে যেন ডাকাডাকি করেছিল, কী জানি, ওকে বকেছি না মেরেছি, কী করেছি। তারপরেই শিখার কথা মনে পড়লো, তারপরে মনে পড়লো আজ হরতাল আর বড়বাবুদেরও কী একটা পেরকাশ্য

অধিবেস্‌সন।

উঠে চান করে, খেয়ে, আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। জেগে দেখলাম, পাঁচটা বাজে। বড়বাবু মেজবাবু যে কখন এলেন খেলেন কিছুই জানি না। প্যান্ট জামা পরে, মোটরবাইকটা নিয়ে বেরুলাম, এখন শিখার কাছে যাব।

আমাদের গলিটা থেকে বেরিয়ে, বড় রাস্তা দিয়ে খানিকটা উত্তরে যেতেই মোড়ের কাছে এসে দেখি, দু দিক থেকে দুটো মিছিল আসছে। আমি থেমে গেলাম। মোটরবাইকটা সরিয়ে নিয়ে, একটা দোকানের বারান্দায় দাঁড়ালাম, আর এতক্ষণে আমার খেয়াল হল, রাস্তায় প্রায় লোক নেই, গাড়ি ঘোড়া নেই, দোকানপাট সব বন্ধ, সব যেন শ্মশানের মতন খা খা করছে। আমার সামনের রাস্তাটা দিয়ে–মানে পুবদিকের রাস্তাটা দিয়ে মেজদাদের মিছিল আসছিল, আর উত্তর দিক থেকে বড়দাদের। দু দলই এমন জেদের গলায় চিৎকার করছিল, নিশ্চয় মোড়ে মাথায় এসে একটা কিছু করবে। আর কী আশ্চর্য, ওরা আসছে যেন, সমান সমান দূর থেকে, যেন মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়। দু'দলেই মেলা পোস্টার ফেস্টুন নিশান। কেউ নেই, আমি কী করব, দাঁড়িয়ে দেখব নাকি। রমেশের মুখটা তখন আমি দেখতে পেয়েছি, আর ওদিকে কিষেণ, ওদের চোখ জ্বলছে। কারা যে কোনদিকে যাবে, বুঝতে পারছি না, আমার ঘাড়ের কাছে সেই জায়গাটা শিরশির করছে, অনেকগুলো চোখকে যেন আমি জ্বলতে দেখছি আমার দিকে, যেন আমাকে ছিঁড়ে খাবে। বড়দা মেজদা কোথায়। মিছিলের মধ্যে নাকি। ওরা প্রায় মুখোমুখি এসে গেছে, আমি নেমে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে রইলাম—আচ্ছা, ওরা যাক, তারপরে যাব। কিন্তু ওদের মধ্যে কীরকম কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেছে, আর ঠিক তখনই, কোথা থেকে একটা আধলা ইট আমার মাথায় এসে পড়লো। কে যেন বললো, 'মার্ ওকে।' দেখতেই পেলাম না, কারা মারামারি করছে, কারণ আমার মাথা ফেটে চোখের ওপর দিয়ে রক্ত পড়ছিল, আমি দোকানের দরজায় হেলান দিলাম, বোধ হয় আবার সেলাই করতে হবে—কিন্তু আহ্, আমি খালি একটা আগুনের ঝিলিক দেখলাম চোখের সামনে, আর কান ফেটে যাওয়া একটা শব্দ। মনে হল, একটা ঝটকা লাগলো, আর ডানদিকের কী যেন একটা হালকা হয়ে গেল আমার শরীর থেকে, ডান চোখ দিয়ে একবার এক পলকেই দেখে বুঝলাম, আমার ঘড়ি-পরা ডান হাতটা নর্দমায় পড়ে গেল। কারা মারলো—আচ্ছা সেই প্রজাপতিটার কথা আমার মনে পড়লো, চোখে ভাসছে, সিল্ক নীলাম্বরী, রুপোলী ফুটকি ফুটকি—শিখার সেই শাড়িটার মতন, কে দিয়েছিল .... বুঝতে পারছি, পড়ে গিয়েছি বারান্দার ওপরে, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আর, শিখাকে বলেছিলাম, আজ বিকালে—আর ও বলেছিল, 'কাল বাড়ি থেকে বেরিও না', আমি বলেছিলাম, টুক করে একবার তোমাকে দেখে যাব .... উহ্ স্‌সাহ্, কী একটা কষ্ট—কিছুই ভাবতে পারছি না...কিছুই না...।

কী? কী? কীরকম যেন বাবার গলা শুনতে পাচ্ছি, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, মনে হচ্ছে চোখে কিছু বাঁধা, আর একটা ওষুধ ওষুধ গন্ধও পাচ্ছি, আর গোটা শরীরটা যেন একটা টনটনে ফোড়ার মতন। বাবার গলা শুনতে পাচ্ছি, 'তুমি বলতে চাও তোমার দল মারেনি?'

'না। আপনি নিকুকে জিজ্ঞেস করুন, ওরাই টুকুকে বোমা ছুড়ে মেরেছে। তা নইলে আমি হাসপাতালে আসতাম না।'

মেজদার গলাও শোনা গেল, 'হাসপাতালে তো আমিও এসেছি। টুকুকে তোরাই তো মেরেছিস।'

ওরা আমাকে এখনো 'টুকু' বলছে—মানে আমি তো সত্যি ওদের ভাই।

তারপরেই আশ্চর্য—আশ্চর্য, আমি শিখার গলা শুনতে পেলাম, মাইরি, শিখা বলছে, 'থাক, এসব প্রসঙ্গ থাক কাকাবাবু। এদের যেতে বলুন, টুকুর এখনো জ্ঞান হয়নি।'

টুকু! শিখা আমার নাম ধরে বলছে, আমি শিখাকে ডাকতে চাইলাম, কিন্তু কোন শব্দ করতে পারছি না। শুনতে পেলাম, বাবা বলছে, 'টুকু খুব খারাপ ছিল, মানি, কিন্তু—কিন্তু —।'

শিখার গলা শোনা গেল, 'কাঁদবেন না কাকাবাবু।'

উহ্‌রে বাব্বা, বাবা কাঁদছে, কিন্তু আমি শিখাকে ডাকছি, শব্দ করতে পারছি না। তারপরেই হঠাৎ শিখা বলে উঠল, 'ডাক্তারকে ডাকা দরকার, মনে হচ্ছে জ্ঞান হয়েছে, কী রকম শব্দ হচ্ছে গলায়।'

ছাই হচ্ছে, আমি তো তোমাকেই ডাকছি, তোমাকেই, শিখা শিখা শিখা। হঠাৎ মনে হল, আমার ঠোঁটের কাছে যেন কিছু ছুঁয়ে গেল, ছুঁয়েই রইল, আমি টের পেলাম, শিখার আঙুল, আমার রক্ত জানে। তখন সব ভুলে আমি হাত তুলতে গেলাম, ডান হাতটা-কিন্তু কিছুই সেখানে আছে বলে মনে হল না, আর তখন সেই ঘড়িসুদ্ধ ডানহাতটা নর্দমায় পড়ে যাবার কথা আমার মনে পড়লো। আরে, এটা কার মুখ, মায়ের নাকি—হ্যাঁ, তাই তো—আরে, মায়ের পাশে একটা জান্ত লোক, সেই বচন ক্যাওরার মুখটাও দেখতে পাচ্ছি যেন, কী রে বাবা : শিখার গলা আবার শুনতে পেলাম, কোথায় যে একটু হাত দেব, বুঝতে পারছি না—ওকে কত বারণ করেছিলাম না বেরুতে। এই কথা শুনেই প্রজাপতিটার কথা আমার মনে পড়ে গেল—কী আছে বাপু, আমি জন্মেছি, আমার খাবার আমিই খুঁজে নেব—ওই প্রজাপতিটার মনের কথা বলছি—যেন আমিও ওইরকমই কাল ভেবেছিলাম—আমি ঠিক আমার মতই, বাঁচব, খাবার খুঁজে খাব—মানে, প্রজাপতির যেমন দু'বার জন্ম হয়, আমারও সেইরকমই হবে–আমি—অন্য মানুষ হব—এই ছেলেটা আর না, শিখা যেমন চেয়েছিল, সেইরকম –কিন্তু, 'তুমি রাক্ষস'। শিখার কথাটা মনে পড়ে গেল। শিখা তখন বলেছিল, আজ যেমন আমাকে মার খেতে হল, হয়তো মরব, কেননা, আমিও বোধহয় একটা ছেউটি ছুঁড়ির মতই ছটফট করছিলাম। উহ্ এত করে যে ডাকছি, ও জানতেও পারছে না। কেন, জানতে পারছে না কেন। শিখার গলা আবার শোনা গেল, "উহ্, কাকাবাবু, ওর সারা গায়ে মাথায় বড্ড কাঁচা রক্ত উপছে আসছে। কী রকম গোঙাছে।

কিন্তু শিখা, এত করে তোমাকে ডাকছি, তুমি শুনতে পাচ্ছ না নাকি। দেখছ, আর পারছি না ডাকতে, আর ডাকতে পারছি না। আমি শুধু ওর চুড়ির শব্দ পাচ্ছি, ঠিন ঠিন ঠিন।.... শিখা, হাতটা সরিয়ে নিও না, কোথাও যদি হাত রাখবার জায়গা না থাকে, তবে রক্তেই রাখ, রক্তেই রাখ-না না-হয়, সেই প্রজাপতিটা পায়ে চেপটে যাবার পরে কুয়াতলায় গিয়ে পা ধুয়ে ফেলার মত হাত ধুয়ে ফেলো। শিখা—তোমার পা দুটো তখন কী রকম ঠাণ্ডা ছিল। শিখা, হাত সরিও না।...

প্রজাপতির বিচার

বিধান সিংহ

প্রজাপতি মামলায় সাক্ষ্য দিতে এসেছেন সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু। কবি নরেশ গুহ। শারদীয় দেশ-এ অশ্রীল উপন্যাস প্রজাপতি লেখার দায়ে অভিযুক্ত সমরেশ বসু। তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন বলে আদালতে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের নামও দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা আসেননি। ভিড় করে এসেছেন তরুণ তরুণী সাহিত্যিক সাংবাদিক — সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবী। শ্লীলতা অশ্লীলতার প্রশ্নে আদালতে বসেছে যেন সাহিত্যের বিচারসভা।

সমরেশ বসুকে সমর্থন করে বুদ্ধদেব বসু বললেন : পবিত্রতা তো রসায়ন শাস্ত্রের কথা। সাহিত্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক? সাহিত্যে কী পবিত্র কী অপবিত্র তা আমাদের জানা নেই। একটি উপন্যাসের খানিকটা পড়ে কেউ কামার্ত হয়ে পড়েছেন এমন অভিযোগ তুললে সবার আগে রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল বেআইনি করতে হয়। ভেঙে দিতে হয় কোনারক খাজুরাহোর শিল্পকর্ম।

কিন্তু বুদ্ধদেব বসু কি ঠিক বলেছেন? শ্লীলতা অশ্লীলতা প্রশ্নে সেদিন আদালতের বাইরেও আলোড়ন। সভা বসেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিতর্ক হয়েছে অন্যত্রও। প্রশ্ন হল রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল, ধর্মগ্রন্থ বলে আইনে সুরক্ষিত। খাজুরাহো কোনারকেরও রয়েছে প্রাচীন ঐতিহ্যের রক্ষাকবচ। আইনে এরা বিশেষ অধিকারভোগী। প্রজাপতি ধর্ম বা ঐতিহ্যের সেই রক্ষাকবচ দাবি করতে পারে না। প্রজাপতি ধর্মগ্রন্থও নয়। ঐতিহাসিক পুরাকীর্তিও নয়। তাহলে সে বাঁচে কি করে? বিতর্ক এখানেই।

১৩৭৪ সালে শারদীয় দেশ-এ প্রকাশিত হয় সমরেশ বসুর উপন্যাস প্রজাপতি। তাকে অশ্লীল বলে নিবিদ্ধ করার আর্জি জানিয়ে ১৯৬৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি মামলা করলেন এক তরুণ অ্যাডভোকেট অমল মিত্র। সরকার পক্ষও এলেন তার সমর্থনে—তাঁরাও প্রজাপতিকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করলেন। সমরেশ বসুর পক্ষে প্রথম ও প্রধান সাক্ষী সাহিত্যিক অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসু। আদালতে এত ভিড় যে দাঁড়ানো যায় না। বুদ্ধদেববাবু এক একটি কথা বলেন আর সবাই হাততালি দিয়ে ওঠেন। বিচারক বারবার আপত্তি জানান। কিন্তু তবু শান্ত হন না উপস্থিত তরুণ তরুণী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা। শেষ পর্যন্ত এক সময় অবস্থা এমন হল যে দর্শকদের ভর্ৎসনা করে বিচারক বললেন, হাততালি দেবেন না। এটা ময়দান নয়, আদালত। এরকম করলে সবাইকে বের করে দেব। দরজা বন্ধ করে দেব।

শেষ অবধি অবশ্য তা আর করতে হয়নি। আদালত কক্ষ শান্ত হয়েছিল। দেশ পত্রিকার সেদিনের সম্পাদক অশোককুমার সরকার -ফরিয়াদি তাঁকে জড়াননি। কিন্তু অশোকবাবু বললেন, সব দায় আমার। সমরেশবাবুকে আমরা লিখতে বলেছিলাম। তিনি লিখেছেন। তাঁকে বলুন মামলার জন্য চিন্তা করতে হবে না। যা করার আমরা করব। যা হয় হোক। প্রজাপতিকে মুক্ত করতে শেষ পর্যন্ত যাব।

নির্ভয় হলেন সমরেশ বসু। আদালতে তিনি বললেন – আমি নির্দোষ। প্রজাপতি অশ্লীল নয়। আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করব। আমার সমর্থনে সাক্ষ্য প্রমাণ দেব। তাঁর সমর্থনে এগিয়ে এলেন সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু। ১৬ নভেম্বর ১৯৬৮ তিনি সাক্ষ্য দিতে এলেন ব্যাঙ্কশাল কোর্টে কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কুমারজ্যোতি সেনগুপ্তর আদালতে। পরনে কালো স্যুট। সঙ্গে সাগরময় ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ প্রমুখ। আশপাশে ভিড়। এসেছেন অভিযুক্ত সমরেশ বসু এবং তাঁর দ্বিতীয় সাক্ষী কবি নরেশ গুহ। যাঁরা অশ্লীলতার দায়ে প্রজাপতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরাও এসেছেন। উপস্থিত হয়েছেন দ্বিতীয় অভিযুক্ত দেশ পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত। দর্শকদের মধ্যে বসে রয়েছেন বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী প্রতিভা বসু।

বুদ্ধদেববাবু যখন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন কোর্ট রুম তখন জ্যাম প্যাকড্। যেহেতু তিনি সমরেশবাবুর পক্ষের সাক্ষী তাই প্রথমেই তাঁর আইনজীবী সাক্ষ্য নিলেন। (এক্সামিনেশন ইন চিফ) তাঁর বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে বুদ্ধদেববাবু বলেন : আমি জানি কেন আমাকে এখানে ডাকা হয়েছে। সমরেশ বসুকে আমি চিনি। আমি তাঁর কিছু কিছু বই পড়েছি। নির্দ্বিধায় বলতে পারি তিনি একালের এক শক্তিমান লেখক। তাঁর লেখা প্রজাপতি উপন্যাস আমি শারদীয় দেশে পড়েছি। বই হিসাবে বের হবার পরও পড়েছি। এই উপন্যাসটি নিয়েই বর্তমান বিচার চলছে।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন প্রজাপতি অশ্লীল?

উত্তর : মোটেই না। কোনও অংশও অশ্লীল নয়।

তাঁর হাতে শারদীয় দেশের একটি সংখ্যা দিয়ে আইনজীবী বলেন, এখানে লালকালি দিয়ে দাগানো অংশটি দেখুন তো। এই অংশটি কী অশ্লীল?

শারদীয় দেশে প্রজাপতি উপন্যাসের ওই অংশটি ভাল করে দেখে বুদ্ধদেববাবু বলেন, দেখেছি। এর কোনখানটা অশ্লীল আমি বুঝতেই পারছি না। এই অংশটিকে লালকালি দিয়ে দাগানো হল কেন?

এবার আইনজীবী তাঁকে বলেন, বেশ ১৭৯ পৃষ্ঠা দেখুন। এই যে যেখানে লেখা আছে 'পিঠের যেখানে শেষ আর কোমরের যেখানটার শুরু সেই সরু জায়গাটা ছাড়িয়ে নিচের চওড়া দিকে বেশ খানিকটা দেখা যাচ্ছে। আর একটু নিচেটাই কেমন, আমি জানি। সসাহ্ আমার হাত দুটো যেন. . . . হ্যাংলা কুকুরের মত' বলুন তো এখানে কী অশ্লীল কিছু পেলেন?

বুদ্ধদেববাণু জবাব দেন, কই না। আমি এর মধ্যে অশ্লীলতার কিছুই পেলাম না। আমি মনে করি এই অংশটি খুব বলিষ্ঠ। আমার মতে এখানে আপত্তিকর কিছুই নেই।

এবার শারদীয় দেশের ১৮৯ পৃষ্ঠা খুলে আইনজীবী তাকে প্রশ্ন করলেন - দেখুন এখানে দ্বিতীয় কলমে যে প্যাসেজটা শুরু হয়েছে 'মেজদা হয়ত একটা ঘরে আমাদের ঝিয়ের ষোল সতের বছরের মেয়েটাকে সেইসব করছে—আমি কয়েকদিন দেখেছিলাম কি না, ফ্রক পরা ধুমসো বেঁটে ভোদকা জন্তুর মতন চোখ' বলে, সেখানে অশ্লীলতা কিছু পাচ্ছেন?

বুদ্ধদেববাবু বলেন, এ একেবার ঠিক আছে অক্ষকের এই ১৯৬৮ সালে এসব কথাকে অশ্লীলতা বলা হচ্ছে কী করে তা ভেবে আমি বিস্মিত হচ্ছি। তাঁর এই কথায়, আদালতের কথা ভুলে গিয়ে অনেকেই খুশির চোটে হেসে উঠলেন। বিচারক আপত্তি জানালেন।

সবাই শান্ত হলে এবার তাঁকে আরও একটি প্যাসেজ দেখানো হল। ১৯৮ পৃষ্ঠা খুলে আইনজীবী পড়ে দিলেন—'পাশে দাঁড়িয়ে হাবড়ে চুমু খাচ্ছিল। তারপর জানতে চাইলেন এতে কী আপত্তিকর কিছু আছে?

বুদ্ধদেববাবু বললেন, না, আপত্তির কিছু নেই। এই উপন্যাসে নায়ক আজকের দিনের একটি রকবাজ ছেলে। উপন্যাসটি লেখা হয়েছে তারই জবানীতে। তারই ভাষাতে। এই রকবাজ ছেলেরা যে ভাষায় কথা বলে এখানে সেই ভাষাই ব্যবহার করা হয়েছে। তার মুখে যদি মার্জিত ভাষা বসিয়ে দেওয়া হত তাহলেই উপন্যাসটি বার্থ হত। উপন্যাসটি এতে বাস্তবধর্মী হয়েছে। হয়েছে জীবন্ত। যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের মুখের কথাই লেখক বসিয়ে দিয়েছেন। আমি মনে করি এই উপন্যাসে স্ল্যাং শব্দ বেশি ব্যবহারের এটাই কারণ।

প্রশ্ন : দয়া করে ১৮৬ পৃষ্ঠার প্রথম কলমটি দেখুন। বলুন এর মধ্যে অশ্লীলতা কিছু পেলেন?

উত্তর : না, এখানেও অশ্লীলতা কিছুই নেই। এখানে কিছু প্রেমের বিষয় বলা হয়েছে। আমি বলছি—দৈহিক প্রেমের কথা, নারী-পুরুষের দৈহিক সম্পর্কের কথা। কিছু এটা তো সাহিত্যের শাশ্বত বিষয়। আমি বুঝতে পারছি না এই প্যাসেজটার দোষ কোথায় হল?

প্রশ্ন : ১৭৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমটি দেখুন। দয়া করে এবার আপনার অভিমতটি দিন।

উত্তর : এখানে নায়ক কিছু অস্বাভাবিক মিলনের ছবির কথা বলছে। এ ছবি সে দেখেছে বলে বর্ণনা করছে। এখানে এই ছবির স্মৃতি তাঁর মনে বিতৃষ্ণাই জাগাচ্ছে। মানুষ এ ধরনের কাজ করতে পারে এটা ভেবেও সে বিরক্ত হচ্ছে। তার এই বিরক্তিরই প্রকাশ হয়েছে ছবির উল্লেখে। এতেই দেখা যাচ্ছে তার মনের ভিতরে একটি ভাল লোকও আছে। এ ধরনের বিকৃতির নিন্দার মধ্য দিয়ে এই প্যাসেঞ্জ বরঞ্চ খানিকটা নৈতিক মূল্যই পাচ্ছে। একই কথা বলা যায় ২০০ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলম সম্পর্কেও।

প্রশ্ন : অনুগ্রহ করে ১৭৯ পৃষ্ঠাটা দেখুন। এ বিষয়ে আপনি কি বলেন?

উত্তর : এ তো দেখছি একটি প্রেমের দৃশ্যের বর্ণনা। আমি মনে করি এ একেবারে যথার্থ। আমি এর মধ্যে অশ্লীলতার কিছু দেখছি না। এ সম্পর্কে আগেই আমি আমার মত জানিয়েছি। জিনার চরিত্রটিও বইটির সামগ্রিকতার জন্য দরকার। আমরা যাকে বলি সম্মানিত ব্যক্তি, এই বইয়ের নায়ক সেরকম কেউ নয়। কিন্তু তার ভিতরে কিছু সারবস্তু আছে। সেও একজন স্বাভাবিক মানুষ, শিখার প্রতি তার ডালাসায় কোন খাদ নেই। শিখাকে ভালবাসার মধ্য দিয়েই নায়ক সুখেন মস্তান থেকে একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হয়ে উঠছিল। এখানেই এই উপন্যাসের সার্থকতা।

প্রশ্ন : এই উপন্যাসে সাহিত্য বলে কিছু আছে কি?

উত্তর : এ প্রশ্নের একাংশের উত্তর আমি আগেই দিয়েছি। যেখানে স্লাং শব্দ ব্যবহারের বিষয় বলেছি। সাধারণত এসব কথা চলতি সাহিত্যের ভাষা নয়। কিন্তু এ ধরনের শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়েই উপন্যাসটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। উপন্যাসটি পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সমাজচিত্র। এই রাজ্যের এক শ্রেণীর যুবকের আচার ব্যবহার ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রতিফলন। অশ্লীলতা দূরের কথা, আমি মনে করি পশ্চিমবঙ্গের এইসব ছেলের মনস্তত্ত্ব যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলে এই উপন্যাসে একটি উচ্চ নৈতিক আদর্শই স্থাপন করেছে। আজকের দিনে আমরা যেরকম দুর্নীতির মধ্যে বাস করি প্রজাপতি তাকে প্রকাশ করে দিয়েছে। মুনাফাবাজ, কালোবাজারী, রাজনীতিবিদ, বিশেষ করে যারা রাজনীতিকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে, এই বই তাদের তীক্ষ্ণ কশাঘাত করেছে। শহরাঞ্চলে পারিবারিক জীবন কীভাবে ভেঙে পড়ছে তাও এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে। এটা যে কতটা সত্য তা আমরা অনেকেই জানি। উপন্যাসটির সমাপ্তি ট্র্যাজিক। নায়ক একটি দুর্ঘটনায় মারা গেল। পাঠকের মনে শেষ পর্যন্ত তার জন্য সহানুভূতিই জাগে। সুখেনের ভাল দিকটার কথাও মনে আসে। যেভাবে সে ঘটনাচক্রের শিকার হল সেজন্য দুঃখ হয়।

আবার তাঁর কাছে শারদীয় দেশটি খুলে ধরা হল। জানতে চাওয়া হল ১৭১ থেকে ১৮০ পৃষ্ঠার মধ্যে অশ্লীল কিছু আছে কি না? বুদ্ধদেববাবু নিজের মনে ওই অংশটুকু পড়তে শুরু করলেন। আদালতের জমাট বাঁধা ভিড় উদ্‌গ্রীব অপেক্ষায়। সাক্ষ্য শুরু থেকে প্রায় এক ঘন্টা পার হয়ে গিয়েছে। তবুও কেউ কোর্ট রুম ছাড়ছেন না।

বুদ্ধদেববাবু আবার বলতে আরম্ভ করেন : এই উপন্যাসে জিনার কাহিনী সমাজব্যবস্থার সমালোচনা। একদল ধনী শিল্পপতি সুখেনকে ব্যবহার করত। সে ছিল তাদের রক্ষাকর্তা। সুখেন ছিল মস্তান। গুন্ডা। তাই ওই শিল্পপতিরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তাকে নিয়োগ করেছিল। এই লোকগুলিই তাদের মেয়ের বয়সী মেয়ের সঙ্গে অবৈধ অভদ্র ব্যবহার করতে কসুর করত না। লেখক এই ব্যবস্থার, এই মানুষগুলিরই নিন্দা করেছেন। অন্যান্য প্যাসেজের মতো প্রজাপতির এ অংশটিও সমাজের এই ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিয়েছে। এর মধ্যে অনৈতিক কিছুই আমি পাচ্ছি না। অশ্লীলতা তো নয়ই।

প্রশ্ন : এই উপন্যাসকে সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় কোনও দলিল হিসাবে কি আপনি মনে করেন?

উত্তর : সামাজিক্ক এবং নৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই এই উপন্যাসটি লেখা। এবং সমসাময়িক ঘটনাবলীর এক সাংঘাতিক নিদর্শন। পাঠকের চেতনা বৃদ্ধি তো করেই, বস্তুত যে সমাজে আমরা বাস করি, তাকে চিনতেও প্রজাপতি আমাদের সহায়ক।

প্রশ্ন : মিঃ বসু, যেসব অংশ অশ্লীল বলে বাদী পক্ষ অভিযোগ এনেছেন, আপনি কি মনে করেন সেগুলি বাদ দিলে এই উপন্যাসের অঙ্গহানি হবে?

উত্তর : আমি মনে করি একটি শব্দ বাদ দিলেও উপন্যাসটির দারুণ ক্ষতি হবে। আমি এও মনে করি যে, লেখক ছাড়া আর কারও তাঁর রচনার পরিবর্তন করার নৈতিক অধিকার নেই।

প্রশ্ন : পাঠককে নীতিভ্রষ্ট বা দুর্নীতিপরায়ণ করার উদ্দেশ্য নিয়েই কি বইটি লেখা? এই উপন্যাস পড়ে বিশেষ করে কাঁচা বয়সের ছেলেমেয়েদের কী নৈতিক অধঃপতন হব না?

উত্তর : না, তা হবে না। বরঞ্চ এই বই পড়ে তাদের মনে সহানুভূতিই জাগবে।

প্রশ্ন : মিঃ বসু, আপনি তো এই বই পড়েছেন। এটা পড়ে সুখেনের পরিণতির জন্য আপনার মনে করুণা ছাড়া, হতাশা, ঘৃণা বা বৃতিষ্ণার সৃষ্টি হয়েছে কি?

উত্তর : আমি একজন অভিজ্ঞ পাঠক। তাই আমার মনে ঘৃণা বা হতাশা জাগার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আমি বিচলিত হব না। কিন্তু আমি মনে করি বাঙালী পাঠকদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা এই বই পড়ে বিচলিত হবেন এবং বিচলিত বোধ করবেন ভালর জন্যই। যাঁরা সমাজে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অবস্থানে রয়েছেন তাঁরা এবং বহু মানী ব্যক্তি এই উপন্যাস পড়ে বুঝতে পারবেন আজকের বাস্তব অবস্থাটা কি? কোন সামাজিক পরিবেশে তাঁরা বাস করছেন। এদিক দিয়ে বিচার করলে প্রজাপতি বিশেষভাবে অর্থবহ হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন : মিঃ বসু, কেউ যদি বলেন এই বই তাঁর ছেলেদের হাতে দেওয়া যায় না তাহলে আপনি কি বলবেন?

উত্তর : যদি তারা নেহাতই নাবালক হয় তাহলে এ উপন্যাসের কিছুই বুঝবে না। আর ১৩–১৯ এর মধ্যে যাদের বয়স তাদের এ বই ভালই লাগবে।

প্রশ্ন : যদি কেউ বলেন প্রজাপতি একটি অপবিত্র উপন্যাস তাহলে আপনার জবাব কি হবে?

উত্তর : আমার মনে হয় পবিত্রতা রসায়নশাস্ত্রের বিষয়। সাহিত্যের সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই। -এই উত্তর শুনে আবার কোর্টরুমে হাসির শব্দ ভেসে আসে। আবার বিচারক আপত্তি জানান।

প্রশ্ন : বাংলায় এমন কোনও নামকরা সাহিত্য আছে কি যা তথাকথিত পবিত্রতা মুক্ত।

উত্তর : পবিত্রতা বলতে আপনারা মিলনের স্বাধীনতার অনুপস্থিতির কথা বলছেন এটাই আমি ধরে নেব। কেন না আমার যতদূর মনে হয় অশ্লীলতা নিয়ে যত প্রশ্ন সবই ওঠে নরনারীর এই মিলনের সম্পর্কের বিষয় থেকে। কীভাবে এই সম্পর্কের কথা লেখা হয়েছে তাকে কেন্দ্র করেই অশ্লীলতা সংক্রান্ত যত প্রশ্ন সব আবর্তিত। এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সাহিত্য ও শিল্পে এই মিলনের কথা অবাধে এসেছে। কেউ তার উপর কোনও নিষেধবিধি জারি করেননি। মহাভারতে বা কালিদাসের কাব্যে কিম্বা কোনারক খাজুরাহো বা পুরীর মন্দিরে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। এগুলি মহৎ শিল্পকর্ম হিসাবে স্বীকৃত। বাংলা সাহিত্যেও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর এবং বহু বৈষ্ণব কবিতায় এই সম্পর্কের কথা বেশ খোলাখুলিই আছে। মনে রাখতে হবে জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং অন্যান্য বৈষ্ণব পদাবলী আমাদের দেশে ধর্মীয় সাহিত্য হিসাবে স্বীকৃত।

সমরেশ বসুর আইনজীবীর প্রশ্নোত্তরে এখানেই বুদ্ধদেব বসুর সাক্ষ্য শেষ হল। এবার জেরা করতে উঠলেন বাদী পক্ষের আইনজীবী। যাঁরা প্রমাণ করতে চান প্রজাপতি অশ্লীল। সব মিলিয়ে ১৬ নভেম্বর ১৯৬৮ প্রথম দিনেই বুদ্ধদেববাবু আড়াই ঘণ্টা সাক্ষ্য দেন। তিনি বলেন ইংরেজিতে। সারাক্ষণই কবি নরেশ গুহও আদালত কক্ষের বাইরে একটি ঘরে অপেক্ষা করছিলেন। কারণ দ্বিতীয় সাক্ষী হিসাবে তিনি প্রথম সাক্ষীর সাক্ষ্য শুনতে পারেন না। কিন্তু বুদ্ধদেববাবুকেই এমন জেরা করা শুরু হল যে তাতেই আদালতের সময় শেষ। নরেশবাবুর সাক্ষ্য এদিন হলই না। জেরার জবাবে বুদ্ধদেববাবু বললেন-তাঁর বয়স ৬০। তিনি বিবাহিত। ইংরেজিতে তিনটি ও বাংলায় দু'শটি বই তিনি লিখেছেন। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

অধ্যাপক ছিলেন। সাত বছর ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান। ভিজিটিং অধ্যাপকও ছিলেন আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। পূর্ব ইওরোপ এবং স্পেন ছাড়া ঘুরেছেন প্রায় গোটা পৃথিবী। তিনি ইংরেজির এম. এ। ইংরেজি সাহিত্যে বিস্তর বই পড়েছেন। বাংলাতেও। তবে অন্য ভাষায় নয়। ফরাসী ও অন্যান্য ভাষার ইংরেজি অনুবাদ পড়েছেন।

তিনি লেডি চ্যাটার্লিজ লাভারও পড়েছেন জানাবেন। বললেন, পুজোর সময় প্রকাশিত দেশ শারদীয় সংখ্যা অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাঁর মনে হয় দেশের পাঠকদের অধিকাংশই বাঙালী মধ্যবিত্ত। ছোট ছেলেমেয়েরা দেশ পড়ে বলে তিনি মনে করেন না। এখানে ছেলেমেয়ে বলতে তিনি বোঝাচ্ছেন তিন থেকে দশ বছর বয়সের কথা। শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ দেশ পড়ে বলেও তিনি মনে করেন না। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত মানুষের শতকরা হার কম নয়। তবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের থেকে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিতের হার কম হতেই পারে। প্রজাপতি পড়ে পাঠকদের মনে নানারকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে একথা তিনি স্বীকার করেন।

প্রশ্ন : সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও বয়সের মানুষের মনে এই প্রতিক্রিয়ার রূপ কি?

উত্তর : বয়স বা শ্রেণীভেদে এ প্রতিক্রিয়ার তারতম্য তেমন নয়। আর একটু ব্যাখ্যা করে বলা যায় বইটি পড়ে পাঠক পাঠিকার মনে যে অনুভূতি হবে তা তার শ্রেণী বা বয়সের উপর তেমন নির্ভর করে না!

এদিনের মত আদালত শেষ হল। বিচারক কুমারজ্যোতি সেনগুপ্ত বললেন, পরবর্তী শুনানি ২০ নভেম্বর। সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে নেমে এলেন বুদ্ধদেব বসু। একই সঙ্গে বেরিয়ে এলেন আদালতে সমবেত সাহিত্যিক সাংবাদিক ও আইনজীবীরা।

২০ নভেম্বর আবার সবাই এলেন। এদিন ভিড় আরও বেশি। আইনবিদ জেরা শুরু করলেন।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম প্রশ্নই হল : মিঃ বসু, আপনি প্রতিভা বসুকে চেনেন?

বুদ্ধদেববাবু : হ্যাঁ। আমি একজন প্রতিভা বসুকেই চিনি। তিনি আমার স্ত্রী।

প্রশ্ন : আপনার যেসব রচনা প্রকাশিত হয় তার জন্য কি আপনি কোনও টাকা পান?

উত্তর : নিশ্চয়ই।

প্রশ্ন : মিঃ বসু, লেখক, প্রকাশক এবং মুদ্রকের মধ্যে সাধারণত সম্পর্কটা কেমন? বন্ধুত্বপূর্ণ কি?

উত্তর : সাধারণভাবে বলা মুস্কিল। মাঝে মাঝে আমাকে প্রকাশকদের হাতে ভুগতে হয়েছে।

প্রশ্ন : আচ্ছা এই শারদীয় দেশে কি আপনারও একটি লেখা ছাপা হয়েছে?

উত্তর : হ্যাঁ। ১৩০ পৃষ্ঠায় আমার লেখা আছে।

প্রশ্ন : এই দেশেই ৫১ পৃষ্ঠায় 'দুই নাম এক সুর' নামে একটি গল্পও প্রকাশিত হয়েছে। সেটা কি আপনার স্ত্রীর লেখা?

উত্তর : হ্যাঁ, আমার স্ত্রী এটা লিখেছেন।

প্রশ্ন : সাহিত্য কী?

উত্তর : সাহিত্য হল মানব মনের অনুভূতির প্রকাশ। ভাষার মাধ্যমে মানুষের বুদ্ধিমত্তার রূপায়ণ।

প্রশ্ন : মিঃ বসু, অশ্লীলতা সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

উত্তর : আমি মনে করি কোনও রচনা যদি প্রসাদগুণে সাহিত্য হয়ে ওঠে তবে তাকে

অশ্লীন বলা চলে না। আঙ্গিকের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে সাহিত্য হল কল্পলোকের সৃষ্টি—কল্পনাপ্রসূত লেখা।

প্রশ্ন : দেশ শারদীয় সংখ্যাটির দাম কত?

উত্তর : বইয়েই দেখা যাচ্ছে সাড়ে তিন টাকা।

প্রশ্ন : আপনি কি একথা স্বীকার করবেন যে, দেশের এই সংখ্যাটি যে কেউ কিনতে পারেন? কিনতে পারে বিভিন্ন বয়সের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও?

উত্তর : আংশিকভাবে এটা আমি স্বীকার করছি লজের ছাত্রছাত্রীরা এই ম্যাগাজিন (দেশ) কিনতে ও পড়তে পারে - কিন্তু সাধারণভাবে স্কুলের ছেলেমেয়েরা তা পারে না। সুতরাং সব বয়সের ছেলেমেয়ের পক্ষে এটা পড়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন : স্কুলের ছেলেমেয়েদের কী দেশের এই সংখ্যাটি দেখারও কোনও সুযোগ হবে না?

উত্তর: হ্যাঁ, তা সম্ভব।

প্রশ্ন : মিঃ বসু, পাঠক-পাঠিকারা যখন এই বই পড়বেন তখন তাঁরা উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে বাস্তব চরিত্র বলেই মনে করবেন—একথা আপনি মানেন কি?

উত্তর : যেভাবে আমরা বেঁচে আছি সে অর্থে একটি উপন্যাসের চরিত্র কখনও জীবন্ত হতে পারে না। '

প্রশ্ন : তার মানে আপনি কি এই বলতে চাইছেন যে প্রজাপতি পড়ার সময় পাঠকরা ভাববেন না যে তার চরিত্রগুলি আমাদের মতো নড়াচড়া করছে বা কথা বলছে, মনের তাব জানাচ্ছে?

উত্তর : আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, পাঠক-পাঠিকা বুঝবেন চরিত্রগুলি বাস্তব। – বানানো নয়। স্বাভাবিক ! কৃত্রিম নয়।

প্রশ্ন: বাস্তব শব্দটির দ্বারা আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?

উত্তর : রূপকথা বা রোমান্সে যেসব চরিত্র থাকে সেরকম নয়। বাস্তব চরিত্র মানে হল সমসাময়িক সমাজ জীবনে যেরকম মানুষের দেখা পাওয়া যায় তার সঠিক চরিত্র চিত্রণ।

প্রশ্ন : প্রজাপতির চরিত্রগুলি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মনে বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে—একথা আপনি স্বীকার করবেন কি?

উত্তর : খুব বিশদ ও নিবিড় বিচারে বিভিন্ন স্তরের মানুষের মনে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া হতে পারে। কিছু সাধারণভাবে সকলের মনের ভাব একই রকম হবে।

প্রশ্ন : প্রজাপতি উপন্যাস পাঠকের মনে কিছু ছাপ তো ফেলবেই?

উত্তর : হ্যাঁ, আমি তা স্বীকার করি।

প্রশ্ন : আপনি তো বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য পাঠে একজন অভিজ্ঞ পাঠক। তবুও আদি রসাত্মক রচনা কি আপনাকেও বিচলিত করে না?

উত্তর : দুঃখের বিষয় সে বয়স পার হয়ে এসেছি। তাঁর এই জবাবে আদালতে এমন জোরে সবাই হেসে ওঠেন যে বিচারক তাঁদের মনে করিয়ে দেন – এখানে চুপ করে থাকাই নিয়ম।

অ্যাডভোকেট দেশ শারদীয় সংখ্যাটি তাঁর দিকে এগিয়ে দেন। দাগালো অংশগুলি পড়তে বলেন : বুদ্ধদেববাবু পড়েন। আডভোকেট প্রশ্ন করেন—এরপরও কী বলবেন এসব ভাষা অশ্রীল নয়?

উত্তর : এরকম ভাষা এখনও সাহিত্যে খুব বেশি আসেনি। বইয়ে তত বেশি এসব ভাষা ব্যবহৃত হয় না তাও সত্য। কিন্তু সমাজে বিশেষ করে রকবাজদের মধ্যে এসব ভাষা এখন খুবই চলছে। সুখেন তো তাদেরই প্রতিনিধি। সুতরাং রকবাজদের ওই ভাষা ব্যবহার করে সমরেশ বসু বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধই করেছেন।

প্রশ্ন : একথা কী স্বীকার করবেন যে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রমথ চৌধুরী, স্বামী বিবেকানন্দ --এরা সবাই ছিলেন উঁচুস্তরের সাহিত্য সমালোচক?

উত্তর : স্বামী বিবেকানন্দ এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্পর্কে আমি খুব নিশ্চিত নই। তাঁরা যে সাহিত্য সমালোচক ছিলেন তা বলা শক্ত। তবে অন্যরা খুবই বড় মাপের সাহিত্য সমালোচক।

প্রশ্ন : এদের লেখা থেকে একটি লাইন, একটি প্যাসেজ বলতে পারেন যেখানে অবাধ মিলনের কথা বিশদে বলা হয়েছে? বা এক বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি এরকম মূল্যায়ন তাঁরা করেছেন? দেখান তো এরকম কোনও দৃষ্টান্ত।

উত্তর : রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কে যাঁদের সম্যক জ্ঞান আছে তাঁরাই জানেন সারা জীবন তিনি ছিলেন স্বাধীনতার প্রবক্তা। এ স্বাধীনতার মধ্যে সামাজিক ও মিগনের স্বাধীনতার কথাও আছে। আমি সকলকে মনে করিয়ে দিতে চাই—রবীন্দ্রনাথ তাঁর চোখের বালি উপন্যাসে এক হিন্দু বিধবার সঙ্গে এক যুবকের প্রেমের বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে যাঁরা আছেন তাঁদের কী আমি মনে করিয়ে দিতে পারি যে রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরেতে, এক অভিজাত বিবাহিতা মহিলা তাঁর স্বামীর বন্ধুর প্রেমে পড়েছেন। একথাও আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে চতুরঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একটি মিলনের দৃশ্যকে অপূর্ব কাব্যিক মহিমায় বর্ণনা করেছেন।

অ্যাডভোকেট এইসময় বলে ওঠেন, আপনি দেখছি সৎ সাহিত্য সম্পর্কে একটি বিকৃত ধারণায় ভুগছেন। বুদ্ধদেববাবু জবাব দেন, আপনি যদি মনে করেন আমার সাহিত্য বিকৃত তাহলে আমি শুধু বলতে পারি—তা ঠিক নয়। এবং আমি এই আদালতে এসেছি সাহিত্য সমালোচনার এক অতি উচ্চমানের অধিকারী হিসাবে।

প্রশ্ন : মিঃ বসু, আমি বলছি আপনার সমগ্র সাহিত্যিক জীবনের শুরু হয়েছিল করলাম যুগের বিপ্লবী চিন্তা ধারার সঙ্গে। এবং সেটা শেষ হয়েছিল পরবর্তীকালে তারই সমধর্মীদের প্রতি সমর্থনে।

উত্তর: কল্লোল যুগের জন্য আমি গর্বিত। কোনও যুবক লেখক কোনও না কোনও অর্থে যদি বিপ্লবাত্মক না হন তবে তিনি স্বার্থক নন : যাঁরা বাংলায় লেখেন স্বভাবতই তাঁদের সকলের জনাই আমার সহানুভূতি আছে। আলোচ্য উপন্যাস সম্পর্কে নিশ্চয়ই আমার একটি সুনির্দিষ্ট মতামত আছে এবং আমি তা আগেই জানিয়েছি।

প্রশ্ন : মিঃ বসু, আমি আপনাকে বলছি যেহেতু আপনি সমরেশ বসুর সঙ্গে পরিচিত তাই তাঁর হয়ে সাক্ষী দিতে এসেছেন।

উত্তর : সমরেশ বসুকে আমি মাত্র চার পাঁচ বার দেখেছি। আমি এখানে সমরেশ বসুর জন্য আসিনি। এসেছি সমগ্র বাংলা সাহিত্যের জন্য।

প্রশ্ন: মিঃ বসু, আপনি কি এই আদালতে হাজির হবার জন্য কোনও সমন পেয়েছেন?

উত্তর : না, আমি কোনও সমন পাইনি।

প্রশ্ন - আমি আপনাকে বলছি যেহেতু দেশ পত্রিকার মুদ্রাকর এবং প্রকাশকের সঙ্গে আপনার ভাল সম্পর্ক আছে তাই আপনি তাদের হয়ে সাক্ষী দিতে এসেছেন।

উত্তর : না, তা কখনই নয়। আমি এটা অস্বীকার করছি।

প্রশ্ন : শারদীয় দেশের দাম সাড়ে তিন টাকা। এ বই তো অনায়াসেই, ছোটদের হাতে পড়তে পারে?

উদ্ভব : কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কিনতে পারে।

প্রশ্ন : তাহলে এবার বলুন এ বই পড়লে তাদের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন হবে কিনা?

উত্তর : যুবক ছাত্রদের মনে সর্বদাই এক আদর্শবোধ কাজ করে। তারা, এত সহজে প্রভাবিত হয় না, তাছাড়া একটি উপন্যাসের কোনও অংশ পাঠ করলেই কারও মনে কামভাব জেগে উঠবে, অতএব ও বই অশ্লীল, ওটা বন্ধ করে দাও এ ধুয়া তুললে তো আগে মহাভারত, বাইবেল এসবই নিষিদ্ধ করে দিতে হয়।

এই কথায় আদালতে এত প্রবল হাততালি পড়তে শুরু করে যে বিচারক কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করে ওঠেন। তিনি বলেন— হাততালি দেবেন না, এটা ময়দান নয়। আদালত। এরকম করলে বের করে দেওয়া হবে। দরজা বন্ধ করে দেব।

আদালত শান্ত হতে আবার জেরা শুরু হল। অভিযোগকারীর অ্যাডভোকেট জিজ্ঞাসা করলেন, মিঃ বসু আপনি কি জানেন প্রাচীন পুরাকীর্তি, মহাকাব্য ও ধর্মগ্রন্থের জন্য আলাদা আইন আছে। সেই আইনে সেগুলি সুরক্ষিত?

বুদ্ধদেববাবু জবাব দেন, আমি সেরকমই শুনেছি।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন আইনে চিকিৎসাশাস্ত্রের বইয়েরও ঠিক একই রক্ষাকবচ আছে?

উত্তর : সেটাও আমি শুনেছি।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন পুরী, কোনারক, খাজুরাহো, অজন্তা, ইলোরার স্থাপত্য, ভাস্কর্য, এবং চিত্রকলাও ধর্ম ও ঐতিহাসিক কারণে আইনে সংরক্ষিত?

উত্তর : ভগবানকে ধন্যবাদ যে ওগুলি ওভাবে আইনের সাহায্যে রক্ষা করা হচ্ছে।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন প্রজাপতি উপন্যাসটি ধর্ম, মহাকাব্য বা চিকিৎসাশাস্ত্রের পর্যায়ে পড়ে?

উত্তর : প্রজাপতি নিশ্চয়ই চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু পঞ্চাশ বছর পরে প্রজাপতি হয়ত ধর্মগ্রন্থ বা ক্ল্যাসিকের পর্যায়ে পড়তে পারে।

প্রশ্ন : প্রজাপতি উপন্যাসে লেখক দৈহিক মিলনের এবং অস্বাভাবিক সম্পর্কের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন একথা আপনি মানেন কি?

উত্তর : আমি স্বীকার করি না। সঙ্গে সঙ্গে আমি এটুকুও যোগ করে দিতে চাই যে, এই প্রশ্নটিতে প্রজাপতি উপন্যাসের বিষয়বস্তু যথাযথ তুলে ধরা হয়নি। আমার যতদূর মনে পড়ে প্রজাপতিতে অস্বাভাবিক কোনও বর্ণনা নেই। এক জায়গায় কিছু ছবির কথা আছে- হে বিকৃত রুচির ফটো সুখেন আগে দেখেছে বলে মনে করছে। কিন্তু সেই ফটো দেখার স্মৃতি

তার মনে বিতৃষ্ণাই জাগিয়েছে। এতেই প্রতীয়মান হয় যে সে একজন ভদ্ররুচির মানুষ।

তাছাড়া দৈহিক সম্পর্কের বর্ণনাগুলিও খুব বিশদ বলে আমি মনে করি না। বরঞ্চ বহুক্ষেত্রেই এসব দৃশ্য বোঝানো হয়েছে প্রতীকের মাধ্যমে।

প্রশ্ন : এইমাত্র আপনি যেসব কথা বললেন আপনি কি মনে করেন না প্রজাপতির সেইসব মিলনের বর্ণনা অল্পবয়সী ছেলেমেয়ের পক্ষে উত্তেজক। এই উপন্যাস পাঠে আবেগতাড়িত এইসব অল্পবয়সীদের মনে কামভাব জাগতে পারে?

উত্তর : উঠতি বয়সীদের মধ্যে থাকে এক উচ্চ আদর্শবোধ। থাকে মহৎ চিন্তার তাড়না। আমি মনে করি প্রজাপতি উপন্যাসের এই ফটোর ব্যাপারে তার নায়কের মনে যেমন বিতৃষ্ণা জেগেছিল, অল্পবয়সী এবং যৌবনমুখী ছেলেমেয়েদের মনেও তেমনি বিরূপভাবই জাগবে। এইসব বর্ণনার তাদের মন কলুষিত হবে এরকম আমি কখনই মনে করি না।

প্রশ্ন : আপনি কি এটা স্বীকার করবেন যে দৈহিক সম্পর্ক ও তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা বিরক্তিকর, নোংরা, ঘৃণিত, স্থুল, অশোভন এবং অশ্লীল?

উত্তর : প্রজাপতি উপন্যাসের সঙ্গে এই প্রশ্নের কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। কারণ এই উপন্যাসে কোথাও সেরকম বর্ণনাই নেই।

প্রশ্ন :বাঙ্গালীদের বয়েস যতদিন ৪৫ এর কম থাকে ততদিনই তাদের আবেগ বেশি থাকে একথা কি আপনি স্বীকার করেন?

উত্তর : আমার কাছে কোনও সংখ্যাতত্ত্ব নেই। সুতরাং আমি কি করে উত্তর দেব।

প্রশ্ন : আপনি কি রসায়নশাস্ত্র পড়েছেন?

উত্তর : না, পড়িনি।

প্রশ্ন : সাহিত্যে অবাধ দৈহিক মিলন নিয়ে লেখা হোক আপনি কী এই মতবাদের প্রচারক?

উত্তর : আমি নিশ্চয়ই স্বাধীনতার দিকে। কিন্তু সাহিত্যের স্বাধীনতা কখনই নির্বিচার হতে পারে না। হতে পারে না লাগাম ছাড়া। আইনের বাঁধন যদি উঠেও যায় তবুও শিল্পের নিয়ম নীতির গণ্ডী তাকে নিয়ন্ত্রণ করবেই।

প্রশ্ন: আমি আপনাকে বলছি আপনার নিজের বইগুলির মধ্যে আভাসে আদিরসাত্মক বিষয় থাকে এবং যাঁরা সংস্কৃতিমনা নন তাঁদের কাছে এজনাই সেগুলির বিশেষ আবেদন রয়েছে।

উত্তর : আমি মানছি না। কেননা বই ছাড়াও আমি বহু কবিতা লিখেছি। কবিতার অনুবাদ করেছি। অনেক সময় আমার উপন্যাসের থেকেও এগুলির বিক্রি বেশি।

বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে আইনজীবী কতগুলি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে থাকেন। বিচারক সেগুলি অনুমোদন করলেন না। তিনি ওসব প্রশ্ন বাদ দিয়ে দেন।

বুদ্ধদেববাবুর দিকে আবার শারদীয় দেশটি এগিয়ে দিয়ে অ্যাডভোকেট বলেন, ১৭৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমটি দেখুন তো। ওই যে যেখানে লেখা আছে 'তার জন্যেই খাই ... অদ্ভূত কাণ্ড।' এখানে লেখক কী বর্ণনা করছেন?

উত্তর : কতগুলি ছবির বর্ণনা, যা সে আগে দেখেছে।

প্রশ্ন : আপনি কি বলবেন এ ধরনের লেখা চিরাচরিত রীতির বাইরে?

উত্তর : ১৯৬৮ সালে এটাকে ঠিক প্রচলিত রীতিবিরুদ্ধ বলব না।

প্রশ্ন : মিঃ বসু, আপনি কি বলতে চান কম বয়সের ছেলেমেয়েরা এই অংশটি পড়েও কোনও মতেই প্রভাবিত হবে না?

উত্তর : আমি আগেই বলেছি তারা এগুলি বাতিল করে দেবে।

প্রশ্ন : আমি আপনাকে বলছি, এই অংশ অশ্লীল এবং তা তাদের কলুষিত করবে।

উত্তর : আমি মনে করি না এই অংশ অশ্লীল। এতে যুবক বৃদ্ধ কারও মনই কলুকিত হবে না।

প্রশ্ন : আপনি কি এটা স্বীকার করবেন যে প্রজাপতি উপন্যাসে লেখক এমন সব শব্দ

ব্যবহার করেছেন যা বাংলা সাহিত্যে অজানা?

উত্তর : এসব শব্দ হয়ত সাহিত্যে অজ্ঞাত ছিল। ছিল অব্যবহৃত। কিন্তু এসব কথা আজকাল খুবই চলতি। এইসব শক্তিশালী নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করে লেখক বাংলা সাহিত্যের যে উপকার করেছেন তাতে তিনি প্রশংসার যোগ্য।

শারদীয় দেশের ১৭৯ পৃষ্ঠা খুলে প্রশ্ন করা হল, দেখুন— পিঠের যেখানে শেষ . . . হ্যাংলা কুকুরের মত'। এসব কী লেখা? এর দ্বারা পাঠকের মনে কোন ভাবের উদ্রেক করা লেখকের উদ্দেশ্য?

উত্তর : লেখকের মনের ভাব আমি কেমন করে জানব? তিনি কী উদ্দেশ্যে লিখেছেন তাই বা বলব কী করে? আমি তো ভগবান নই।

প্রশ্ন: আপনি কী মনে করেন এই প্যাসেজটিও উপন্যাসটির পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়?

উত্তর : আমি এ অংশটিকে আলাদা করে পড়িনি, বিচারও করব না। এই অংশও পড়েছি সামগ্রিক উপন্যাসের সঙ্গে। উপন্যাসের শিখা - সুখেনের কাহিনীরই যে এটি অঙ্গ তাও এই আদালতকে আগেই জানিয়েছি। আমি আদালতকে ইতিমধ্যেই এ কথাও বলেছি যে প্রজাপতি উপন্যাসের কোন কোন অংশ (জিনার কাহিনী) যা এখানে উল্লেখিত হচ্ছে তা আসলে সমাজের একশ্রেণীর উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি। তারা নানা কদাচারে লিপ্ত, অবৈধ ক্রিয়া-কলাপেও অভ্যস্ত, মেয়ের বয়সী মেয়েকেও রেয়াত করে না, অথচ সাধু সেজে থাকে। এইসব ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে, কালোবাজারী শোষণকারীদের বিরুদ্ধে এখানে শ্লেষাত্মক আক্রমণ করা হয়েছে। আমি মনে করি এইসব প্যাসেজ বইটিতে একটি বিশেষ তাৎপর্য আরোপ করেছে।

প্রশ্ন : না, মিঃ বসু, আমি আপনাকে বলছি এসব অংশ অশ্লীল।

উত্তর : আমি মানছি না।

প্রশ্ন : শারদীয় দেশের (১৩৭৪) ১৭৯ পৃষ্ঠার দিকে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি : এই যে প্যারাগ্রাফ ৩ যেখানে শুরু হচ্ছে 'কিন্তু সে যাকে .... খেলা চলছিল'। আমি আপনাকে বলছি এটা অশ্লীল।

উত্তর : আমি মানছি না।

প্রশ্ন : লেখার ভিতর দিয়ে সমাজের বাস্তব চিত্র যথাযথ তুলে ধরাই একজন লেখকের কর্তব্য নয় কি?

উত্তর : আমি তা মনে করি না। আমি এমন বহু রচনার কথা জানি যেখানে সমাজের সামগ্রিক চিত্রটি পরিস্ফুট হয়নি।

প্রশ্ন : ১৭৯ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলম দেখুন। ১৮০ পৃষ্ঠাও পড়ুন। যাকে বলা হচ্ছে জিনার উপাখ্যান। এটি পুরোপুরি অশ্লীল।

উত্তর : আমি তা মনে করি না।

প্রশ্ন : একটি উঠতি যুবক যদি চোখের সামনে দেখে কোনও টমি সেনা একটি কিশোরীকে প্রকাশ্যে ধর্ষণ করছে তাহলে সে-দৃশ্য কী তাকে দুর্নীতিগ্রস্ত করবে?

উত্তর : আমার মনে হয় ওরকম দেখলে ছেলেটি ভয় পাবে।

প্রশ্ন: মিঃ বসু, দয়া করে ১৮১ পৃষ্ঠা দেখুন—'মাতাল আমেরিকানটা .... পালা বলছি। এখানে কী বর্ণনা করা হয়েছে?

উত্তর : এমন একটা কিছুর বর্ণনা যা অন্ততঃ দৈহিক সম্পর্কের বিবরণ নয়।

প্রশ্ন : আমি আপনাকে বলছি লেখক এখানে মিলনের দৃশ্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেছেন।

উত্তর : এ লেখার মধ্যে এমন কিছু নেই যাতে বোঝা যায় এটা মিলনের বর্ণনা।

প্রশ্ন : ১৮৬ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে যেখানে লেখা হয়েছে— প্রজাপতিটা হাতটা.... বাড়িয়ে দি'–সেখানে লেখক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শিখার বক্ষোদেশের বর্ণনা করেছেন।

উত্তর : হ্যাঁ। সেখানে এরকমই একটা কিছু আছে। কিন্তু আমি তো আগেই বলেছি

শিখার কাহিনীটি সামগ্রিক মূল্যবোধের দিক দিয়েই বিচার করেছি।

প্রশ্ন: মেজদা হয়তো জন্তুর . . . . . মত চোখ—এ অংশটাকেও কী অশ্লীল বলবেন না? উত্তর : না, বলব না। এখানে মেজদা শ্রেণীর মানুষের ভণ্ডামীর মুখোশটাই খুলে দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : এবার তাহলে ২০৪ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের তিন প্যারাগ্রাফটা পড়ুন, 'আমি বললাম বেগুন ভাজা খেয়েছো, বলুন এটা অশ্লীল নয়?

উত্তর : এটা অশ্লীল নয়।

এরপর ক্রমাগত পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা খুলে অ্যাডভোকেট বলতে থাকেন, আমি বলছি এটা অশ্লীল। বুদ্ধদেববার জবাব দেন আমি মনে করি অশ্লীল নয়। অ্যাডভোকেট বলেন: হ্যাঁ অশ্লীল। বুদ্ধদেববাবু বলেন, না, অশ্রীল নয়।

এ দিনের মত আদালত শেষ হয়। ২১ নভেম্বর তৃতীয় দিনেও আবার আসেন বুদ্ধদেববাবু। তিনি সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে অভিযোগকারীর অ্যাডভোকেট জেরা শুরু করতে প্রথমেই টেনে আনেন রবীন্দ্রনাথের কথা। তিনি প্রশ্ন করেন—কুরুচিপূর্ণ, অশ্লীল ও বলপূর্বক মিলনের দৃশ্যে ভর্তি প্রজাপতিকে আপনি কি রবীন্দ্রনাথের রচনার সূচারু প্রেমের সঙ্গে এক করতে চান। বুদ্ধদেববাবু বলেন, এটা একটু ব্যাখ্যা করে বললে ভাল হয়। তা ছাড়া প্রজাপতিতে কুরুচিকর দৃশ্য কোথায়? জোর জবরদস্তিরও তো কিছু নেই। প্রশ্নকারীর মনে হয়ত কিশোরী জিনার কাহিনীটা আছে। তা সেখানে যদি কিছু হয়েই থাকে তা দুপক্ষের সম্মতিতেই হয়েছে। নাবালিকার প্রতি বলপ্রয়োগ এটা নয়।

প্রশ্ন : সাহিত্য সৃষ্টি হয় সমাজের মঙ্গলের জন্য এটা আপনি স্বীকার করেন তো?

উত্তর : প্রেম ভালবাসা এবং সৌন্দর্য যেমন সমাজের পক্ষে উপকারী সাহিত্যও তেমনই।

প্রশ্ন : প্রজাপতির লেখক মানুষের আবেগকে বাড়িয়ে দেখিয়েছেন। স্তরে স্তরে মিলনের এমন বর্ণনা দিয়েছেন যে, এই উপন্যাস পড়ে সাধারণ মানুষের ধারণা হবে কামই বুঝি সব। এই দেহসর্বস্বতা যে খারাপ - আপনি কী সেটা মানেন?

উত্তর : এটিই মানুষের জীবনের শেষ বা একমাত্র কথা নয়, এটা ঠিক। কিন্তু দৈহিক সম্পর্ককে বাদ দিয়েও জীবন নয়। সুতরাং সাহিত্য ও শিল্প থেকে এই সম্পর্ককে বাদ দিলে শিল্পকলা এবং সভ্যতাই পঙ্গু হবে। তা ছাড়া প্রজাপতি উপন্যাসে উচ্ছৃঙ্খলতার একটি দৃশ্যও নেই। যা আছে তা প্রধানত সমাজের ভণ্ডামীর সমালোচনা।

প্রশ্ন : এটা তো মানবেন যে, কোনও লেখার বিষয়বস্তু কীভাবে এসেছে সেটা নির্ভর করে পাঠকের মনের গঠনের উপর।

প্রশ্নোত্তর চলছিল ইংরেজিতে। বুদ্ধদেবাবু হেসে বললেন, এ ইংরেজি আমি বুঝলাম না।

প্রশ্ন : মিঃ বসু এটা কী আপনি মানবেন যে, বাণিজ্যিক লাভের জন্যই প্রজাপতি লেখা হয়েছে।

উত্তর : নিশ্চয়ই নয়।

প্রশ্ন : 'আমাদের সামাজিক কাঠামোতে হঠাৎ এমন কী হয়ে গিয়েছে যে, ১৯৬৮ সালে দৈহিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে কোনও নিয়ন্ত্রণের কথা বললেই আপনি অবাক হচ্ছেন?

উত্তর : হয়েছে। বহু ঘটনাই ঘটেছে। ভারতের সংবিধান নারী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকার করে নিয়েছে। হিন্দু আইনেও ডিভোর্সের অধিকার এসেছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে, বেড়েছে চাকুরে মেয়ের সংখ্যা| সবার উপরে বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি ও হতাশা। রাজনীতিতে এমন বহু লোক এসেছেন যাঁরা দেশের ভালর থেকে নিজের ভালই বেশি বোঝেন। নিজের আখের গোছাতে এইসব রাজনীতিবিদ দেশের যুবশক্তিকে কাজে লাগান। মূল্যবোধ কমেছে। স্বাধীনতার পর সবাইকে দেওয়া হল সমানাধিকার। কিন্তু বেকারি ও এইসব নীতিহীনতায় হতাশা বাড়ল। এরকম অনেক কিছুই ঘটেছে। এসবের জন্যই দৈহিক সম্পর্ক ও বিবাহ বিষয়ে একটা নতুন ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রশ্ন : প্রজাপতি পড়লে কিশোরী মনে কুপ্রভাব পড়বে না- একথাই কী আপনি বোঝাতে

চাইছেন?

উত্তর : আমার মনে হয় এ প্রশ্নের উত্তর আমি আগেই দিয়েছি।

প্রশ্ন : মিঃ বসু, ১৯৬৭-র অক্টোবর থেকে ১৯৬৮-র নভেম্বর পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন?

উত্তর : কেন? ওই সময়ের প্রায় সবটাই কলকাতায় ছিলাম।

প্রশ্ন : তাহলে এবার বলুন তো রকবাজদের সম্পর্কে ধারণা কি?

উত্তর : মেলাই রকবাজ ছেলেকে আমি চিনি না। তবে এরকম এক বা দুজনের সংস্পর্শে এসেছিলাম। প্রথম দিকে তারা খুবই বিরক্তি উৎপাদন করছিল। তারপর যখন তাদের আর একটু বেশি করে চিনলাম, তখন দেখলাম এদের মনগুলি ভাল। একটু সহানুভূতির সঙ্গে ব্যবহার করলেই এদের এদের সমাজে পুনর্বাসন সম্ভব। তখন এদের মনও পাওয়া যায়। তবে সব থেকে বড় কথা কি জানেন, সমাজ এবং পরিবারই রকবাজের জন্মদাতা। যেসব ছেলে রকবাজ হয় তার জন্য তাদের পরিবার দায়ী। দায়ী সমাজ এবং সরকার।

প্রশ্ন : রকবাজ ছেলেরা খুব শিক্ষিত এবং তাদের বেশ উচ্চাশা আছে, এই কি আপনার ধারণা?

উত্তর : ওরা খুব যে একটা লেখাপড়া স্থানে তা আমার মনে হয় না। আমার মনে হয় সমাজ ও সংসারের জনাই এরা বখে গিয়েছে।

প্রশ্ন : যদি বলি প্রজাপতি একটি স্থুল, অশ্লীল এবং কুরুচিপূর্ণ রচনা। এর কোন সাহিত্যিক বা নৈতিক মূল্যই নেই – আপনি অস্বীকার করতে পারবেন?

উত্তর: আমি আপনার একটি কথাও মানতে পারছি না।

প্রশ্ন : আমি আপনাকে বলছি প্রজাপতি শুধুই জীবনের বিকৃত দিকগুলি দেখিয়েছে। মানুষের সামগ্রিক জীবন ও তার আশা-আকাঙ্ক্ষা নয়।

উত্তর : আমি আপনার প্রশ্নের প্রথম অংশের সঙ্গে একমত নই। দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে আমার বক্তব্য, কোনও বই সমগ্র মানব জীবনকে বিধৃত করেছে এটাও ঠিক নয়।

প্রশ্ন : আমি মনে করি সাহিত্যের ভালমন্দ বিচার করার মত কোনও যোগ্যতাই আপনার নেই।

উত্তর : দেশে-বিদেশে বহু লোকেই মনে করেন আমি একজন উচ্চমানের সাহিত্যরসিক। সমালোচক ও সাহিত্যবোদ্ধা। আমিও তাঁদের সঙ্গে একমত।

এ কথায় আদালত শুদ্ধ লোক হো হো করে হেসে ওঠেন। অভিযোগকারীর অ্যাডভোকেট চুপ। বুদ্ধদেববাবুর সাক্ষ্য শেষ।

ডঃ নরেশ গুহর সাক্ষ্য

ডাক পড়ল দ্বিতীয় সাক্ষী নরেশ গুহ তিনিও সমরেশ বসুর পক্ষের সাক্ষী। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে ডঃ গুহ জানালেন তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের প্রধান। বাংলা সাহিত্যও এই কোর্সে পড়ানো হয়। তিনি ১৯৬৬ সাল থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। তিনি যেমন বাংলা সাহিত্য পড়ান তেমনি মাঝে মাঝেই বিভিন্ন সাহিত্য সভায় এবং আকাশবাণীতে সে-সম্পর্কে বক্তৃতাও দেন। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছেন। তিনি বই লিখেছেন দুটি। একটি ইংরেজিতে। একটি বাংলায়। বাংলা বইটির নাম 'দুরন্ত দুপুর'।

সমরেশ বসুর সম্পর্কে ডঃ গুহ বলেন, সাহিত্যিক হিসাবে তিনি তার পরিচিত। তাঁর অনেক বই তিনি পড়েছেন। তিনি একজন শক্তিশালী সাহিত্যিক। ছোটগল্পই হোক বা উপন্যাসই হোক সর্বত্রই লেখকের শক্তিমত্তার ছাপ তিনি প্রস্তুতি পড়েছেন। প্রজাপতিকে অল্লীল মনে করেন না। এই উপন্যাসের কোনও অংশই অশ্লীল নয়, সামগ্রিকভাবে উপন্যাসটি তো নয়ই।

শারদীয় দেশের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা খুলে দেখানো শুরু করলেন আইনজীবী। ১৮১ পৃষ্ঠা অশ্লীল? গুহর জবাব, না অশ্লীল নয়। ১৯৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলম ‘তার জনাই ... অদ্ভুত কাণ্ড।’ - অল্লীল? জবাব এল আমি অশ্লীল মনে করি না। বরঞ্চ নায়ক যা দেখছে তাতে তার ঘৃণাই হচ্ছে। এসব দেখে সে ক্ষুব্ধ, বিদ্রোহী।

প্রশ্ন: মিঃ গুহ, এই অংশে ও উপন্যাসটির অন্যান্য অংশে কোনও 'সাহিত্যিক কৌশল’ আছে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : 'সাহিত্যিক কৌশল' বলতে এমন একটা কিছু বোঝায় যেন তা আরোপ করে দেওয়া হয়েছে। বর্ণিত ঘটনাবলীর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসছে না। এই অর্থে কৌশল কথাটিতে আমি আপত্তি করছি। আমি বলছি এখানে কোনও কৌশলই আরোপ করা হয়নি, সবটাই স্বতোৎসারিত।

প্রশ্ন : ১৭৯ এবং ১৮০ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলম সম্পর্কে আপনার মতামত কী? এটা অল্লীল?

উত্তর : আমি এ অংশকে অশ্লীল মনে করি না। প্রজাপতি উপন্যাসটি সমাজের সমালোচনা এবং সেদিক থেকেই একটি নৈতিক মূল্য তার আছে। উপন্যাসটির সামগ্রিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এ অংশটিও রচিত। আমার ধারণাকে আরও একটু ব্যাখ্যা করছি। মতামতের স্বপক্ষে আমি প্রজাপতি উপন্যাসেরই এই অংশটি 'আপনাদের দেখতে বলছি।

এতদিন শুধু সাক্ষীকেই প্রজাপতি উপন্যাসের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা খুলে লাইনের পর লাইন তুলে প্রশ্ন করা হচ্ছিল সেগুলি অশ্লীল কিনা? না হলে কেন নয়? এবার সাক্ষী নিজেই উল্টে প্রজাপতিকে তুলে ধরলেন। বললেন, এই নিন শারদীয় দেশের ১৮০ পৃষ্ঠা দেখুন। আমিই আপনাদের দেখাচ্ছি সেখানে প্রজাপতি উপন্যাসে কী লেখা হয়েছে— 'দূর্বাঘাসের উপর প্রজাপতিটা আমার বুকের কাছে।’ যে প্রজাপতি প্রেমের প্রতীক এই অংশে লেখক তাকেই উপস্থিত করেছেন। নিজের জীবনে যে প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা নায়ক সুখেন পায়নি। সুখেন পায়নি মার ভালবাসা, বোনেদের স্নেহ মমতা। সারা জীবন ধরে সে তার চারপাশে কাদের দেখেছে? দেখেছে সমাজের এমন সব মানুষকে যারা প্রতিনিয়ত জীবনের মূল মূল্যবোধগুলিকেই নাকচ করে দিচ্ছে।

প্রশ্ন : এই উপনামের নৈতিক উদ্দেশ কী সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হবে?

উত্তর : পড়াশোনা করায় যাঁরা অভ্যস্ত তাঁরা ঠিকই বুঝবেন। যাঁরা জীবনে একটি বাংলা বই পড়েননি তাঁদের কী হবে সেকথা সহজেই বোঝা যায়। তবে আমি এম এ ক্লাসে সাহিত্য পড়াই। আমি এই উপন্যাসটিকে এভাবে দেখেছি—সুখেন মফস্বল শহরের এমন এক যুবক, জীবনে ভালবাসার স্বাদ যে পায়নি।

প্রশ্ন : অল্পবয়সীসের কী প্রতিক্রিয়া হবে

উত্তর : যারা ভালভাবে পড়বে তারা উপকৃত হবে।

প্রশ্ন : এই উপন্যাস পড়ে আপনার মনের ভাব কী হল?

উত্তর : সুখেনের জন্য সহানুভুতি হল। যে সামাজিক পরিস্থিতি তাকে বেখাপ্পা তৈরি করল তাকেও বুঝতে পারলাম।

প্রশ্ন : যেসব ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি কী সুখেনের মানসিক অবস্থা বোঝানোর জন্য দরকার ছিল?

উত্তর: চরিত্রটিকে বোঝানোর জন্য ঠিক ওই ভাষাই দরকার ছিল।

প্রশ্ন : এই উপন্যাস পাঠে পাঠকের মন কি কলুষিত হবে?

উত্তর : সাধারণত সাহিত্য মানুষের নৈতিক অধঃপতনের কারণ হতে পারে না। বিশেষ করে এই উপন্যাস তো নয়ই।

এরপর অভিযোগকারীর অ্যাডভোকেট ডঃ গুহকে জেরায় জেরায় জেরবার করার চেষ্টা শুরু করেন। শারদীয় দেশের ১৭৮ পৃষ্ঠা খুলে বলেন, দ্বিতীয় কলমটি দেখুন, বলুন এটা অশ্লীল কিনা? স্মিত হেসে ডঃ গুহ বলেন --না স্যার।

প্রশ্ন : এটাও অশ্লীল নয়। বেশ, তাহলে এবার ১৭৯ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে লাল কালি দিয়ে দাগানো অংশটি দেখুন। আমি আপনাকে বলছি এটা অশ্লীল। ডঃ গুহ : না স্যার। আপনার এই প্রশ্নে আমি শুধুই কৌতুক বোধ করছি।

প্রশ্ন : তাহলে আরও নিচের দিকে ও নং প্যারাটি দেখুন।

শারদীয় দেশটি তখনও ডঃ গ্রহর হাতে ধরা। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাহিত্যের অধ্যাপক যেন এক আইনজীবীর কাছে সাহিত্যের পরীক্ষা দিচ্ছেন। নির্দেশিত অংশগুলি পড়ে এবারও ডঃ গুহ বললেন, না মহাশয়, এটাও তো অশ্লীল বলতে পারছি না।

প্রশ্ন : বেশ, ১৭৯ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলম এবং সম্পূর্ণ ১৮০ পৃষ্ঠা দেখুন। এখানে লেখক কাকা সম্পর্কের একটি লোকের সঙ্গে মিলনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। বলুন, দেননি কি?

উত্তর : না স্যার। এও তো আপনার কথার সঙ্গে মিলছে না। এখানে কোনও দৈহিক মিলনের বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে বলে আমি মনে করি না। তা ছাড়া ওদের সম্পর্কটাও কাকা-ভাইঝির (জিনা) নয়।

প্রশ্ন : বেশ, ১৮১ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের দ্বিতীয় প্যারাটা পড়ুন তো। পড়েছেন এবার বলুন, এখানে কী স্ত্রীলোকটিকে প্রকাশ্যেই জোর করে ধর্ষণ করা হচ্ছে না।

উত্তর : আমি মনে করি না এখানে প্রকাশ্যে কিছু করা হয়েছে। এ একটি পতিতালয়ের কথা |

প্রশ্ন : মিঃ গুহ, এটা তো আপনি মানবেন যে এসব পড়ে অল্পবয়সীরা গোল্লার যাবে?

উত্তর : সাহিত্য কাউকে অধঃপাতে নিয়ে যায় একথা আমি বিশ্বাস করি না।

প্রশ্ন : যাদের মনে অনৈতিক প্রবণতা বেশি এধরনের লেখা তাদের ক্ষতি করবে—এটা স্বীকার করবেন কি?

উত্তর : কারা সে ধরনের মানুষ যাদের মন কলুষপ্রবন? আমি এরকম লোককে জানি না। তা ছাড়া এ অংশে কাউকে খারাপ করবার মত কিছু নেই।

প্রশ্ন : এ অংশটি না থাকলেও উপন্যাসের কোনও ক্ষতি হত না একথা নিশ্চয়ই মেনে নেবেন?

উত্তর : না, তাও মানতে পারছি না।

এবারে অভিযোগকারীর অ্যাডভোকেট শারদীয় দেশের যে অংশটা খুলে ধরলেন তা একটু ছেঁড়া। তবুও পড়া যায়। তারপর তিনি বললেন, ১৮২ পৃষ্ঠার তৃতীয় প্যারার দ্বিতীয় কলামটি পড়ুন ! বলুন এসব কী কোনও সাহিত্য-কর্ম? এ কোন ধরনের লেখা? এটা

পড়েছেন - এবার নিশ্চয়ই আপনি স্বীকার করবেন যে সুখেন ও জিনার ব্যাপারটি এখানে খুবই পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে?

ডঃ গুহ: কোথায়? দৈহিক সম্পর্ক বলতে যদি ইন্দ্রিয়জ মিলন প্রসঙ্গের কথা বোঝাতে চান, তাহলে বলব সেরকম কিছু এখানে নেই।

প্রশ্ন : এসব অংশ অল্পবয়সীদের বিপথে নিয়ে যাবে তাও কী আপনি স্বীকার করবেন না?

উত্তর : আমি তো আগেই বলেছি সাহিত্য কাউকে অধঃপাতে নিয়ে যায় না। আবার কেন সেকথা?

প্রশ্ন : অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে ও তরুণ-তরুণী বর্তমান সমাজের একটা বড় অংশ এটা কী মানবেন?

উত্তর : নিশ্চয়ই তারা সমাজের একটা বড় অংশ।

প্রশ্ন : এটা কী স্বীকার করবেন যে, কোন উপন্যাসের বিভিন্ন অংশ এক এক শ্রেণী ও বয়সের মানুষকে এক এক ভাবে প্রভাবিত করে?

উত্তর : হ্যাঁ। মনের গঠন ও মানসিক বোধ এখানে একটা বড় ব্যাপার।

প্রশ্ন : মিঃ গুহ, বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণীর মানুষের আর্থিক অবস্থা বুদ্ধি-বিবেচনা শিক্ষা-দীক্ষা আলাদা। যার যেরকম মানসিক গঠন প্রজাপতি উপন্যাস তাকে ঠিক সেইভাবে প্রভাবিত করবে, একথা মানেন?

উত্তর : কোনও বইয়ের প্রভাবই পাঠকের শিক্ষা আর্থিক অবস্থা বা বয়সের উপর নির্ভরশীল নয়। এটা নির্ভর করে পাঠকের চেতনা বুদ্ধি ও মননের উপর। বোধশক্তির উপর।

প্রশ্ন : যে সমাজে আমরা বাস করছি তার যথার্থ রূপটি ফুটিয়ে তোলাই কি লেখকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়?

উত্তর : আমাদের সমাজের যথার্থ অবস্থাটা কী এটা যদি আগে একটু ব্যাখ্যা করে দিতেন তাহলে আমার পক্ষে প্রশ্নটা বোঝাও সহজ হত, উত্তরও সহজেই দিতে পারতাম।

একটু থতমত খেয়ে অভিযোগকারীর অ্যাডভোকেট এবারে বলে ওঠেন, মিঃ গুহ, আমি আপনাকে বলছি আপনি প্রজাপতি পড়েছেন। সোজাসুজি বলুন তো সেখানে আজকের মধ্যবিত্ত সমাজ কি যথাযথ প্রতিফলিত হয়েছে? ডঃ গুহ উত্তর দিতে গেলেন। কিন্তু প্রশ্নকর্তা এ প্রসঙ্গটি নিয়ে আর চাপাচাপি করলেন না। তিনি অন্য প্রশ্নে চলে গেলেন। এবার জিজ্ঞাসা করলেন সাক্ষী নিজে কোনও সাহিত্য সমালোচনার বই লিখেছেন কিনা? ডঃ গুহ বলেন, না স্যার সেরকম কিছু আমি লিখিনি।

প্রশ্নকর্তা আবার ফিরে গেলেন আলোচ্য শারদীয় দেশের প্রজাপতি উপন্যাসে। ওই দেশের ১৮৩ পৃষ্ঠা খুলে বললেন, প্রথম কলমের তৃতীয় প্যারা দেখুন। ডঃ গুহ দেখছেন। অ্যাডভোকেট বলেন— দেখলেন তো, এই যে লেখা হয়েছে 'মেয়ে আমি অনেক ..... তা কত বছর কে জানে?' আপনি কি স্বীকার করবেন, লেখক এখানে শিখাকে একজন পতিতার সঙ্গে তুলনা করতে চেয়েছেন?

অধ্যাপক উত্তর দেন, না মহাশয়। আমার উত্তর আপনার বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে যাচ্ছে। আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না।

প্রশ্ন : মিঃ গুহ, আমি আপনাকে বলছি প্রজাপতি উপন্যাস এবং তার লালকালি দিয়ে দাগানো অংশগুলি সম্পূর্ণ অশ্লীল। অশ্লীল। অশ্লীলতা ছাড়া আর কিছু নয়।

উত্তর : আমি মানছি না।

প্রশ্ন : আমি আপনাকে বলছি প্রজাপতি উপন্যাসের কোনও নৈতিক বা সামাজিক মূল্য নেই।

উত্তর : এর ঠিক উল্টোটাই সত্যি। এই উপন্যাসের ওই দুটি দিকই আছে।

প্রশ্ন : আমি আপনাকে বলছি নীতিবর্জিত কাজকর্মের প্রবণতা যাদের মধ্যে আছে, প্রজাপতি তাদের আরও দুর্নীতিপরায়ণ করে তুলবে।

উত্তর : না। ব্যাপারটা কখনই সেরকম নয়।

প্রশ্ন : আবার আপনার সামনে এই প্রশ্ন রাখছি— প্রজাপতি অল্পবয়সীদের খারাপ করবে কিনা?

উত্তর : আমার বহু ছাত্রছাত্রীই তো প্রজাপতি পড়েছে। কই খারাপ হয়েছে কি? না, তাদের কেউ তো খারাপ হয়নি। যারা পড়েছে তাদের সবারই বয়স ১৮-র উপরে এবং তারা সবাই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

প্রশ্ন : মিঃ গুহ, আমি আপনাকে খুব নির্দিষ্টভাবে বলছি, ১০ থেকে ১৮ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা প্রজাপতি পড়লে খারাপ হয়ে যাবে, আপনি কী বলেন?

উত্তর : আমার একটি ১১ বছরের মেয়ে আছে। সে বই পড়তে বেশ ভালবাসে। আমি প্রজাপতি উপন্যাসটি টেবিলের উপর খোলাখুলিই রেখে দিয়েছিলাম। মনে রাখবেন— আমি এখানে শারদীয় দেশের কথা বলছি না। প্রজাপতি তখন বই হয়ে বেরিয়েছে। সেই বইটিই রাখা ছিল আমার টেবিলে। আমার ১১ বছরের মেয়ে সেটা ছুঁয়েও দেখল না। এতেই বোঝা যায় একেবারে ছোটরা বড়দের উপন্যাস পড়ে না।

এবার অ্যাডভোকেট জিজ্ঞাসা করেন অধ্যাপককে, মিঃ গুহ, তাহলে আমি কি বুঝব যে, এই একটি নির্দিষ্ট ঘটনা থেকেই আপনি সমাজ সম্পর্কে আপনার ধারণার কথা বলছেন? এই একটি মাত্র উদাহরণ থেকেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ছোটরা বড়দের বই পড়ে না?

অধ্যাপক উত্তর দেন, বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হই। বই পড়ে, অভিজ্ঞতায়, বুদ্ধি থেকে, কখনও বা কিছু দেখেই হয় এই সিদ্ধান্ত। আমি শুধু আপনাকে একটি দৃষ্টান্তের কথা বলেছি, তার মানে এই নয় যে 'আমার আর কোনও তথ্য জানা নেই। আমার বক্তব্য, শিক্ষিত লোকেরাই শারদীয় দেশ পড়তে আগ্রহী হবেন। অন্যরা নন।

প্রশ্ন : আপনি কি একথা মেনে নেবেন যে, শারদীয় দেশের মতো একটি ম্যাগাজিন বয়স শিক্ষা ও আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের কাছে অনায়াসেই যেতে পারে?

উত্তর : ওদের প্রচার সংখ্যা আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : মিঃ গুহ, যে কেউই এক কপি এই শারদীয় দেশটি পেতে পারে আশা করি অন্ততঃ এ বিষয়ে আপনি আমাদের সঙ্গে একমত হবেন?

উত্তর : হ্যাঁ। কেউ তা চাইলে নিশ্চয়ই পারবেন।

আবার অ্যাডভোকেট সাহিত্যের অধ্যাপকের কাছে জানতে চান, সাহিত্য কী?

অধ্যাপক জবাব দেন – সাহিত্য হল শব্দে মানুষের অনুভূতি প্রকাশ।

প্রশ্ন : অশ্লীলতা সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

উত্তর : আইনের চোখে কোনটা অশ্লীলতা আমি ঠিক তা বলতে পারব না। আপনার এ প্রশ্নটি কি সাহিত্যের অশ্লীলতা সম্পর্কে না জীবনের?

প্রশ্ন : আমি সাহিত্যে অশ্লীলতা সম্পর্কেই জানতে চাইছি?

উত্তর : আমি এর আগেই আভাসে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। আমি বিশ্বাস করি সাহিত্য হতে হলে অশ্লীল হওয়া চলে না।

প্রশ্ন : প্রজাপতিতে লেখক এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করেছেন বাংলা সাহিত্যে যার ব্যবহার নেই। এটা আপনি স্বীকার করেন?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথও এমন বহু শব্দ ব্যবহার করেছেন যা তাঁর আগে কেউ ব্যবহার করেননি।

প্রশ্ন : আজ ১৯৬৮ সালে বাংলা সাহিত্য তার অতীত ও বর্তমানের প্রথিতযশা লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ। এইসময় প্রজাপতির লেখক সমরেশ বসু এসব শব্দ ব্যবহার করলেন কেন?

উত্তর : সত্যি বলছি আমি আপনার এ প্রশ্নটিই বুঝতে পারলাম না।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন আপনি বুদ্ধদেব বসুকে চেনেন, কতদিন ধরে জানেন তাঁকে।

উত্তর : তা সে অনেককাল। আমি তাঁর ছাত্র ছিলাম, তিনি এক বিরাট সংস্কৃতিমনা মানুষ।

প্রশ্ন : মিঃ গুহ আমি আপনাকে বলছি যেহেতু আপনি বুদ্ধদেব বসুকে চেনেন তাই তাঁর মতের প্রতি সমর্থন জানাতে এখানে সাক্ষ্য দিতে এসেছেন।

উত্তর : আমার নিজস্ব মতামত আছে।

প্রশ্ন: আপনি কী এই আদালতে আসার জন্য কোন সমন পেয়েছেন?

উত্তর: না। কোনও সমন পাইনি।

ডঃ গ্রহর সাক্ষ্যও শেষ হল। তারিখটা ২১-১১-৬৮।

কী করে মামলা এল

টালিগঞ্জের ২২ কুকার লেনের যে অ্যাডভোকেট অমল মিত্রর অভিযোগ থেকে এই মামলা শুরু, কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। তিনি প্রথম আবেদন করেছিলেন ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮। তিনি বলেছিলেন বাংলা সাহিত্যের শুচিতা রক্ষাকে তিনি তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেন। প্রজাপতি অশ্লীল। এ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যকে কলুষিত করেছে। আদালতের কাছে তাঁর আরও আবেদন ছিল কোনও একজন লোকের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে এ মামলা চালানো সম্ভব নয়। এই মামলায় প্রজাপতির পাণ্ডুলিপি পেশ করতে হবে। শারদীয় দেশের যে সংখ্যায় এই অশ্লীল উপন্যাস প্রজাপতি প্রকাশিত হয়েছে সেটা চাই। চাই আরও অনেক নথিপত্র। সুতরাং ন্যায় বিচারের স্বার্থে আদালত যেন কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশকে (ডিসি-ডিডি) এ ব্যাপারে তদন্তের আদেশ দেন।

আবেদনকারী তাঁর পক্ষে আট জন সাক্ষীর নাম দেন। তার মধ্যে সপ্তম সাক্ষী হিসাবে ছিল তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের নাম। ঠিকানা পি ১৭১ টালা পার্ক। অষ্টম সাক্ষী হিসাবে তিনি দিয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের নাম। তাঁরা কেউই অবশ্য তাঁর পক্ষে সাক্ষী দিতে আসেননি।

সাক্ষীর তালিকায় আরও নাম ছিল:

(১) কালোবরণ ঘোষ ১০/১ পি সুইনহো স্ট্রিট, কলকাতা।
(২) সমরেন্দ্রমোহন বসু। ১০/১/এন সুইনহো স্ট্রিট, কলকাতা।
(৩) অমিয়কুমার রায়। ৬১ রামমোহন মুখার্জি রোড।
(৪) প্রভাত চন্দ্র মৈত্র। ৫৭/১ পদ্মপুকুর রোড।
(৫) বৈদ্যনাথ ঘোষ। ৩৫ কাশীপুর রোড।
(৬) শশধর সেন। অ্যাডভোকেট। ৭ আর জি কর রোড।

এর মধ্যে প্রথম দুজন সাক্ষী আবেদনকারীর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে আসেন।

চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে কেসটির নম্বর পড়ে ফৌজদারি কেস নং সি ৩৫৩/১৯৬৮। অমল মিত্র বনাম সমরেশ বসু ও অন্যান্য। চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কুমারজ্যোতি সেনগুপ্ত ১৩ ফেব্রুয়ারি দিন দেন। ওইদিন অভিযোগকারীকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পর ষষ্ঠ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট আর এল মুখার্জির আদালতে বিচারবিভাগীয় তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেন। বিচারক বলেন, ১৯ মার্চের মধ্যে তাঁর কাছে এই তদন্ত রিপোর্ট আসা চাই।

সেই অনুসারে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে কলকাতার ষষ্ঠ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট আর এ মুখার্জির এজলাসে ৬ মার্চ ১৯৬৮, হাজির হলেন অভিযোগকারী অমল মিত্র। বিচারক তাঁর কাছে জানতে চাইলেন কেন তিনি এই অভিযোগ এনেছেন? তিনি জবাব দিলেন, বাংলা সাহিত্যকে তিনি ভালবাসেন। বাংলা সাহিত্যের পবিত্রতা রক্ষাকে তিনি তার পবিত্র কর্তব্য বলে জ্ঞান করেন। তাই আদালতের কাছে তার আর্জি অশ্লীল প্রজাপতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। ১৩৭৪ সালের শারদীয় দেশে বেরিয়েছে তা বাজেয়াপ্ত করুন। নিষিদ্ধ করুন।

তাঁর স্বপক্ষে এলেন বালিগঞ্জের এক বাসিন্দা সমরেন্দ্র বসু। তিনি বললেন ১৩ থেকে ১৯ বছরের ছেলে-মেয়েদের তিনি লাইন করে এই শারদীয় দেশ কিনতে দেখেছেন। প্রজাপতির মতো উপন্যাস এর আগে তিনি দেখেনইনি। এই উপন্যাস ইন্দ্রিয়াসক্তির কথায় ভরপুর। এরকম অশ্লীল উপন্যাস যদি বাজারে চালু থাকে তাহলে দেশের যুবশক্তির ভবিষ্যৎ ভেবে তিনি শঙ্কিত হচ্ছেন।

এই বক্তব্যের সমর্থনে এগিয়ে এলেন বালিগঞ্জের এক ব্যবসায়ী কালোবরণ ঘোষ। তিনি বললেন, প্রজাপতি উপন্যাস পড়ে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা গোল্লায় যাচ্ছে। কোথায় গেল মানুষের মাধুর্য! প্রেম, ভালবাসা এসব কথার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুকুমার বৃত্তিগুলিই

হারিয়ে যাচ্ছে। তারই ফলে প্রেমিক প্রেমিকার বুকে ছুরি মারতে দ্বিধা করছে না। কখনও প্রেমিকার মুখে অ্যাসিড ঢেলে দিচ্ছে। কখনও বা ব্লেড দিয়ে পেট চিরে ফেলছে।

এরপর বিচারক মুখার্জি সেদিনই মন্তব্য করেন যে, তিনি শারদীয় দেশে প্রজাপতি উপন্যাসটি পড়েছেন। তাঁর মতে এই উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে দৈহিক মিলনের যেসব বর্ণনা আছে তা রচনার নৈতিক বা সামাজিক মূল্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এমনভাবে এগুলি লেখা হয়েছে, যেন মানুষের মনে কামনার ইন্ধন যোগানই তার উদ্দেশ্য। এছাড়া গোটা উপন্যাসটিতেই মাত্রা ছাড়িয়ে এমন সব বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে যা আমাদের সমাজে অচল। এ উপন্যাসের কোনও সামাজিক মূল্যও নেই। সুতরাং আমার সামনে যা তথ্য পেশ করা হয়েছে তাতে আপাতগ্রাহ্য কেস দাঁড়াচ্ছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ধারায় প্রথম অভিযুক্ত (সমরেশ বসু) এবং ২৯২/১০৯ ধারায় দ্বিতীয় অভিযুক্ত (সীতাংশু কুমার দাশগুপ্ত)র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হল।

ষষ্ঠ আদালতের এই আদেশ এল চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কুমারজ্যোতি সেনগুপ্তর এজলাসে। ২৯ মার্চ ১৯৬৮ তিনি আদেশ দিলেন প্রজাপভির লেখক সমরেশ বসু ও শারদীয় দেশের প্রকাশক এবং মুদ্রাকর সীতাংশু কুমার দাশগুপ্তর বিরুদ্ধে সমন জারি করা হোক। ২৪ মে ১৯৬৮ তাঁদের দুজনকেই আদালতে হাজির হতে হবে।

সমরেশ বসু তখন থাকেন নৈহাটিতে। তাঁর উপর আদালতের সমন জারি করা গেল না। ২৪ মে ১৯৬৮ দেশ পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক সীতাংশু কুমার দাশগুপ্ত আদালতে হাজির হলেন। জামিনের আবেদন জানালেন। আদালত তাঁকে এক হাজার টাকার জামিনে মুক্তি দিলেন। বিচারক তাঁর আদেশে বললেন, প্রথম অভিযুকে (সমরেশ বসু) সমন জারি করা যায়নি বলে অফিসার রিপোর্ট দিয়েছেন। বলা হয়েছে তিনি এখন থাকেন নৈহাটিতে। তাঁর উপর নতুন করে সমন জারি করা হোক : সমন যাবে অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত নতুন ঠিকানায়। ৬ জুলাই ১৯৬৮ তাঁকে হাজির হতে হবে।

চব্বিশ পরগনার জেলাশাসক মারফৎ সমরেশ বসুর উপর এবার সমন জারি হল। অভিযোগকারীর আবেদন মত কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দফতরের ডিসি (ডিসি-ডিডি)র উপরও যথাকর্তব্য করার নির্দেশ দিলেন আদালত।

সমরেশ বসু জামিনে মুক্ত

১৯৬৮ সালের ৬ই জুলাই প্রজাপতি মামলায় লেখক সমরেশ বসু ব্যাঙ্কশাল কোর্টে হাজির হলেন। তার পক্ষে জামিনের আবেদন করা হল। চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কুমারজ্যোতি সেনগুপ্ত তাঁকে এক হাজার টাকা জামিনে মুক্তির আদেশ দিলেন। পরবর্তী শুনানির দিন পড়ল ৭ আগস্ট ১৯৬৮। সেদিন তাকে হাজির হতে হবে। ডিসি-ডিডির রিপোর্টও আসবে। জামিন নিয়ে সমরেশ বসু বেরিয়ে এলেন।

পরের পর তারিখ পড়তে পড়তে অভিযোগকারীর সাক্ষ্য শুরু হল ১৬ই অক্টোবর ১৯৬৮।

সমরেশ বসুও হাজির। তাঁর পক্ষে দাঁড়িয়েছেন ব্যারিস্টার করুণাশঙ্কর রায়। দেশ পত্রিকার প্রকাশক এবং মুদ্রাকর সীতাংশু কুমার দাশগুপ্তও হাজির। দুজনের পক্ষে আরও আছেন ব্যারিস্টার এস এন ভৌমিক, অ্যাডভোকেট জানশঙ্কর সেনগুপ্ত, অ্যাডভোকেট সমর বসু। অভিযোগকারী অমল মিত্রর পক্ষে প্রধান আইনজীবী অ্যাডভোকেট তপেন রায়চৌধুরী। ফরিয়াদিদের দিকে আরও ছিলেন হরেন্দ্রকিশোর সিং, বিনয়ভূষণ দত্ত ও কমলেশ মিত্র।

আইনবিদে, সাহিত্যিকে, অধ্যাপকে সেদিনের ব্যাঙ্কশাল কোর্টে চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কুমারজ্যোতি সেনগুপ্তর আদালতে বসে যেন এক বিদ্বজ্জন সভা। আইনের আওতা থেকে মাঝে মাঝেই বেরিয়ে এসে শুরু হয়ে যায় সাহিত্য-বিতর্ক।

অভিযোগকারী অমল মিত্র আসেন কাঠগড়ায়। তিনি বলেন, আমি কলকাতা হাইকোর্টের একজন তরুণ অ্যাডভোকেট। নিবাস টালিগঞ্জের ২২ কুকার লেন। আমি প্রজাপতির লেখক সমরেশ বসু এবং সাপ্তাহিক দেশের মুদ্রাকর ও প্রকাশক সীতাংতকুমার দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছি। দেশ সাপ্তাহিক পূজোর সময় প্রতিবছর শারদীয় সংখ্যা বের করে। এবছর ১৩৭৪ (বাংলা) -এর শারদীয় দেশে প্রজাপতি উপন্যাস বেরিয়েছে। প্রজাপতি প্রকাশিত হয়েছে এই শারদীয় দেশের ১৭৫ পৃষ্ঠা থেকে ২২৬ পৃষ্ঠার মধ্যে। আদালতে দেশের ওই সংখ্যাটি পেশ করা হয়েছে। তিনি বলেন, যাঁদের বিরুদ্ধে এই মামলা তাঁরা দুজনেই এজলাসে হাজির আছেন।

তিনি সমরেশ বসু ও সীতাংশু কুমার দাশগুপ্তকে সনাক্ত করেন।

তারপর বলেন, আমি শারদীয় দেশে প্রজাপতি পড়েছি। প্রজাপতির কোনও সাহিত্যিক মূল্য নেই। এটি নিছক একটি অশ্লীল রচনা : আমি বাংলা সাহিত্যের একজন পাঠক। বাংলা সাহিত্যের পবিত্রতা ও শুচিতা রক্ষা করাকে আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি।

আমার অভিযোগ প্রজাপতি অশ্লীল। আমি প্রজাপতির বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছি, কারণ এর কোনও সাহিত্যিক মূল্য নেই। আমি প্রজাপতিকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করছি কারণ ছেলে বুড়ো যুবক কিশোর যে-ই এই উপন্যাস পড়ুন না কেন তাঁরই নৈতিক অধঃপতন হবে। প্রজাপতি পড়ে আমার ধারণা হয়েছে এই উপন্যাস নিশ্চয়ই পাঠককে দুর্নীতিপরায়ণ করবে। মহামান্য আদালতের সুবিধার জন্য আমি অতি অশ্লীল অংশগুলি লাল কালি দিয়ে দাগিয়ে দিয়েছি।

অভিযোগকারী এরপরও বলতে থাকেন, আমি মনে করি প্রজাপতি কোনও পরিবারের সকলের পড়া উচিত নয়। আমি অবিবাহিত। আমার যদি কোনও ছেলেমেয়ে থাকত তাহলে নিশ্চয়ই আমি তাদের হাতে এই অশ্লীল প্রজাপতি তুলে দিতাম না। আমি আমার ভাইবোনেদেরও প্রজাপতি উপন্যাস পড়তে দিতে লজ্জা পাই। দেশ খুব বেশি প্রচারিত হয়। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ দেশ পড়েন। আমার পক্ষে যাঁরা সাক্ষ্য দেবেন তাঁদের নাম আমি মূল আবেদনের সঙ্গে দিয়েছি।

অভিযুক্তদের পক্ষে বলা হল এদিন তাঁরা জেরা করবেন না। জেরা মুলতুবি রইল। ফেরা অভিযোগকারী অমল মিত্র আবার সাক্ষীর কাঠগড়ায় এলেন ১৮ অক্টবর ১৯৬৮। জেরার জবাবে এদিন তিনি বললেন, তাঁর বয়স ৩২। ১৯৬২ সালে তিনি ওকালতি পাশ করেছেন।

পাঁচ বছর তিনি একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করেছেন। তিনি বি-কমও পাশ।

প্রশ্ন : বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে কি আপনার আগ্রহ আছে?

উত্তর : আমি বাংলা সাহিত্যের একজন পাঠক তবে তেমন কোনও বিশেষ আগ্রহ নেই।

কাদের বই তিনি পড়েছেন, কোন কোন সাহিত্যিকের নাম শুনেছেন এসব প্রশ্নের জবাবে অমলবাবু বলেন, আমি অচিন্ত্য সেনগুপ্তকে জানি একজন বড় লেখক। তাঁর বইও দেখেছি। তবে তাঁর 'বেদে' আমি পড়িনি। প্রবোধকুমার সান্যালকেও জানি। তিনিও মস্ত বড় লেখক। তবে, না, আমি তো তাঁর কোনও বই পড়িনি। 'যাযাবর' ও পড়িনি।

প্রশ্ন: তাহলে কী পড়েছেন? কাকে জানেন?

উত্তর আমি বুদ্ধদেব বসুকে জানি। তিনিও খ্যাতিমান সাহিত্যিক। না, আমি তাঁরও কোনও বই পড়িনি। 'এরা ওরা আর আরও অনেকে' এরকম কোনও বইয়ের নামই শুনিনি। অন্নদাশঙ্কর রায়ের কথাও আমি শুনেছি। তাঁরও কোনও বই পড়িনি। দেশে প্রকাশিত তাঁর কিছু কিছু রচনা হয়ত দেখেছি। তাঁর 'আগুন নিয়ে খেলা' আমি পড়িনি। 'বেদে', 'যাযাবর', 'এরা ওরা আর আরও অনেকে' এবং 'আগুন নিয়ে খেলা' সরকার নিষিদ্ধ করেছিলেন। অশ্লীল বলেই এগুলি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

প্রশ্ন: বইগুলির প্রচার বন্ধ করা হয়েছিল কি?

উত্তর : প্রচার বন্ধ করা হয়েছিল কিনা আমার জানা নেই। পরবর্তীকালে সরকার নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছিলেন কিনা তাও জানি না। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গণদেবতা বইয়ের জন্য জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছিলেন, তা আমি জানি। তবে কোন সালে তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল তা আমি জানি না। তবে গণদেবতা আমি পড়িনি।

সমরেশ বসু প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ১৩৭২ বাংলা সনের শারদীয় দেশে বিবর নামে তাঁর একটা রচনা বেরিয়েছিল তা তিনি শুনেছেন। তবে পড়েননি। তিনি দেশপত্রিকার গ্রাহক।

প্রশ্ন : আপনি বলছেন প্রবন্ধ। প্রবন্ধ ও উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্য কি তা আপনি জানেন?

উত্তর : প্রবন্ধ ও উপন্যাসের পার্থক্য আমি বুঝি। তবে প্রজাপতি প্রবন্ধও নয় উপন্যাসেও নয়। এ লেখায় সুখেন্দুকে একজন মস্তান এবং গুণ্ডা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব পড়ে সুখেন্দু সম্পর্কে আমার ঘৃণাই জন্মেছে। আমি তার কাজকর্মও সমর্থন করতে পারছি না। সুখেন্দুকে নাকি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ব্যবহার করেছে। আমি চাই না যে, সমাজে সুখেন্দুর মত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হোক। আমি এও চাই যে রাজনৈতিক দলগুলি যে এতো নিচে নেমে না যায় যাতে সুখেন্দুরা বেড়ে ওঠে। এজন্যই মামলা করেছি। মামলার খরচও আমি নিজেই বহন করছি।

প্রশ্ন : আপনি তো প্রজাপতি পড়েছেন?

উত্তর : হ্যাঁ পড়েছি।

প্রশ্ন : আপনার চরিত্র ঠিক আছে তো?

উত্তর : আমি প্রজাপতি পড়লেও তা কোনও মতেই আমার নৈতিক অধঃপতন ঘটাতে পারেনি।

তাঁর সমর্থনে সাক্ষী দেন বালিগঞ্জের সুইনহো স্ট্রিটের এক ইঞ্জিনিয়ারিং জিনিসের ব্যবসায়ী কালোবরণ ঘোষ। তিনি সাক্ষী দিতে আসেন ১৭ অক্টবর ১৯৬৮। তিনি বলেন তাঁর ইঞ্জিনিয়ারিং জিনিস তৈরির ব্যবসা আছে। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আছে আগ্রহ। তিনি বিবাহিত। তাঁর মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। তাঁর ছেলে পড়ে কলেজে। তিনি এর আগে কখনও অভিযুক্তদের দেখেননি। তবে এদিন আদালতে ওদের দেখেছেন। ওদের এখনই চিনলেন। শারদীয় দেশে (১৩৭৪) প্রকাশিত প্রজাপতি তিনি পড়েছেন। সমরেশ বসু তার লেখক। সীতাংশু কুমার দাশগুপ্ত এই দেশ পত্রিকার প্রকাশক ও মুদ্রাকর।

প্রজাপতি পড়ে তাঁর ধারণা হয়েছে, এ একেবারে অশ্লীল জিনিস। এসব পড়ে যুবকেরা

গোল্লায় যাবে। টাকা রোজগার ছাড়া এ লেখার আর কোনও উদ্দেশ্য নেই। ছেলেমেয়ের হাতে তো এ লেখা দেওয়াই যায় না।

পরদিন তাঁকে জেরা করলেন সমরেশ বসুর আইনজীবী। জেরার জবাবে তিনি বললেন-- শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখা তিনি পড়েছেন। তাঁদের কোনও লেখাই অশ্লীল নয়। বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধ সান্যাল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তরা যেসব বই লিখেছেন তার সব তিনি পড়েননি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লেখার ধারা, সাহিত্যের ধারা বদলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে অশ্লীলতা বিচারের মানও পরিবর্তিত হয়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধ সান্যাল এঁরা হলেন কল্লোল যুগের লেখক। তাদের বই যখন প্রকাশিত হয়েছিল তখন যে সমাজে বেশ আলোড়ন দেখা দিয়েছিল তাও তিনি জানেন। তাঁরা সমাজের চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাতেই অতটা আলোড়ন হয়েছিল।

তাঁর সাক্ষ এখানেই শেষ হল। ফরিয়াদি পক্ষ যদিও আট জন সাক্ষীর নাম দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা আর সাক্ষী আনবেন না বলে আদালতকে জানালেন। চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সেনগুপ্ত পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করলেন ৯ নভেম্বর। আদেশে বলা হল, সেদিন যদি ফরিয়াদি পক্ষ অন্য কোনও সাক্ষী আনতে চান তবে আনবেন। ওই সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও জেরা দুইই চলবে। তাছাড়া সেদিনই গৃহীত হবে অভিযুক্তদের সাক্ষ্য।

৯ নভেম্বর ফরিয়াদী পক্ষ আর কোনও সাক্ষী আনলেন না। অভিযুক্ত লেখক সমরেশ বসু উঠলেন কাঠগড়ায়। ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪২ ধারা অনুযায়ী তাঁকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি শুনিয়ে দেওয়া হল।

বিচারক কুমারজোতি সেনগুপ্ত তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, অভিযোগকারী আপনার বিরুদ্ধে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তা আপনি শুনেছেন। ফরিয়াদি পক্ষ বলেছেন ১৩৭৪ বাংলা সনের শারদীয় দেশে আপনি প্রজাপতি নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন। আপনি কিছু বলবেন?

সমরেশবাবু : হ্যাঁ, আমি লিখেছি।

সেনগুপ্ত : ফরিয়াদি পক্ষ বলেছেন ওই উপন্যাস অশ্লীল। এ সম্পর্কে আপনি কি কিছু বলবেন?

সমরেশবাবু: আমি মনে করি না যে ওই উপন্যাস অশ্লীল।

সেনগুপ্ত : আপনার কি আর কিছু বলার আছে?

সমরেশবাবু: হ্যাঁ, বলার আছে। আমি পরে লিখিত বিবৃতি পেশ করব।

সেনগুপ্ত : আপনি কি আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনও সাক্ষী আনবেন?

সমরেশবাবু : হাঁ।

সমরেশ বসুর বিবৃতি

সমরেশবাবু ১৬ নভেম্বর ১৯৬৮ তাঁর লিখিত বিবৃতি দাখিল করলেন। সেই বিবৃতিতে তিনি বললেন—প্রজাপতি উপন্যাসকে তিনি কোনও দিক দিয়েই অশ্লীল বলে মনে করেন না। আজকের মধ্যবিত্ত সমাজ যে প্রচণ্ড যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমান সমাজ সম্পর্কে লিখতে আমি আগ্রহী হয়েছিলাম। আজকের দিনের একজন ঔপন্যাসিকের কর্তব্যই আমি পালন করেছিলাম।

আমাদের সমাজজীবনে সুখেন এক বিরাট সমস্যা। সমাজে তাদের উপস্থিতি উপেক্ষা করা যায় না। তাদের সংখ্যাও দিনকে দিন বাড়ছে। শহর, আধা শহর ও শিল্পাঞ্চলে তারা আগাছার মতো বেড়ে উঠছে। বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মানুষের ছত্রছায়াতেই তারা বেড়ে উঠছে। এটাও মনে রাখতে হবে যে সুখেনের মতো ছেলেরা আমাদের পরিবার এবং আমাদের সমাজ থেকেই বেরিয়ে আসছে। সুখেনকে আমি যতটা সম্ভব বাস্তবসম্মত করতে চেষ্টা করেছি। পাঠকের যাতে তাকে চিনতে অসুবিধা না হয় সেটাই ছিল আমার মুখ্য প্রয়াস। উপন্যাসটি লেখা হয়েছে তারই মুখের ভাষায় যাতে তাকে বুঝতে অসুবিধা না হয়, তার বৈশিষ্ট্য, তার সব কিছু হুবহু ফুটে ওঠে।

আত্মপক্ষ সমর্থনে অন্যান্য বক্তব্যে আসার আগে আমি আরও কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার করে নিতে চাই। যদিও উপন্যাসটির ঘটনাবলী চব্বিশ ঘন্টার কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে সুখেনের গোটা জীবনই পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। কারণ তার জীবনের অতীতের অন্যানা ঘটনা তার মনে পড়ে গিয়েছে। মন বর্তমান থেকে অতীতে অবাধে বিচরণ করতে পারে। যে কোনও একটি ঘটনা দেখতে দেখতে পুরোন বহু বিষয়ই মনে আসে। কিন্তু এসব ঘটনা একেবারে যুক্তিবিহীন নয়, অনর্থক নয়।

যেমন উপন্যাসটি শুরুই হয়েছে একটি প্রজাপতি ধরার চেষ্টা দিয়ে। প্রজাপতি সৌন্দর্যের প্রতীক। তাকে ধরতে ব্যর্থ হয়ে মেরে ফেলা হল। এখানে প্রজাপতির প্রতীকটির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। উপন্যাসের শেষে সুখেনকে দেখা যাচ্ছে একটি বোমা বিস্ফোরণে হাত ভাঙা অবস্থায়। এক সময় সুখেনও ছিল সরল, ওই প্রজাপতির মতোই সুন্দর, নিরীহ। শেষদিন পর্যন্ত জীবন সম্পর্কে কতগুলি চিন্তা তার মধ্যে থেকে গিয়েছে। যেমন একজন শিক্ষকের জীবন—সং ও সরল। এই জীবনধারা সুখেনকে অনুপ্রাণিত করেছে। সেও একজন শিক্ষক হতে চেয়েছে। তার বর্তমান জীবন থেকে মুক্ত হয়ে খেটে খাওয়া এক মানুষ হিসাবে বাঁচতে চেয়েছে। শিখাকে নিয়ে সে ঘর বাঁধতে ব্যগ্র হয়েছে। কিন্তু কারখানা ম্যানেজার তা চান না। তিনি চান সুখেন মস্তান হিসাবেই থাক। তাকে তিনি কাজ দিতে চান না।

প্রতীকের কথা ছেড়ে দিলেও সুখেনের চিন্তাগুলি পরস্পর যুক্ত। তাদের একটা পারম্পর্য রয়েছে। যেমন জিনা। প্রজাপতিটাকে মেরে ফেলার পরই সুখেনের মাথায় জিনার স্মৃক্তি চলে আসে। সে ভাবে, জিনা একটি বখা মেয়ে। জিনার সঙ্গে সঙ্গেই আসে পিকনিক পার্টির স্মৃতি। একগাদা মেয়ে পুরুষ একত্র হয়ে যে হুল্লোড় হয় তার কথা। তার মনে পড়ে এইসব লোকেরা যারা তাকে গুণ্ডা বলেই মনে করে তারাই আবার তাকে সম্মানও দেখায়। আর তাদের ঘরের মেয়েরাই তাকে প্রেম নিবেদনও করে। এসব ঘটনা তাকে ক্ষেপিয়ে তোলে। গোটা ব্যাপারটার প্রতিই তার অসন্তোষ জেগে ওঠে। নিজেকে অসহায় মনে হয়। মনে হয় সে যেন ওদের পোষা কুকুর।

এরই সঙ্গে ভার মনে আসে মেয়েদের প্রতি আসক্তির কথা। একটি ছবির বইয়ের স্মৃতি —যেখানে আছে উলঙ্গ মেয়ের ফটো। তার রূপ ফেটে পড়ে। কিন্তু আবার তার মন চলে আসে প্রজাপত্তি ও জিনার স্মৃতিতে। জিনা যেভাবে এগিয়ে এসেছিলো তারপর একটা দুর্ঘটনা ঘটল, প্রজাপতিটিও ঠিক এক ধাক্কায় পড়ে গেল। জিনা যখন ব্যথায় ছটফট করছিল তখন সুখেন তাকেও এভাবেই সেবা করেছিল। কখনও প্রচণ্ড ক্রোধ কখনও মমতায় এসব স্মৃক্তি

তার মনে আসতে থাকে। সুখেন ভাবে প্রজাপতিটি সুন্দর এবং তাকে মেরে ফেলায় শিখা দুঃখ পাবে। এখানেও তার সন্দেহ। কেননা শিখার, ভালবাসা সম্পর্কেই সে সন্দিহান। সঙ্গে সঙ্গে তার জেদ বেড়ে যায়। মিল কোয়ার্টারের জীবনধাবা তাদের অভারতীয় আচার আচরণের জন্য সুখেন ওদের বলে 'বাংরেজ'। সে তাদের খারাপই মনে করে।

অতি দ্রুত আবার তার মন শিখার দিকে ফিরে আসে। তার মনে পড়ে যায় শিখার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা। সে শিখাকে ভালবাসে। কিন্তু শিখার বাবা ও বড় ভাই শিখাকে নিজেদের প্রয়োজনে লাগাতে চার। এতে সুখেন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। অতৃপ্তি ও অসাফল্যে সে উত্তেজিত হয়, বেদনাবোধ করে। কারণ প্রেমের ব্যাপারে সে অসহায়। যখনই ভালবাসার কথা মনে আসে তখনই শিখার কথাই তার মনে হয়। আর কাউকে সে চায় না। অথচ শিখাকেও সে পায় না। এই বেদনাবোধ, এই হতাশার জন্যই সমস্ত বিষয়ে তার রাগ ফেটে পড়ে।

এভাবেই তার মা বাবা দাদাদের কথা মনে আসে। মনে আসে সে জীবনে ভালবাসা পায়নি। কারও ভালবাসা নয়। তাদের গোটা পরিবারের সবাই ছিল এমন আত্মকেন্দ্রিক যে তারা প্রত্যেকেই একে অন্যের থেকে আলাদা। মাকে সে ভালবাসত। মার মৃত্যুতে পেল প্রচণ্ড আঘাত।

বাবার দুর্নীতি, দাদাদের দলীয় রাজনীতি, রাজনীতিকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার করা- সব কিছু সুখেনের মনকে তিক্ত করে তোলে। সে বেখাপ্পা হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে অবাধ্য। জীবন সম্পর্কে বিতস্পৃহ। এই উপন্যাস তার জীবনের শেষ চব্বিশ ঘণ্টার কাহিনী। এখন তার চলন-বলন কথাবার্তা পোশাক-আশাক সব কিছুতেই সে পুরোদস্তুর এক মস্তান। সবকিছু মিলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে এ এক সামগ্রিক চিত্র। একটির থেকে আর একটিকে আলাদা করা যায় না। কোনও সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ এধরনের চরিত্রদ্বারা প্রভাবিত হন না। বরঞ্চ এরকম জীবনযাত্রার প্রতি মানুষের একটা বিতৃষ্ণাই জাগে। সুখেনের জীবনে শান্তি নেই। এত অবিশ্বাস, এত ঘৃণা, এত রাগ, সব সত্ত্বেও মাঝে মাঝে সুখেনকে এক অজানা ভয় যেন পেয়ে বসে। এ আর কিছুই নয়। তার মনের ভিতরে যে একটি সাধারণ সৎ ব্যক্তি আছে এটা তারই প্রমাণ।

এই অন্ধকারের জীবন কেউ চায় না। সাধারণ মানুষ এই অসুখী, অতৃপ্ত জীবনদ্বারা কিছুতেই প্রভাবিত হবেন না। একটি কথা উল্লেখ করলে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বা কেনও যুব সভা অথবা আলোচনা চক্রে যখনই আমি প্রশ্ন করেছি— আপনারা কেউ কি সুখেন হতে চান? কেউ রাজি হননি। সুতরাং আমি বলছি প্রজাপতি উপন্যাস অশ্লীল নয়। এই উপন্যাস কোনও স্বভাবিক মানুষের ক্ষতি করবে না। বরঞ্চ যাদের বিপথে যাবার সম্ভাবনা আছে তারা সাবধান হবে।

প্রজাপতি সুরুচি ও সৌন্দর্যবোধ কে আঘাত করে না। বিপরীতে মানুষকে সচেতন করে তোলে। চারদিকে যে সমাজ রয়েছে তাকে বুঝতে সাহায্য করে। একটি উদাহরণ দি কালীপ্রসন্ন সিংহর হুতুম প্যাঁচার নকশা' সমাজের একটি অন্ধকার চিত্র। সমাজের কঠোর সমালোচনাও করা হয়েছে এই নকশায়। তবুও এটি সাহিত্য। একই সুরে বলা যায়, প্রজাপতি উপন্যাসে সাহিত্যিক গুণ সম্পূর্ণ বর্তমান।

৯ নভেম্বর ১৯৬৮। এইদিনই শারদীয় দেশ (১৩৭৯)- এর মুদ্রাকর এবং প্রকাশক সীতাংশু দাশগুপ্তর সাক্ষ্য গৃহীত হল।

বিচারক তাকে প্রশ্ন করলেন, ফরিয়াদি পক্ষ থেকে যেসব সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে আপনি তা শুনেছেন। সুতার্কিন স্ট্রিটে অবস্থিত আনন্দ প্রেস থেকে ১৩৭৪(বাংলা) শারদীয় দেশ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। সেই দেশে প্রজাপতি উপন্যাস প্রকাশিত। আপনি সেই দেশের মুদ্রাকর ও প্রকাশক।

উত্তর: হ্যাঁ। কিন্তু আমি নির্দোষ।

প্রশ্ন : অভিযোগকারী বলেছেন উপন্যাসটি অশ্লীল, আপনি কিছু বলবেন?

উত্তর : এ অভিযোগ সত্য নয়।
প্রশ্ন: আপনি কি আর কিছু বলবেন?
উত্তর : না।
প্রশ্ন: আপনি কি কোনও সাক্ষী আনবেন?
উত্তর : না।

বুদ্ধদেব বসুর সাক্ষ্য শুরু হয়েছিল এর পরের শুনানিতে, ১৬ নভেম্বর। ডঃ নরেশ গুহর ১৮ নভেম্বর। তাঁদের সাক্ষ্যের কথা আগেই বলা হয়েছে। ওই সাক্ষ্য শেষ হবার পর ২৮ নভেম্বর ১৯৬৮ দু পক্ষের সওয়ালের দিন ধার্য হল।

২৮ নভেম্বর সমরেশ বসুর পক্ষে সওয়াল করতে উঠলেন ব্যারিস্টার করুণাশঙ্কর রায়। সেদিনও যথারীতি আদালত ভিড়ে ঠাসা দুই অভিযুক্তই হাজির।

তিনি বলেন—সমাজের প্রকৃত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক উপন্যাসকে বিচার করতে হবে। সেই বিচারে প্রজাপতি অশ্লীল নয়: ভারতীয় সাহিত্যের মানও এখনে লঙ্ঘিত হয়নি। খোলাখুলি কতগুলি চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। যারা আমাদের বর্তমান সমাজের অঙ্গ। সমাজের যথাযথ প্রেক্ষাপটে তাদের চরিত্রকে প্রকাশ করা হয়েছে। এর কোনও অংশই অশ্লীল নয়। মহৎ সৃষ্টির মধ্যে অশ্লীলতার রেশ দেখা যেতে পারে কিন্তু সেটা কখনও প্রকট হয়ে ওঠে না। সাহিত্য ও শিল্পের উৎকর্ষতায় তা ঢাকা পড়ে যায়।

সমাজ-চিত্রকে তো তুলে ধরতে হবে। সমাজে যা আছে, বাস্তব বর্ণনায় তা এসে পড়া নিশ্চয়ই প্রাসঙ্গিক। শিখার প্রতি সুখেনের ভালবাসা ছিল অকৃত্রিম। এই ভালবাসাই তাকে স্বাভাবিক জীবনে উত্তরণের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।

যে জিনার কাহিনী নিয়ে এতকথা এখানে বলা হল সেই জিনা তো একটি বিশেষ সমাজেরই অঙ্গ। সুখেন সে সমাজকে ঘৃণা করে—সেটা প্রজাপতি উপন্যাসে স্পষ্ট দেখানো হয়েছে। প্রজাপতি থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিয়ে এখানে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে ওগুলি অশ্লীল। বেশ, আমিও অন্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

এরপর তিনি রামায়ণ, মহাভারত থেকে উদ্ধৃতি দিতে থাকেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের খানিক অংশ তুলে ধরেন। বলেন জয়দেবের গীতগোবিন্দের কথা। তিনি বলেন প্রাচীনকালে যে সব কাব্য গাথা রচিত হয়েছিল, কালের গন্ডী পেরিয়ে তা হাজার বছর ধরেও আমাদের সাহিত্যে শিল্পে রস সিঞ্চন করতে পারে। তাকে বাদ দেবেন কী করে? এখানের প্রজাপতি উপন্যাসের যে অংশগুলি তুলে তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলি অশ্লীল নয়। লেখক সতর্কতার সঙ্গে বহু মার্জিত শব্দও প্রয়োগ করেছেন।

বাধা দিয়ে বিচারক সেনগুপ্ত প্রশ্ন করেন, সমাজে বাস্তবে যেসব সুখেন আছে প্রজাপতি উপন্যাসের সুখেন চরিত্রটি তাদের হাতে গেলে ফল কী হবে?

উত্তর : বাস্তবে কোনও প্রবৃদ্ধি সম্পন্ন সুখেন নিশ্চয়ই ওরকম হবে না। এরপর আবার তিনি বলতে থাকেন, সুখেন তো একটি অবস্থার শিকার। আসলে সে ভাল ছেলে। ঘটনাচক্রে অবস্থার বিপাকে বিগড়ে গিয়েছে।

সওয়ালের মাঝে আইনজীবী ওথেলোর থেকেও খানিকটা বলে যান। তারপর বলেন, বিভিন্ন দেশের সমাজ বিভিন্ন রকম। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, মধ্যপ্রাচ্য কারো সঙ্গে কারও তুলনা চলে না। তেমনই মিল নেই আমাদের সমাজচিত্রের সঙ্গে ওদের। প্রজাপতিতে জিনা চরিত্রকেও উপস্থিত করা হয়েছে তার সমাজের পটভূমিকায়।

আবার বাধা দিলেন বিচারক সেনগুপ্ত। তিনি বললেন, জিনার চরিত্র স্বভাবিকভাবে চিত্রিত হয়নি। অসামাজিক পরিবেশে সে বড় হয়েছে। একটি সাধারণ নিরীহ মেয়ে কারও দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

উত্তর : কিন্তু কোনও অসামাজিক পরিবেশে জিনার জন্ম নয়। -- এরপর আবার তিনি প্রজাপতির অংশ বিশেষ পড়ে বলেন, এ উপন্যাস একটি মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি। শুরুটিও যেমন

চমৎকার শেষও তেমনি সুন্দর।

বিচারক সেনগুপ্ত প্রশ্ন করেন, এখানে লেখা হয়েছে 'গা ঘামে না'-এর অর্থ কি?

উত্তর : গা ঘামে না মানে ওরা কোনও কাজ করে না। এমন একটা সমাজে ওরা রয়েছে যেখানে ওদের কোনও পরিশ্রমই করতে হয় না।

বিচারক প্রশ্ন করেন, আপনি বলতে চান এই উপন্যাস যুবকদের মনে কোনও প্রভাব বিস্তার করবে না?

না, তা করবে না। এই উত্তর দিয়ে আবার তিনি বলতে শুরু করেন- - এই উপন্যাসেই দেখা গিয়েছে বিতর্কিত জিনার মনেও শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন হয়। প্রজাপতি উপন্যাসে কলুষ কোনও বিষয় নেই।

এবার বিচারক সেনগুপ্ত বলে ওঠেন, কিন্তু প্রজাপতি উপন্যাস তো কামনার কথাতেই ভরপুর। দৈহিক মিলন ভিত্তিক উপন্যাস। এই সময় আদালতে চাপা হাসির শব্দ উঠতে থাকে।

আইনজীবী বিচারকের প্রশ্নের জবাবে আবারও বলেন, না, মিলন সম্পর্ক এ উপন্যাসের ভিত্তি নয়। জিনা কাহিনীতে কাকুর চরিত্রটি এক বিশেষ ধরনের মানুষের প্রতিনিধি।

আবার বিচারক বাধা দিলেন। বললেন, তাই বলে পতিতাদের নিয়ে খোলাখুলি লেখা ঠিক নয়।

উত্তর : এ উপন্যাসে তো তেমন কিছু নেই। এরপর তিনি বলেন—অশ্লীলতার ছুঁৎমার্গের জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অস্বীকার করার চেষ্টা ঠিক নয়। কেননা প্রজাপতি আধুনিক সমাজের প্রতিচ্ছবি। তাকে সেই পারিপার্শ্বিকেই বিচার করতে হবে।

সওয়াল অসমাপ্ত থাকে। ২৯ নভেম্বর দেশ পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক সীতাংশুকুমার দাশগুপ্তর অ্যাডভোকেট এস এন বসু বলতে শুরু করেন। তিনি বলেন, এই মামলায় সাক্ষী দিয়েছেন সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু। তাঁর মত একজন সাহিত্যসেবীর বক্তব্য অতি মূল্যবান। তিনি বলেছেন, নানাভাবে তাঁর অভিমত দিয়েছেন যে প্রজাপতি উপন্যাস অশ্লীল নয়। তাঁর সাক্ষ্য অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থনে এক মূল্যবান দলিল।

অভিযুক্তদের পক্ষে বলা শেষ হল এই দ্বিতীয় দিনে। ২৯-১১-৬৮-তে। এদিনই ফরিয়াদিদের পক্ষের সওয়াল শুরু হয়। অভিযোগকারী অমল মিত্রর অ্যাডভোকেট তপেন রায় চৌধুরী বলেন, প্রজাপতি উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে দৈহিক সম্পর্কের বিষয়কে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ উপন্যাস যে অশ্লীল তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

তাঁর বক্তব্য শেষ হবার আগেই এদিনের মতো আদালতের কাজ শেষ হয়। পরবর্তী দিন পড়ে ২ ডিসেম্বর ১৯৬৮। সেদিন সমরেশ বসু হাজির হতে পারেননি। আদালতের কাছে তাঁর পক্ষে আবেদন জানিয়ে বলা হয় তাঁকে যেন তাঁর অ্যাডভোকেট এস এন ভৌমিক মারফৎ হাজির থাকতে দেওয়া হয়। চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কুমারজ্যোতি সেনগুপ্ত সে আবেদন মঞ্জুর করেন। সমরেশ বসুকে ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি দেন।

২ ডিসেম্বর ১৯৬৮ অ্যাডভোকেট রায় চৌধুরী আবার তাঁর সওয়াল শুরু করেন। তিনি বলেন, জিনার চরিত্র একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। লেখক ইচ্ছা করেই জিনা কাহিনী আমদানী করেছেন। আদিরসাত্মক কার্যকলাপের বর্ণনার দ্বারা কম বয়েসীদের বিপথে চালিত করার জন্য। যুব শক্তিকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে গিয়েই লেখক ক্ষান্ত থাকেননি, অশ্লীলতার আকর্ষণ বাড়ানোর জন্যই জিনা কাহিনীর অবতারণা করেছেন। উত্তেজক বর্ণনাগুলি দিয়েছেন এমনকি উপন্যাসটির অলংকরণও অশ্লীল।

দুটি অলঙ্করণ তিনি আদালতে পেশ করেন। তারপর বলেন, প্রজাপতি গোটা উপন্যাসটি অশ্লীল না বললেও অংশবিশেষ তো নিশ্চয়ই অশ্লীল। উপন্যাসটির কোথাও বিধিসম্মত বিবাহের কথা আছে? না, নেই। দৈহিক সম্পর্কের যেসব বিষয় আনা হয়েছে—বর্ণিত হয়েছে অতি সবিস্তারে সেগুলিই কি বাস্তব? ওসব মোটেই বাস্তব নয়। উদ্দেশ্য একটিই, আদিরসাত্মক রচনায় পাঠককে আকর্ষণ করা। এর মধ্যে মহৎ উদ্দেশ্য, মহৎ সাহিত্যকর্মটি

কোথায়?

তিনি প্রশ্ন তোলেন, বলুন তো জিনা, প্রভু, পরিচারিকার মেয়ে, সুখেন কেউ কি বাস্তব? কোনও চরিত্রর মধ্যে বাস্তবতার লেশমাত্র নেই। সবকটি চরিত্রই অদ্ভুত অস্বাভাবিক। সাহিত্যের নাম করে লেখক যা উপস্থিত করেছেন তা অবাস্তব। অসত্য। বিকৃত।

এখানেই এদিনের শুনানি শেষ হল। পরবর্তী দিন পড়ল ৩ ডিসেম্বর ১৯৬৮। সেদিন তিনি আরও বললেন, এ উপন্যাস মানুষকে উচ্ছন্নে দেবে। যে কোনও বয়সের লোকই প্রজাপতি পড়ুন না কেন তাঁরই বিপথগামী হবার আশঙ্কা আছে। একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করব, সমরেশ বসু অতি শক্তিশালী লেখক। সেজন্যই তো বলব তাঁর আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

তাঁর বলা শেষ হলে সমরেশ বসুর পক্ষের আইনজীবী আদালতের কাছে আবেদন জানান প্রজাপতি উপন্যাসটিকে যেন কোনও অংশ ধরে বিচার করা না হয়। অংশ নয়, বিচার করা হোক সামগ্রিকভাবে।

বিচারক সেনগুপ্ত বলেন, অবশ্যই, সেভাবেই দেখা হবে। এখানেই শেষ হল দুপক্ষের চার দিনের সওয়াল জবাব। দু পক্ষই দু দিন করে বললেন। বিচারক বললেন : রায় ১১-১২-৬৮।

রায়ের দিনটি ছিল লেখক সমরেশ বসুর জন্মদিন। নির্দিষ্ট সময়ের একটু আগেই তিনি আদালতে এসেছেন— পরনে ধূসর পাঞ্জাবি। গায়ে শাল। আরও এসেছেন বহু নামী সাহিত্যিক সাংবাদিক। তরুণ-তরুণীরা এমন ভিড় করেছেন যে রায় দানের আগে সর্বদাই মনে হচ্ছিল কোনও গোলমাল না হয়, তা হয়নি।

ভিড়ে ঠাসা আদালতে কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কুমারজ্যোতি সেনগুপ্ত যখন এসে বসলেন তখন বেশ চাঞ্চল্য। ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ অভিযোগ দায়ের করার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি ; বিভিন্ন তারিখে মামলার শুনানি ও সাক্ষ্যে এই দশ মাসে যে চাঞ্চল্য ধাপে ধাপে বেড়ে গিয়েছে, আজ তা চরমে।

প্রতীক্ষার এই চূড়ান্ত পর্যায়ে বিচারক ঘোষণা করলেন: সমরেশ বসু দোষী। দোষী সীতাংশুকুমার দাশগুপ্তও। প্রজাপতি উপন্যাস অশ্লীল। আমি তার লেখক সমরেশ বসু ও শারদীয় দেশ (১৩৭৪) পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক সীতাংশুকুমার দাশগুপ্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করলাম। সাজা ২০১ টাকা করে জরিমানা। অনাদায়ে দু মাস কারাদণ্ড। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলেই ওই শারদীয় দেশের ১৭৪ থেকে ২২৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নষ্ট করে ফেলতে হবে।

রায়

রায়টি ১৪ পৃষ্ঠা টাইপ করা। বিচারক সেনগুপ্ত ধীরে ধীরে তা পাঠ করছেন। আদালত কক্ষ নিঃশব্দ। উৎকর্ণ। এক ঘণ্টা লাগল রায় পাঠ করতে। এই মামলা, এক নম্বর অভিযুক্ত সমরেশ বসু লিখিত এবং দুই নম্বর অভিযুক্ত সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত প্রজাপতি উপন্যাসকে কেন্দ্র করে। ফরিয়াদি পক্ষের অভিযোগ উপন্যাসটি অশ্লীল। এই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ধারা মতে চার্জ আনা হয়েছে। এই উপন্যাস ১৩৭৪ শারদীয় দেশে প্রকাশিত।

অভিযুক্তরা এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তাঁরা বলেন সংশ্লিষ্ট উপন্যাসটি কোনও মতেই অশ্লীল সাহিত্য নয়।

বিচার্য বিষয়টি বোঝার জন্য উপন্যাসটির ঘটনাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাক : এ উপন্যাসের নায়ক সুখেন। এ যুবক এমন একটি পরিবারে মানুষ হয়েছে যেখানে প্রেম ভালবাসার লেশমাত্র ছিল না। তিন ছেলে ও স্বামীকে রেখে সুখেনের মা মারা যান। সুখেনের দুই দাদাই মতলববাজ। তারা রাজনীতি করে। বিভিন্নভাবে মানুষকে ব্যবহার করে ঠকায়। সুখেনের বাবার কোনও মূল্যবোধ নেই। যেনতেন প্রকারেণ টাকা রোজগার ছাড়া তিনি আর কিছুই জানেন না।

এই পারিপার্শ্বিকে সুখেন বড় হয়। সে হয়ে ওঠে এক বেপরোয়া যুবক। বড়দের প্রতি বা মেয়েদের প্রতি যার কোনও সম্মানবোধ নেই। প্রতিবেশীরা বিশেষ করে ধনীরা তাকে ভয় করে। কলেজের ছাত্রাবস্থায়ই সুখেন মদ ও মেয়েতে আসক্ত হয়। সে অবশ্য শিখা নামে একটি কলেজ ছাত্রীর প্রতিও আকৃষ্ট হয়। শিখা গরীব ঘরের মেয়ে। সুখেনের হতাশ ও বেপরোয়া জীবনে শিখার সান্নিধ্য কিছুটা শান্তি এনে দেয়। জীবনের হতাশার জন্য সুখেনের মধ্যে যে মানব চেতনা সুপ্ত ছিল শিখার স্পর্শ ও সান্নিধ্য তাকে জাগিয়ে তোলে।

ভণ্ডামীকে সুখেন ঘৃণা করে। যেসব রাজনৈতিক নেতা মানুষকে ঠকিয়ে ও শোষণ করে বাঁচে, যেসব শিক্ষক নিজেদের নেতৃত্ব কায়েম রাখার জন্য ছাত্রদের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি করে, কারখানার যে মালিক এবং ম্যানেজার শ্রমিকদের বঞ্চনা করে, যেসব বাবা মা তাদের ছেলেমেয়েদের দেখে না এবং ভদ্রবেশী যেসব শয়তান নিজেদের মেয়ের বয়সী মেয়ের সঙ্গেও লালসা চরিতার্থ করতে পিছপা হয় না–সুখেন তাদের সবাইকে ঘৃণা করে। পতিতাদের উপর অসভ্য মার্কিন সৈন্যদের বর্বর আচরণকেও সে ঘৃণার চোখে দেখে। এই বর্বরতাকে সে ভয়ও পায়। সমাজের এইসব ঘটনায় বীতশ্রদ্ধ সুখেন শিখার সঙ্গে পরিচয়ের পর একটা ভদ্র শান্ত জীবনের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ঠিক সেই সময়ই সে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের শিকার হয়—গুরুতরভাবে আহত সুখেন মারা যায়। এটাই সুখেন চরিত্রের করুণ দিক—যখন সে সবে ভালভাবে বাঁচতে চাইছে তখনই তাকে মরতে হল।

সংক্ষেপে এই হল গল্প। উপন্যাসের যে অংশগুলি অশ্লীল বলে অভিযোগ আনা হয়েছে সেগুলি যথাসময়ে বর্ণিত হবে। অভিযোগকারী - উপন্যাসটির জায়গায় জায়গায় লাল কালির দাগ দিয়ে দিয়েছেন। অভিযোগ সমগ্র উপন্যাসটি তো বটেই, বিশেষ করে এই দাগানো অংশগুলি অবশ্যই অশ্লীল।

এখন প্রশ্ন হল দাগানো অংশগুলি এবং উপন্যাসটি অশ্লীল কি না? এই মামলায় এটিই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এজন্যই এই বিষয়ে অনেকটা সময় ব্যয় হয়েছে। আইনে অশ্লীলতার কোনও সংজ্ঞা ঠিক করে দেওয়া হয়নি—অসুবিধাটা এখানেই। তবে অশ্লীলতা সম্পর্কে ইংলণ্ডে বহু আদালতে বিচার হয়েছে। ১৮৬৮ সালে ইংলণ্ডে কেয়ার আর বনাম হিকলিন মামলায় বিচারপতি বললেন, অশ্লীলতা কাকে বলব? অশ্লীলতা বলে যে লেখার বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে সেই লেখা যদি অনৈতিক প্রভাবে পড়তে পারে এমন মানুষের মনকে কলুষিত ও দুর্নীতিপরায়ণ করে তবেই তাকে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলব। অনৈতিক প্রভাবে পড়তে পারে এমন লোকের হাতে লেখাটি সহজেই পড়ে এমন 'অবস্থাও থাকা চাই।

ভারতেও এই নীতিই মেনে চলা হয়। এ ধরনের মামলার বিচারের জন্য এই নীতিই একশ বছর ধরে অনুসরণ করা হচ্ছে। আমাদের দেশের নৈতিক মান বা অন্য কোনও বিষয়ে কিছু পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু অশ্লীলতার বিচারে এই মূল নীতি অপরিবর্তিত। এই নীতি নির্ধারিত হয়েছিল ১৮৬৮ সালে। তার মানে এই নয় যে ১৯৬৮ সালে কোন মামলার বিচার করতে বসলে আমাদের সমাজকেও ঠিক ওই ১৮৬৮ সালেই টেনে নিয়ে যেতে হবে। বরঞ্চ এক্ষেত্রে আমাদের কাজ খুবই সহজ। বিচার করে দেখতে হবে যাদের মনে অনৈতিক ও দুর্নীতি খুব সহজেই ছাপ ফেলতে পারে আলোচ্য উপন্যাসটি তাদেরকে সেইভাবে নৈতিক অধঃপতনে নিয়ে যাচ্ছে কিনা?

এই মতবাদের সমর্থনে মেলাই মামলার উল্লেখ করার দরকার নেই। আমাদের সুপ্রিম কোর্টে রঞ্জিৎ ডি উদেশী বনাম মহারাষ্ট্র সরকারের মামলায় প্রসঙ্গটির বিচার হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন হাইকোর্ট যে মত দিয়েছেন এবং উপরে যে নীতির কথা বলা হল তাই সমর্থিত হয়েছে। এপ্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে : অশ্লীল বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে নিশ্চয়ই বিচার করতে হবে। কিন্তু অশ্লীল বিষয়কে আলাদা আলাদা করেও দেখা দরকার। দেখতে হবে, ওই লেখা অপরিণতদের নৈতিক অধঃপাতে নিয়ে যেতে সাহায্য করে কিনা? এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সমসাময়িক সমাজের স্বার্থ, বিশেষ করে তার উপর বইটির কী প্রভাব পড়তে পারে তাও দেখতে হবে।

একটি দিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বছরের পর বছর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রাণহীন প্রভাবের পর অধুনা আমাদের জাতীয় এবং আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যগুলি নতুন নতুন চিন্তায় ও সৃষ্টিতে সম্পদশালী হয়ে উঠছে। এইসময় কোনও অশ্লীল বইকে যদি এই আদালত রক্ষা কবচ দেয় তাহলে তা আমাদের সমগ্র সাহিত্যের পথে বিপদ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ অশ্লীলতা লাভজনক। সত্যিকারের শিল্পকলার জনসমর্থন কম। সুতরাং সেক্ষেত্রে এই আদালতের রক্ষাকবচ নিয়ে অশ্লীল সাহিত্যই সবাইকে ছাপিয়ে যাবে।

যেখানে অশ্লীলতা ও শিল্প এক হয়ে গিয়েছে সেখানে শিল্পধর্মকে এত প্রবল হতে হবে যে সে যেন অশ্লীলতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে। অর্থাৎ সত্যিকারের শিল্পই অশ্লীলতার থেকে বড় হয়ে উঠবে।

বাক্ ও প্রকাশ স্বাধীনতাকে অবশ্যই শালীনতার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে। সামাজিক উদ্দেশ্য ছাড়া অশ্লীলতা আমাদের দেশে অচল। সাংবিধানিক রক্ষাকবচ সে দাবি করতে পারে না।

সুপ্রিম কোর্টের ওই রায় অনুসারে আমাদের বিচার করে দেখতে হবে আলোচ্য উপন্যাস (প্রজাপতি) অশ্লীল কিনা? অভিযুক্তদের সমর্থনে বলা হয়েছে উপন্যাসটি অশ্লীল নয়।

তাঁদের পক্ষে বুদ্ধদেব বসু এবং ডঃ নরেশচন্দ্র গুহর মত দুজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক এবং অধ্যাপক সাক্ষ্য দিয়েছেন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে তাঁরা খুব উঁচুদরের পণ্ডিত ও সাহিত্যিক। বুদ্ধদেব বসু সবার পরিচিত। সবাই তাঁর কিছু কিছু মতের সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন, কিন্তু একজন শক্তিশালী লেখক হিসাবে তিনি সবার শ্রদ্ধার পাত্র।

এখন প্রশ্ন হল, তাঁদের সাক্ষ্যের উপর কতটা গুরুত্ব দেওয়া যায়? অভিজ্ঞ বর্ষীয়ান পাঠক হিসাবে তাঁরা এমন একটি স্তরে উঠে গিয়েছেন যে কারও লেখার দোষ ত্রুটি তাঁদের চোখে পড়ে না। প্রতি লেখাতেই তাঁরা শিল্পের সন্ধান পান। এবং সেই মুহূর্তে ভুলে যান ওই দায়িত্বজ্ঞানহীন লেখা সমাজের কী দারুণ ক্ষতি করতে পারে।

তা ছাড়া এধরনের মামলায় বিশেষজ্ঞের কোনও মূল্য নেই। কোনও বই অশ্লীল কিনা তা বিচার করতে হবে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ধারা অনুযায়ী। কোনও বিশেষজ্ঞের মতামত দিয়ে নয়। উপরে উল্লেখিত সুপ্রিম কোর্টের রায়েও মাননীয় বিচারপতিরা এই অভিমতই প্রকাশ করেছেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করে দেখতে হবে প্রজাপতি উপন্যাসটিকে একটি সাহিত্য কীর্তি হিসাবে গণ্য করা হবে? না অশ্লীল বলে বাতিল করা হবে? অশ্লীল এজন্য যে, এই

উপন্যাসে দেহজ সম্পর্ককে শালীনতা বর্জিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে কামনার ভাবই জাগে।

আগেই বলা হয়েছে যে, এই মামলায় সাক্ষ্যের খুব একটা মূল্য নেই। তাই এ ব্যাপারে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে না। এই উপন্যাস পঞ্চাশ বছর পরে নৈতিক বই হিসাবে স্বীকৃতি পাবে বুদ্ধদেব বসু এমন ভবিষ্যৎবাণীও করেছেন। আদালত এধরনের ভবিষ্যৎবাণীর উপর নির্ভর করতে পারে না। পঞ্চাশ বছর পর সমাজের কী অবস্থা হবে কেউ বলতে পারেন না। আজকের দিনের সামাজিক অবস্থা নিয়েই আমাদের কারবার।

অভিযুক্তর আইনজীবী প্রথমে বলেন, এই উপন্যাসকে অশ্লীল বলা চলে না। তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য হল, উপন্যাসটিকে যদি অশ্লীল বলে গণ্য করাও হয় তাহলেও সে রক্ষাকবচ দাবি করতে পারে। কারণ এখানে সাহিত্য ও শিল্পই প্রাধান্য পেয়েছে, তাদের প্রভাবে অশ্লীলতা চাপা পড়ে গিয়েছে। তিনি একথাও বলেছেন যে, এই উপন্যাসে আদর্শবাদ, মতামত যেমন আছে তেমনি আছে বহু তথ্যও। সেগুলি জনস্বার্থে প্রয়োজনীয়। উপন্যাসটি অশ্লীল বলে বিবেচিত হলেও জনস্বার্থে তাকে ছাড় দেওয়া হোক।

তাঁর যুক্তি হল লেখক এখানে কালোবাজারী, মুনাফাবাজ, তথাকথিত দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিবিদ ও ভণ্ডদের আক্রমণ করেছেন। একথা সত্যি যে এরকম একটা চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও প্রশ্ন থেকেই যায় এই উপন্যাসে কি সাহিত্যের দিকটি এতই প্রধান হয়ে উঠেছে যে তা অশ্লীলতাকে আচ্ছন্ন করেছে?

আমি এ উপন্যাস বহুবার পড়েছি। দুঃখিত, আমার কিন্তু সেরকম ধারণা হয়নি। আমি তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারছি না।

ফরিয়াদি পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এই উপন্যাসে সাহিত্য বা শিল্পের কোনও ব্যাপারই নেই, এ নিছকই অশ্লীলতা। অভিযুক্তর পক্ষে বলা হয়েছে, এই উপন্যাসটি যে অশ্লীল নয় তা বুঝতে হলে আমাদের বর্তমান সমাজকে উপলব্ধি করতে হবে। তাঁর মতে কোনও সমাজের নৈতিক বোধ যুগের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। দেশ কালের সঙ্গে সে চলে। বিভিন্ন দেশে ও কালে তার বিভিন্ন মান। অতীত সাহিত্যের ইতিহাস থেকেই এই পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা যায়।

অভিযুক্তর আইনজীবী কতগুলি সমৃদ্ধ সাহিত্যের উদাহরণ দেন। গীতগোবিন্দ, দীনেশ সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, কৃত্তিবাসের রামায়ণ—উত্তরখণ্ড, কুমারসম্ভবের কিছু অংশ। আমি বুঝতেই পারছি না কেন এসব বইয়ের এ অংশগুলির উদ্ধৃতি দেওয়া হল? ওইসব উদ্ধৃতি দিয়ে একথাই বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে, ওই ক্ল্যাসিক গ্রন্থেও বিভিন্নভাবে দৈহিক সম্পর্কের বর্ণনা আছে। দুঃখের বিষয় যে উদ্দেশ্যে ওইসব গ্রন্থে এ অংশগুলি সন্নিবেশিত হয়েছিল তা তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। তাছাড়া ওইসব গ্রন্থের বর্ণনাগুলি সত্ত্বেও সাহিত্যে দৈহিক সম্পর্কের উপস্থাপনা ও তার বিবরণ নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে।

প্রাচীন সাহিত্যের যেসব উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেগুলি ধর্মের কারণে আইনে সুরক্ষিত। ওই বই ছাড় পেয়েছে অতএব আলোচ্য উপন্যাসও পার পেয়ে যাবে—এটা হয় না। এবং এভাবে যে রক্ষাকবচ পাওয়া যায় না সেটা আইনের একটি স্বীকৃত নীতি।

সুতরাং অভিযুক্তর আইনজীবীর এযুক্তি মানা গেল না।

এবার লালকালি দিয়ে দাগানো অংশগুলির খানিকটা পরীক্ষা করা যাক। আগেই বলা হয়েছে উপন্যাসটি আমি বার কয়েক পড়েছি। পড়েছি খোলা মন নিয়ে। স্ল্যাং শব্দ সব সময়ই অগ্রাহ্য করতে হবে তাও মনে করছি না। একথাও মনে রেখেছি উপন্যাসটির কোনও কোনও অংশ অশ্লীল হলেও সহ্য করে নিতে হবে। এ সত্যও সর্বজনবিদিত যে সব অশালীন লেখাই অশ্লীল নয়। তবে সব অশ্লীল লেখাই অশালীন। অশালীন কথাটি অশ্লীলতার থেকে একটু নরম। অশ্লীলতা অশালীন তো বটেই তবে তার উপরে আরও কিছু। অশালীন বিষয়ে মানুষ বিরক্ত হতে পারে কিন্তু কামার্ত হবে না। দুর্নীতিপরায়ণ হবে না। কিন্তু অশ্লীল সাহিত্য মানুষের মনে কামভাব জাগাবে। তাকে নৈতিক অধঃপতনে নিয়ে যাবে।

এবার দেশ পত্রিকার জনপ্রিয়তার দিকটি দেখা যাক। অভিযুক্তর সাক্ষীই বলেছেন দেশ পত্রিকা বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের মধ্যে বহুল প্রচারিত। তাহলে ধরেই নেওয়া যেতে পারে, সাড়ে তিন টাকা দামের এই বইটি সহজেই সবার হাতে যেতে পারে। সুতরাং আমি মনে করি উঠতি বয়সের ছেলেমেয়ে, অপরিণতবুদ্ধি মানুষ——সবাই এটি পড়তে পারে।

এবার আসা যাক উপন্যাসটির 'আপত্তিকর' অংশগুলির দিকে। উদাহরণ হিসাবে বলছি জিনার কাহিনীর কথা। শারদীয় দেশের (১৩৭৪) ১৭৯ থেকে ১৮২ পৃষ্ঠার মধ্যে আছে। অশ্লীলতার জ্বলন্ত নিদর্শন। এটা বড় জোর শালীনতা বর্জিত—এটুকু বলে এর অশ্লীলতার অপরাধ ঢাকা যায় না। আমি মনে করি অপরিণত মনের কাছে এ কাহিনীর প্রভাব হবে কদর্য। তা তাদের বিপথে নিয়ে যাবে। মানুষের মনে কামনা জাগাবে। যতশীঘ্র এরকম লেখার প্রকাশ বন্ধ করা যায় ততই মঙ্গল। আমাদের সমাজে যত পরিবর্তনই হোক, যতই পাশ্চাত্য প্রভাব আসুক, কোনও বিচারেই সমাজ এধরনের রচনা সহ্য করবে না।

অভিযুক্তর আইনজীবী বলার চেষ্টা করেছেন জিনার উপাখ্যানে খারাপ কিছু নেই। এখানে বর্ণনাগুলি খুবই সাহিত্যিক গুণে সমৃদ্ধ। এখানে দৈহিক মিলনের কোনও বর্ণনা নেই। ১৮২ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও তিনি বলেন ওখানেও সেরকম কিছু নেই—ও, জিনার কলিক পেন হয়েছিল। আমি বুঝতে পারছি না কী করে তিনি একথা বললেন? কলিক পেনের গল্পের আশ্রয় তাঁকে নিতে হল কারণ তা নাহলে তিনি ওই অংশটিকে অশ্লীলতার দায় থেকে বাঁচাতে পারেন না। 'তা সম্ভব নয়। উপন্যাসে বহু জায়গায় অশ্লীলভাবে জিনার শরীরের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

একথা বলার চেষ্টা হয়েছে যে এই উপন্যাসে দৈহিক সম্পর্কের ইঙ্গিতগুলি খুবই আবছা। শিল্প ও সাহিত্যরসই প্রধান। আমি এমত মানতে পারছি না। বরঞ্চ আমি মনে করি লেখক খুব বেছে বেছে শব্দ চয়ন করেছেন। প্রতি ছত্রে প্রতি কলমে কৌশলে এসব শব্দকে বসিয়েছেন। উদ্দেশ্য একটিই—অপরিণত বুদ্ধির পাঠকদের আকর্ষণ করা।

এই উপন্যাসে সাহিত্যের ভূমিকা একেবারেই গৌণ। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাহিত্য রস সৃষ্টির বদলে শুধুই আদি রসাত্মক বর্ণনা। অভিযুক্তর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে উপন্যাসটির পরিকল্পনা তার উদ্দেশ্য ও ভিত্তিটাও বিচার করতে হবে। উপন্যাসটির মূল ভিত্তি কিছু থাকতে পারে। এতে ভণ্ডামি এবং অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া রাজনীতিকদের সম্পর্কে সমালোচনা করা হয়েছে। অতি আধুনিক মায়েরা যারা ছেলেমেয়েদের দেখেন না তাদের সম্পর্কে কটূক্তিও আছে। কিন্তু এগুলি অতি প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে। অতি গৌণ। সুখেন চরিত্রকে আদর্শ হিসাবে খাড়া করার চেষ্টা হচ্ছে। সেজন্য দিতে হচ্ছে বিস্তর যুক্তি। শিখা চরিত্র সম্পর্কেও ওই একই কথা। সাদামাঠাভাবে পড়লে সুখেন ও শিখার সম্পর্কে সহানুভূতিই জাগবে। কিন্তু তা এই উপন্যাসকে উন্নত করে তুলবে না।

সমরেশ বসু একজন শক্তিশালী লেখক। তিনি এই চরিত্রগুলিকে নিজের মনের মতো করে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কতগুলি স্ল্যাং এবং অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহারে তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে এজন্য যে তিনি এমন কতগুলি দৃশ্যের অবতারণা ও বর্ণনা করেছেন যা আমাদের সমাজে অচল।

অভিযুক্তর দ্বিতীয় সাক্ষী ডঃ নরেশ গুহ বলেছেন তাঁর বহু ছাত্রছাত্রী এই উপন্যাস পড়েছেন। কিন্তু তাঁরা কেউ খারাপ হয়ে যায়নি। কিন্তু তাদের বয়স ১৮-র উপরে। তারা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলেছেন তাঁর ১১ বছরের মেয়ে এই বই পড়েনি। কেউ যদি এই উপন্যাস না পড়ে তাহলে বলার কিছুই নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল যদি ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সের কোনও ছেলেমেয়ে এই উপন্যাস পড়ে তাহলে কী হবে?

এই মামলার বিচার করতে গিয়ে উপন্যাসটি মন দিয়ে কয়েকবার পড়ে আমার ধারণা হয়েছে যে উপন্যাসটি যে ভাষায় যেভাবে লেখা হয়েছে কোনও মা-বাবাই এটি তাঁদের ছেলেমেয়েদের হাতে দিতে পারবেন না।

এই প্রসঙ্গে দেশ শারদীয় সংখ্যার (১৩৭৪) ১৭৮ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের কিছু অংশের

উল্লেখ করছি। কোন উদ্দেশ্যে লেখক এসব অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন? অস্বাভাবিক অপরাধের ঘটনা আমদানী করেছেন? এই বিশ্রী শব্দগুলো কেন যে আনলেন তাও বোঝা যায় না? উপন্যাসটির সঙ্গে এর প্রাসঙ্গিকতাই বা কোথায়? বলা হয়েছে সুখেন একটি গুণ্ডা। রাস্তার ছেলে। বেশি লেখাপড়া শেখেনি। ভদ্র রুচিও নেই। সুখেন ওরকম টাইপ হতে পারে কিন্তু লেখকের তো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। লেখকের জানা উচিত ছিল যে সুখেনের গল্প লোহার সিন্দুকে তালাবন্ধ থাকবে না। পাঠকের প্রতিও লেখকের একটা কর্তব্য আছে। লেখকের, নিশ্চয়ই অবাধে লেখার স্বাধীনতা আছে কিন্তু সমাজের প্রতি তাঁর দায়িত্বও তিনি এড়িয়ে যেতে পারেন না। ভয়, ভীতি ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত অবস্থায় তিনি নিশ্চয়ই লিখবেন কিন্তু সমাজের কথাও ভুললে চলবে না।

লেখকের স্বাধীনতা বড়। সমাজের প্রতি কর্তব্যও বড়। এইজন্যই আইনের মাধ্যমে লেখকের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে।

এই অবস্থায় আমার সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত : সামাজিক বা মহৎ আদর্শের জন্য লিখছি এ অজুহাতে কোনও সাহিত্যিককে ভাষা বা লেখায় ইতরামির আশ্রয় নিতে দেওয়া হবে না। শারদীয় দেশের (১৩৭৪) ১৭৯ পৃষ্ঠা থেকে ১৮১ পৃষ্ঠা সম্পর্কে আমার মত : এ অংশে আমি সাহিত্যের কোনও উপাদানই খুঁজে পেলাম না। এ শুধুই অশ্লীলতা—আমাদের সমাজ কখনই সহ্য করবে না। ১৮১ পৃষ্ঠায় যেভাবে কাহিনী আনা হয়েছে তাও অপ্রাসঙ্গিক।

কোন লেখক কীভাবে লিখবেন কী লিখবেন তা নিশ্চয়ই আদালত বলে দিতে পারে না। তবে উপন্যাসের কোনও অংশ অপ্রাসঙ্গিকভাবে শুধু পাঠক আকর্ষণ ও টাকা রোজগারের মতলব নিয়ে সন্নিবেশ করা হয়েছে কিনা তা দেখার সম্পূর্ণ অধিকার আদালতের আছে।

১৮৬ পৃষ্ঠায় লেখক যেভাবে শিখার শরীরের বর্ণনা দিয়েছেন, কিম্বা ১৮৯ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের প্রথম প্যারায় সুখেনদের পরিচারিকার মেয়ের যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন অথবা কৃষ্ণা ও অধ্যাপক রামকৃষ্ণবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে সুখেনের দাদার যে সম্পর্কের কথা বলেছেন তাতে মনে হয় শৃংখলাপরায়ণ সমাজের শালীনতার প্রতি লেখকের কোনও শ্রদ্ধা নেই। ২১২ পৃষ্ঠায় সুখেনের যে কাজকর্মের কথা এসেছে, সঙ্গে যে ছবি দেওয়া হয়েছে তা নিঃসন্দেহে দৈহিক ক্রিয়াকলাপের ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

২১৩ পৃষ্ঠার প্রথম কলমেও ওই একই জিনিস। ২২০ পৃষ্ঠায় সুখেনের সঙ্গে শিখার সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। সেখানেও কামনার প্রাধান্য। লেখক সুখেনের সঙ্গে মঞ্জরীরও বেশ একটা এলোমেলো সম্পর্কের কথা এনে ফেলেছেন। ২২৩ পৃষ্ঠায় সুখেন ও মঞ্জরীর মধ্যে এই সম্পর্কের দিকটি ফুটে উঠেছে।

এসব দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট হয় যে এই উপন্যাসের সবকিছুর, সমস্ত ঘটনার, বর্ণনার একটি মাত্রই লক্ষ্য—কামনার উচ্ছৃঙ্খলতা। উপন্যাসের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা আর বাড়াবো না। আপত্তিকর অংশগুলি মোটা করে লালকালি দিয়ে দাগানোই আছে। শারদীয় দেশ (১৩৭৪ প্রজাপতি) এই অংশগুলি অশ্লীল এই আমার অভিমত।

অভিযুক্ত পক্ষ যুক্তি দিয়েছেন এই উপন্যাসে শিল্পের দিকটি এত প্রধান যে অশ্লীলতা কিছু থেকে থাকলেও শিল্পের প্রভাবে তা ঢাকা পড়ে গিয়েছে। আমার মতে ব্যাপারটি ঠিক তার বিপরীত। অভিযুক্তদের তরফে এ যুক্তিও দেওয়া হয়েছে যে উপন্যাসটি সমাজের খারাপ দিকগুলি সংশোধনে সাহায্য করবে। উপন্যাসটি খুব যত্নের সঙ্গে পড়ে আমার মনে হয়েছে এর কোনও সাহিত্যিক মূল্যই নেই। নেই কোনও সামাজিক দিক। ওসব মতবাদ এবং সমালোচনার অজুহাতে আসলে লেখক অশ্লীলতাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। সমাজের মঙ্গল করার নামে উপন্যাসটি প্রচণ্ড ক্ষতিই করেছে। যারা আগে থেকেই দুর্নীতিপরায়ণ এই উপন্যাস পড়ে তাদের আর নতুন করে অধঃপাতে যাবার কিছু নেই একথা আমি মানি। তেমনি যাঁরা অভিজ্ঞ ও পরিণত শিক্ষিত পাঠক তাঁদের মনেও এ উপন্যাসে কোনও কুপ্রভাব ফেলতে পারবে না। কিন্তু যে বিরাট সংখ্যক অপরিণতবুদ্ধির মানুষ এবং অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে তরুণ তরুণী রয়েছেন তাঁদের কী হবে? এ উপন্যাস তাঁদের নিশ্চয়ই বিপথগামী

হতে সাহায্য করবে।

উপন্যাসটির কোনও অংশ অশালীন হলেও অশ্লীল নয়—এ যুক্তির অবতারণা করে অভিযুক্তর পক্ষ থেকে ব্যাপারটিকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। আমার অভিমত হল এই উপন্যাসের বিশেষ বিশেষ অংশগুলি অশালীনতার সীমাও লঙ্ঘন করেছে—তারা প্রবেশ করেছে অশ্লীলতার গণ্ডীতে।

উপসংহারে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, এ উপন্যাসে যেভাবে ঘটনার বর্ণনা, শব্দ বাছাই ও কাহিনীর বিন্যাস করা হয়েছে তাতে কদাচার বাড়বে। যারা অপরিণত এবং যাদের সহজেই নীতিভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে এই উপন্যাস তাদের নৈতিক অধঃপতন ঘটাবে। এবং উপন্যাসটি অনায়াসেই এসব লোকের হাতে পড়া সম্ভব। এই উপন্যাস থেকে পাঠক আদিরসাত্মক অশ্লীল কামনার স্বাদ পাবে। উপন্যাসটি সেদিক দিয়ে বিপজ্জনক।

উপন্যাসটির অশ্লীল অংশগুলি সমগ্র লেখার মধ্যে এমনভাবে মিশে আছে যে তাদের আলাদা করা যায় না। সুতরাং আমি রায় দিচ্ছি : শুধু লাল কালি দাগানো অংশগুলিই নয়, সমগ্র প্রজাপতি উপন্যাসটিই অশ্লীল।

দুজনের বিচার হচ্ছে। প্রথম, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক শক্তিশালী লেখক—সমরেশ বসু। দ্বিতীয়, সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত, অতি উচ্চ শ্রেণীর পত্রিকা দেশের মুদ্রাকর ও প্রকাশক।

উপন্যাসটিকে অশ্লীল বলে ঘোষণা করার পর তার লেখক সমরেশ বসুকে কোনওমতেই অব্যাহতি দেওয়া যায় না তা তিনি যতবড় লেখকই হোন না কেন?—এই মন্তব্য সহ আমি তাঁর আলোচ্য উপন্যাসকে (প্রজাপতি) অশ্লীল ঘোষণা করছি। তাকেও সাজা দিচ্ছি। ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ধারা অনুযায়ী তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করছি। ২০১ টাকা জরিমানা অনাদায়ে দু মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিচ্ছি।

একইভাবে দোষী সাব্যস্ত করছি দেশ পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক সীতাংশুকুমার দাশগুপ্তকে। পত্রিকাটি প্রচারের আগে তাঁর সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। পত্রিকাটি যাতে পাঠকের ক্ষতি না করে এটা দেখা তাঁর দায়িত্ব ছিল। তাঁরও সাজা ওই একই রকম।

আপিলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫২১ ধারা মত দেশ শারদীয় সংখ্যা (১৩৭৪)-র ১৭৪ থেকে ২২৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নষ্ট করে দিতে হবে।

অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে আদালতে জরিমানার টাকা জমা দেওয়া হল। হাইকোর্টে আপিল করার তৎপরতাও শুরু হল। প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল অজিত দত্তর কাছে কাগজপত্র নিয়ে হাজির হলেন সমরেশ বসু ও দেশ পত্রিকার প্রতিনিধিরা। তিনি তাঁদের মামলা নিলেন।

হাইকোর্টে

ব্যাঙ্কশাল কোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে দু পক্ষই কলকাতা হাইকোর্টে আপিল করলেন। লেখকের আর্জি ওই রায় বাতিল করা হোক। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগকারীর আবেদন হল— রায়ের প্রদত্ত দণ্ডাদেশ বাড়ানো হোক। দীপনারায়ণ সিংহ তখন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। দুটি আবেদনই গেল বিচারপতি এন সি তালুকদারের কোর্টে।

সমরেশ বসুদের পক্ষে আপিল করা হল, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯। আপিল নং ১০৬/১৯৬৯।

সমরেশ বসু ও সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
বনাম
অমল মিত্র ও রাজ্য সরকার।

১১ মার্চ ১৯৬৯ বিচারপতি তালুকদার আদেশ দিলেন আপিল শোনা হবে। নিম্ন আদালতের নথিপত্র পাঠানো হোক।

পরদিনই (১২ মার্চ ১৯৬৯) অমল মিত্রদের আপিল পেশ করা হল। আপিল নম্বর ২৯৯/১৯৬৯।

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ বিচারপতি তালুকদার রুল জারি করলেন। চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট, সমরেশ বসু এবং সীতাংশুকুমার দাশগুপ্তকে কারণ দর্শাতে বললেন কেন দণ্ডাদেশ বাড়ানো হবে না। অথবা অন্যরকম আদেশ দেওয়া হবে না। দু পক্ষের দুটি আপিল (১০৬ ও ২৯৯) একই সঙ্গে শোনা হবে বলেও বিচারপতি তালুকদার আদেশ দিলেন।

লেখকের পক্ষে বক্তব্য

প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল অজিত দত্ত সমরেশ বসুদের হয়ে যে আবেদন পেশ করলেন তাতে বলা হল চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের শারদীয় দেশের (১৩৭৪) প্রজাপতি উপন্যাসকে অশ্লীল ঘোষণা করা এবং লেখক ও প্রকাশককে সাজা দেওয়া অনুচিত ও অবৈধ।

(১) ওই রায় অবৈধ কারণ, অশ্লীলতার সংজ্ঞা নির্ণয় বা পরীক্ষার যে ব্যাখ্যা সুপ্রিম কোর্ট দিয়েছেন তা ভুল বোঝা হয়েছে। ওই ব্যাখ্যা যথাযথ বুঝতে পারলে প্রজাপতি উপন্যাসটির ঘটনা ও বর্ণনার তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব হত। উপন্যাসটিকে অশ্লীল বলে রায় দেওয়া যেত না।

(২) আর উদেশী বনাম মহারাষ্ট্র সরকার মামলায় সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছেন তার মর্মার্থও মাননীয় বিচারক যথাযথ অনুধাবন করতে পারেননি।

(৩) আলোচ্য উপন্যাসের (প্রজাপতি) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধুই কামনা লালসার বর্ণনায় ভরপুর তাঁর এ সিদ্ধান্তও ঠিক নয়।

(৪) সহজ অনুভূতিপ্রবণ মনে এই উপন্যাস কামনাবহ্নি জ্বালাবে এবং অনপনেয় অনৈতিক ছাপ ফেলবে বলে তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তাও ঠিক নয়।

(৫) তথ্য প্রমাণ ও সাক্ষ্যের উপর নির্ভর না করে তাঁর সিদ্ধান্ত হয়েছে অনুমান ও সন্দেহ ভিত্তিক। এজন্যই তিনি উপন্যাসটির আসল উদ্দেশ্য বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। উপন্যাসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তাৎপর্যও উপলব্ধি করতে পারেননি।

(৬) লেখকের পক্ষে বলা হয়েছিল সমাজের অনাচারের সমালোচনাই উপন্যাসটির মূল প্রতিপাদ্য। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় (স্বীকার না করে) কোথাও কিছু অশ্লীলতার ছাপ এসে গিয়েছে তবে তা মূল উদ্দেশ্যের তুলনায় কিছুই নয়। কিন্তু মাননীয় চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট এ যুক্তিও গ্রহণ করেননি। ভুল করেছেন।

(৭) উপন্যাসটির কোনও শিক্ষাগত বা সামাজিক মূল্য নেই—মাননীয় বিচারকের এ সিদ্ধান্তও সঠিক নয়। তিনি বলেছেন সমাজের সমালোচনার অজুহাতে উপন্যাসটি আসলে অশ্লীলতা ছাড়া কিছুই নয়। কালোবাজারী, মুনাফাখোর বা অনৈতিক কারখানা মালিক ও ম্যানেজার এবং দুর্নীতিপরায়ণ স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদদের ভণ্ডামীর মুখোস খুলে ধরার চেষ্টাটিও তিনি দেখতে চাননি। অথচ মাননীয় বিচারকের এটা বোঝা উচিত ছিল নীতিবিগর্হিত সমাজের প্রতি কশাঘাতের মাধ্যমে, যে সমাজে আমরা বাস করি তার মুখোমুখি পাঠককে দাঁড় করিয়ে দেওয়াই ছিল উপন্যাসটির উদ্দেশ্য। এখানে সাহিত্যরসই প্রাধান্য পেয়েছে। লেখকের পক্ষে এসব যুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মাননীয় বিচারক তা গ্রহণ করেননি। কেন এসব যুক্তি তিনি অগ্রাহ্য করলেন তার কোনও কারণও দেখাননি।

(৮) কিছু স্ল্যাং শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে বলেই উপন্যাসটির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে মাননীয় বিচারকের এ সিদ্ধান্তও সঠিক নয়। বরঞ্চ এসব শব্দ উপন্যাসটিকে বাস্তব সম্মত করেছে। সমসাময়িক বাঙ্গালী সমাজকে চিনতে সাহায্য করেছে।

(৯) লেখককে ভর্ৎসনা করে রায়ে যে মন্তব্য করা হয়েছে তাও ঠিক নয়। মাননীয় বিচারক চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর রায়ে বলেছেন বাণিজ্যিক স্বার্থে, পাঠক আকর্ষণের উদ্দেশ্যে লেখক ইচ্ছা করেই উপন্যাসটিকে আদিরসাত্মক করেছেন। অতি সচেতনভাবে বাছাবাছা শব্দ প্রয়োগ করেছেন। ঘটনা সাজিয়েছেন যাতে অশ্লীলতাই প্রকট হয়ে ওঠে।—এ মন্তব্যও যথার্থ নয়।

(১০) বুদ্ধদেব বসু ও ডঃ নরেশ গুহর সাক্ষ্যের যথার্থ মুল্যায়নও তিনি করেননি। জিনা কাহিনী, পতিতাদের বিষয়ের উত্থাপনা এবং অন্যান্য ঘটনাকেও যথোচিত সামাজিক প্রেক্ষাপটে গ্রহণ করা হয়নি।—এইদিক দিয়ে বিচারে চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ে সুবিচার হয়নি। তাই এই আপিল।

অজিত দত্তর সঙ্গে ছিলেন দিলীপ দত্ত। হাইকোর্টে আপিলের শুনানি শুরু হল ১৯৭২ সনে। বিচারপতি অমরেশ রায়ের এজলাসে।

সমরেশ বসুদের সমর্থনে অজিত দত্ত বলেন, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এখন এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে অশ্লীলতা কোনটি তা আদালতই বিচার করবে। আদালতকে অবশ্যই দেখতে হবে সমগ্র বিষয়টি অশ্লীল কিনা? এটাও আদালত নিশ্চয়ই বিচার করবে যাদের মন সহজেই নীতিবর্জিত প্রভাবের বশীভূত হতে পারে এবং যাদের হাতে ওই লেখাটি পড়ার সম্ভাবনা আছে এটা পড়ে তারা নীতিভ্রষ্ট হবে কিনা? এই উপন্যাসে তা হবে না। কারণ সমাজ বদলেছে। মানুষ এখন অনেক অভিজ্ঞ।

অজিত দত্ত এরপর অভিযোগ তোলেন যে কোনও সাহিত্য অশ্লীল কিনা তা পরীক্ষার এই স্বীকৃত নীতি এক্ষেত্রে অনুসৃত হয়নি। নিশ্চয়ই বুদ্ধদেব বসু যেসব অভিমত প্রকাশ করেছেন তা সবটা ধরতে হবে না। কিন্তু মাননীয় চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট উপরোক্ত স্বীকৃত নীতিকেও সঠিক অর্থে প্রয়োগ করেননি। বস্তুতঃ তাঁর প্রবণতা ছিল বুদ্ধদেববাবু যা বলেছেন তার বিপরীত কিছু বলার দিকে।

অজিতবাবু বিচারপতির উদ্দেশ্যে বলেন,আপনি সমগ্র উপন্যাসটি (প্রজাপতি) পড়ে দেখুন। এর কোনও কোনও অংশ এবং তার বর্ণনা ও কিছু কিছু শব্দ কামনার ভাব জাগায় বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে কিন্তু সামগ্রিকভাবে উপন্যাসটি তা নয়। এ উপন্যাস কাউকে নীতিভ্রষ্টও করবে না। কারণ আজকের ভারতের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-চেতনা ও সাহিত্যবোধ অনেক এগিয়ে গিয়েছে। ঊনবিংশ এমনকি বিংশ শতকের প্রথমার্ধেও যে অবস্থা ছিল আজকের মানুষের মন তা থেকে মুক্ত। অতি উগ্র রক্ষণশীলতার বেড়ি ভেঙে আধুনিক সমাজ ও সাহিত্য বেরিয়ে এসেছে। আভাস ইঙ্গিতে ও তির্যক ভঙ্গীর বদলে বাস্তব ঘটনার বর্ণনায় ও শব্দ চয়নে তা অনেক বলিষ্ঠ।

তিনি আরও বলেন,উপন্যাসটি জনসাধারণের মঙ্গলই করেছে। সে দিক দিয়ে এটি যুক্তিযুক্ত। কারণ প্রখ্যাত লেখক সমরেশ বসু এই উপন্যাসের মাধ্যমে সমাজের অবক্ষয় ও প্রকট সমস্যার দিকে চিন্তাশীল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বাংলায় যাদের রকবাজ মস্তান অথবা গুণ্ডা বলা হয় সমাজে তাদের যথাযথ অবস্থানকে তুলে ধরেছেন বাস্তবসম্মতভাবে।

অজিত দত্ত প্রশ্ন করেন, এই কি আজকের সমাজ নয়? একদিন যে বাংলা শিক্ষা সংস্কৃতির জন্য গর্ববোধ করত আজ দারিদ্র্য যন্ত্রণায় তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখাচ্ছে। শিক্ষিত যুবকরাও হতাশ হয়ে পড়ছেন। বিরক্তি বিতৃষ্ণা তাদের বেপরোয়া করে তুলছে। আসলে সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত ব্যাপক দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, অসাধুতা ও নীতিহীনতা দেখে বেকার সমস্যা জর্জরিত যুব সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। কখনও কখনও কিছু কিছু যুবক হতাশাগ্রস্ত হয়ে নেশাভাঙ ওষুধ ও মেয়েছেলেতে আসক্ত হয়ে পড়ে। এইসব নেশাসক্ত যুবক কখনও কখনও তাদের কলেজের সহপাঠিনী, অফিসের সহকর্মিণী বা রাজনৈতিক দলের সঙ্গীনিদের কারও সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্তও হয়। এ তো বাস্তব ঘটনা। সমরেশ বসু তাঁর উপন্যাসে (প্রজাপতি) এই সামাজিক ব্যাধির মূল কতটা গভীরে তাই দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন ক্যানসারের মত এই রোগ আজ সমাজে প্রায় প্রতি ঘরে ও পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

অভিযোগকারীদের বক্তব্য

তাঁর জবাবে রাজ্য সরকারের জে. এম. ব্যানার্জি বলেন, গোটা উপন্যাসটি এবং তার ভিতরকার বিভিন্ন কাহিনী কামভাব জাগাবেই। পাঠকদের নীতিহীন করবে। মিঃ অজিত দত্ত সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে যেসব কথা বললেন তা ধরে নিয়েও কোনও মতেই বলা চলে না যে এই উপন্যাস সামাজিক মঙ্গলের জন্য লিখিত। সামাজিক উদ্দেশ্য বা যে কোনও কারণই দেখানো হোক না কেন, কোনও মতেই উপন্যাসটির উত্থাপনা সমর্থনযোগ্য নয়। সাহিত্যে বা শিল্পের বিচারে তো নয়ই। রকবাজ, মস্তান, গুণ্ডা যে নামই দেওয়া হোক না কেন সেগুলি সাধারণ সমস্যা হতে পারে না।

তিনি আরও বলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রভাবে এবং দেশভাগের ফলে কয়েক লক্ষ মানুষের ছিন্নমূল হয়ে এদেশে আশ্রয় নেওয়ায় নিশ্চয়ই আমাদের সমাজের সুস্থিতি একটা বড় রকমের নাড়া খেয়েছে। বেকারি, শিক্ষা ও বাসস্থানের সমস্যা নিশ্চয়ই আমাদের সমাজের ক্ষতি করেছে। পারিবারিক সম্পর্কেও ভাঙন ধরেছে। এসব সমস্যাই রকবাজ গুণ্ডা ও মস্তানের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু এই গুরুতর সামাজিক সমস্যাটিকে দায়িত্বশীল ব্যক্তি এবং রাজনীতিকরা তাঁদের রাজনৈতিক মতলব হাসিলের জন্য ব্যবহার করবেন এটাও ঠিক নয়। কতকগুলি লোভী লোক এই যুবশক্তিকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য লেলিয়ে দেবেন, চোরাচালান, হিংসাত্মক কাজকর্মে এমনকি লুঠতরাজে লাগাবেন—এটাও অন্যায়। এই হিংসা লোভ ও স্বার্থান্ধতাই বর্তমান অশান্তির মূল—শুধু বেকারি নয়। সাহিত্যও যদি ওই কুকর্মগুলিকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেয় তবে তা ভালর থেকে মন্দই করবে। হিতে বিপরীত হবে।

তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন ভাল মন্দ সব সমাজেই আছে। কিন্তু শুধু কুশ্রী দিকগুলিকেই ফুটিয়ে তোলার পক্ষে তা কোনও যুক্তি হতে পারে না। কুৎসিত দিকগুলিকে সাহিত্যে অশ্লীলভাবে ফুটিয়ে তোলার অর্থ হবে নর্দমার পাঁক লোকের গায়ে ছিটিয়ে দেওয়ার সমতুল্য। কে না জানে নর্দমায় পাঁক আছে। কোথায় কতটা পাঁক আছে নর্দমা পরিদর্শক পাঁক ঘেঁটে তাঁর উপরওয়ালাকে হেলথ অফিসারকে সে সম্পর্কে যথাযথ বাস্তবসম্মত রিপোর্ট দিন। সেটাই হবে তাঁর পাঁক ঘাটার সার্থকতা। কিন্তু তা না করে তিনি যদি নর্দমার পাঁক তুলে তুলে পথ-চলতি মানুষকে উত্যক্ত করতে থাকেন তবে কী মানুষ তা সহ্য করবে? সাহিত্যেও তেমনি। বাস্তবতার নামে কিছু কুৎসিত কামনাবহুল দৃশ্যের অবতারণা সমাজ সহ্য করবে না।

অভিযোগকারী অমল মিত্রর পক্ষে দণ্ডাদেশ বৃদ্ধির আবেদনে বলা হয়, চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট নিজে এই উপন্যাস সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন সে তুলনায় তাঁর প্রদত্ত সাজা কিছুই নয়। এক্ষেত্রে এমন কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ এধরনের কিছু না লেখেন।

তাঁর পক্ষে ছিলেন আইনজীবী এস পি তালুকদার। দণ্ডাদেশ বৃদ্ধির আর্জি জানিয়ে আবেদনে আরও বলা হয় :

(১) আলোচ্চ উপন্যাস (প্রজাপতি) অশ্লীল। পাঠকের স্থূল রুচির প্রতিই এর আবেদন।

(২) নায়ক সুখেনের কাহিনী বলতে গিয়ে লেখক দৈহিক সম্পর্কের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর রায়ে বলেছেন উপন্যাসটি পড়ে তাঁর ধারণা হয়েছে এটি কোনও সাহিত্য সৃষ্টি নয়। নোংরা আদিরসে ভর্তি। মাননীয় বিচারক তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে শারদীয় দেশের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা তুলে ধরেছেন। অথচ সাজা দিয়েছেন মাত্র ২০১ টাকা অনাদায়ে দুই মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড।

(৩) চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর রায়ে যেভাবে উপন্যাসটির অশ্লীলতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন তাতে এমন কঠোর সাজা দেওয়া উচিত ছিল যা চিরকাল এধরনের অপরাধীদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে থাকে।

(৪) শারদীয় দেশের (১৩৭৪) ১৭৪ পৃষ্ঠা থেকে ২২৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করার যে

আদেশ তিনি দিয়েছেন তাও কোনও কাজে লাগবে না।

(৫) লেখক যেখানে ভাষায় বোঝাতে পারেননি সেখানে ছবির আশ্রয় নিয়েছেন। সবদিক দিয়ে বইটিকে নোংরা ও অশ্লীল করা হয়েছে। এই মন্তব্য করে মাননীয় বিচারক নিজেই যেখানে তাঁর রায়ে বলেছেন, এই উপন্যাস সমাজের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকারক, সেখানে এত কম সাজা তাঁর নিজের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সুতরাং দণ্ডাদেশ বাড়ানো হোক।

উচ্চ আদালতের রায়

কলকাতা হাইকোর্ট, ব্যাঙ্কসাল কোর্টের রায়ই বহাল রাখলেন। উপরন্তু প্রজাপতি উপন্যাসটিও নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। ইতিমধ্যেই প্রজাপতি বই হিসাবে বেরিয়েছে। হাইকোর্ট তার সব কপি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দিলেন।

বিচারপতি অমরেশ রায় তাঁর রায়ে মন্তব্য করলেন তিনি মনে করেন অপরাধের তুলনায় সাজা খুবই কম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু লেখককে জেলে পাঠানোর ক্ষমতা তাঁর নেই।

আবেদনকারী অমল মিত্রর পক্ষে কঠোর সাজার জন্য আর্জি জানানো হয়। সে প্রসঙ্গে বিচারপতি রায় বললেন, ওই আবেদন দেখা হয়েছে। সমরেশ বসু একজন খ্যাতিমান লেখক। তাঁকে কারাদণ্ড দিলে এধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে তা দৃষ্টান্তস্বরূপ হোত। তাঁর মতো এক নামী লেখকের কারাদণ্ড ভবিষ্যতে তাঁর কলম থেকে এধরনের লেখা বেরোনর পক্ষে প্রতিবন্ধক হোত। সমরেশ বসুর ন্যায় এক খ্যাতিমান লেখকের কারদণ্ড যেমন অন্যদের নিরস্ত করত, আশা করব তাঁর জরিমানাও তাঁদের সেইরকমই সংযত করবে।

বিচারপতি রায়ে আরও বললেন, এর আগে আমার সহকর্মী বিচারপতি এন সি তালুকদার একা, দণ্ডাদেশ বৃদ্ধির আবেদনটির ভিত্তিতে রুল জারি করেছেন। আমিও একা সিঙ্গল বেঞ্চে এই আবেদন শুনেছি। হাইকোর্টের নিয়ম অনুসারে সিঙ্গল বেঞ্চের এই শুনানিতে শুধুই জরিমানা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচিত হতে পারে। কারাদণ্ড দেবার .ক্ষমতা আমার নেই।

আমি মনে করি এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট প্রদত্ত দণ্ডাদেশ খুবই কম বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। কিন্তু তবুও দণ্ডাদেশ বাড়ানো যাচ্ছে না। দণ্ডাদেশ বৃদ্ধির জন্যে অভিযোগকারীর আবেদনের (নং ২৯৯/১৯৬৯) উপর যে রুল জারি করা হয়েছিল তা খারিজ করা হল। এবং দুই অভিযুক্তকে চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট যে সাজা দিয়েছিলেন তাই বহাল রইল।

অভিযোগকারী শুধু শারদীয় দেশের (১৩৭৪) প্রকাশিত উপন্যাসটি (প্রজাপতি)-তে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তারই একটি কপি চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে পেশ করা হয়েছিল। তিনিও ওই দেশের যে অংশে প্রজাপতি উপন্যাসটি বেরিয়েছে, তার ১৭৪ থেকে ২২৬ পৃষ্ঠা নষ্ট করে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোনই কাজ হবে না। যতক্ষণ না ওই শারদীয় দেশের সব কপি বাজেয়াপ্ত করে তার প্রতিটির ১৭৪ থেকে ২২৬ পৃষ্ঠা নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে, ততক্ষণ ওই আদেশ অর্থহীন। তাছাড়া ইতিমধ্যেই যে প্রজাপতি উপন্যাসটি বই হিসাবে বেরিয়ে গিয়েছে, চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট তাও লক্ষ্য করেননি। তাই আদেশ দেওয়া হচ্ছে বই আকারে প্রকাশিত প্রজাপতি উপন্যাসের সব কপিও ফৌজদারি কার্যবিধির ৫২১ ধারা মতে বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

শারদীয় দেশের (১৩৭৪) ১৭৪ থেকে ২২৬ পৃষ্ঠা নষ্ট করার যে আদেশ চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট দিয়েছেন তা তো বহাল রাখা হলই, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে এই নির্দেশও দেওয়া হচ্ছে যে প্রজাপতি উপন্যাসের বইগুলি বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থাও যেন নেওয়া হয়।

বিচারপতি অমরেশ রায় চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কুমারজ্যোতি সেনগুপ্তর রায়, উভয় পক্ষের সাক্ষ্য এবং লেখকের বক্তব্য তাঁর রায়ে উল্লেখ করেছেন। চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের সঙ্গেও বিচারপতি একমত হয়েছেন।

বিচারপতি তাঁর রায়ে আরও বলেছেন, আনন্দবাজার পত্রিকার প্রেস থেকে প্রকাশিত দেশ অতি জনপ্রিয় পত্রিকা। পশ্চিমবঙ্গের বহু বাড়িতেই দেশ যায়। এ রাজ্যের বাইরেও বাঙ্গালীরা দেশ পত্রিকা কেনেন। পুজোর মরশুমে কবে শারদীয় দেশ প্রকাশিত হবে শিক্ষিত বাঙ্গালী আগ্রহের সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন। শারদীয় সংখ্যা যেদিন বেরোয় সেদিন এক কপি দেশ সংগ্রহের জন্য কলকাতার রাস্তায় হাঙ্গামা বেধে যায়। এরকম একটি পত্রিকা যখন বাড়িতে যায় তখন শুধু যে পরিবারের বয়স্করাই তা পড়েন তা নয়, অল্পবয়সীরাও

পড়ে। তার ছবিগুলিও দেখে।

বিচারপতি তাঁর রায়ে মন্তব্য করেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন, তাঁর ১৭ বছরের মেয়ে উপন্যাসটি পড়েছে কিন্তু ১১ বছরের মেয়ে পড়েনি। এই সাক্ষ্যকে বিচার করতে হলে বলতে হয় তিনি কী করে তা জানলেন? বাবার অজান্তে তাঁর ১১ বছরের মেয়েটি হয়তো উপন্যাসটি পড়ে ফেলেছে। একথা ভেবেও আমার দুঃখ হচ্ছে যে তাঁকে জেরার সময় এ প্রশ্ন কেন করা হল না, তাঁর ১৭ বছরের যে মেয়ে উপন্যাসটি পড়েছে সেকি ওই উপন্যাসের বিষয়বস্তু নিয়ে বাবার সঙ্গে আলোচনা করেছে? একইভাবে বুদ্ধদেব বসুর সাক্ষ্য আমার কাছে মনে হয়েছে ভাসাভাসা, অর্থহীন। এই মামলার বিচারের জন্য আদালতের কাছে তার কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। তিনি খ্যাতিমান সাহিত্যিক হতে পারেন কিন্তু কোনও উপন্যাসে অশ্লীলতা বিচারে তাঁর বিশেষজ্ঞের ভূমিকা থাকতে পারে না।

চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ঠিকই বলেছেন, কোনও বই অশ্লীল কিনা তা বিচার করতে হবে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ধারা মতে। এখানে কোনও বিশেষজ্ঞের মতামতের মূল্য নেই —এই মন্তব্য করে বিচারপতি রায় আরও বলেছেন সুপ্রিম কোর্টও এরকম অভিমতই দিয়েছেন।

সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন 'কোনও বইয়ের সাহিত্য মূল্যই প্রধান হয়ে উঠেছে অভিযুক্তরা এই যুক্তি দিলে বিশেষজ্ঞের মতামত সেক্ষেত্রেই কাজে লাগবে যেখানে বইটি আদালতের অপরিচিত কোনও ভাষায় লেখা। এবং আদালতকে অনুবাদের উপর নির্ভর করতে হয়। কারণ অনুবাদে অনেক সূক্ষ্ম বিষয় ধরা পড়ে না।' এখানে যে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচার হয়েছে তিনি ও আমি দুজনেই বাঙ্গালী। সুতরাং সাক্ষী বড় সাহিত্যিক এবং সাহিত্যের অধ্যাপক হলেও উপন্যাসটি বোঝার জন্য আমাদের, তাঁদের মতামতের উপর নির্ভর করতে হবে না। কারন আমাদের সামনে মূল উপন্যাসটিই ছিল। এবং আমরা তা পড়তেও পারি। অনুবাদের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়নি। তা ছাড়া কোনও সাক্ষী বিশেষজ্ঞ হিসেবে সাক্ষ্য দিলে তা গ্রহণ করতে হবে ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৪৫ ধারা অনুসারে। যেখানে বলা আছে সেই সাক্ষ্যই বিশেষজ্ঞদের মতামতের মর্যাদা পাবে যা সমদর্শী। একপেশে নয়। যখন দেখা যাবে কোনও সাক্ষী তাঁর মতামতের জন্য কোনও যুক্তি দিচ্ছেন না, একপেশেভাবে বলে যাচ্ছেন তখন তাঁর সাক্ষ্য বিশেষজ্ঞের মত হিসাবে গ্রাহ্য হবে না। এখানে অভিযুক্তদের দুই সাক্ষীর সাক্ষ্য আমি যত্নের সঙ্গে বিবেচনা করে দেখেছি। দেখেছি তাঁরা অন্ধবিশ্বাসের বশে বহু কথা বলে গিয়েছেন। কোনও যুক্তির মধ্যে যাননি। সুতরাং তাদের মতামত পক্ষপাতদুষ্ট। তা বিশেষজ্ঞের অভিমত হিসাবে গৃহীত হবে না।

সুপ্রিম কোর্টে ইতিমধ্যে চন্দ্রকান্ত কল্যাণদাস কাকোদর বনাম মহারাষ্ট্র সরকার নামে একটি মামলা হয়েছে। সেই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ২৫ আগস্ট ১৯৬৯ তাঁদের রায় দেন। অভিযুক্তদের কৌঁসুলি অজিত দত্ত হাইকোর্টে এই মামলার রায়ের কথা উল্লেখ করে বলেন, প্রজাপতি মামলায় চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের রায় দানের পর সুপ্রিম কোর্ট এই রায় দিয়েছেন, সুতরাং মাননীয় চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট এই মত দ্বারা পরিচালিত হননি। সুপ্রিম কোর্টের ওই রায়টি উদ্ধৃতও হয়।

সুপ্রিম কোর্টের ওই রায়ে বিচারপতিরা বলেছেন "অশ্লীলতার বিচারের সময় আদালত বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে দেখবে। দেখতে হবে যাদের মন দুর্নীতির বশ হতে পারে এবং যাদের হাতে প্রকাশনাটি সহজেই যেতে পারে— লেখার অশ্লীল অংশ তাদের বিপথে নিয়ে যাবে কিনা? এই বিচারের সময় সমসাময়িক সামাজিক ও নৈতিক পরিবেশের কথা ভুললে চলবে না।

সুপ্রিম কোর্টের ওই রায়েই আর একটি প্যাসেজে বিচারপতিরা অশ্লীলতা নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন---"কোনও বই অশ্লীল কিনা তার বিচার মৌখিক সাক্ষ্যের উপর একেবারেই নির্ভর করে না। মূল বিচার্য হল বইটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ধারা লঙ্ঘন করেছে কিনা। এবং

সেটা আদালতই দেখবে। অশ্লীল কিনা তা শুধু আদালতই নির্ধারণ করবে। আর কেউ নয়।"

সুপ্রিম কোর্টের ওই রায়ে আরও বলা হয়েছে "দেশ কাল ভেদে অশ্লীলতার ধারণা নিশ্চয়ই পাল্টাতে পারে। ফ্রান্সে যা সাহিত্য বলে বিবেচিত ইংলণ্ডে তা অশ্লীল হতে পারে। আবার ওই দুই দেশেই যাকে সাহিত্য বলা হচ্ছে ভারতীয় সমাজে এবং নৈতিকতার মান হিসাবে তা হয়ত আমাদের দেশে অশ্লীল এবং ক্ষতিকারক। তবে লেখককে সবসময়ই উঠতি বয়সী ছেলেমেয়েদের কথা মনে রেখে দৈহিক সম্পর্কের ও কামনার বাসনার কথা লিখতে হবে। বা এড়িয়ে যেতে হবে যাতে ওদের মনে দৈহিক কামনার আগুন না জ্বলে,—এরকম একটা ধারণা করাও খুব বাড়াবাড়ি হবে। তাহলে তো লেখককে শুধু কিশোর সাহিত্যই লিখতে হয়। প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য কিছুই লেখা চলে না।"

"ভারতের সমসাময়িক সমাজও তো বদলাচ্ছে। প্রেম ভালবাসা ও দৈহিক মিলনের কথা আছে এরকম বহু ক্ল্যাসিক, উপন্যাস ও গল্প এদেশের প্রাপ্ত বয়স্করা তো পড়ছেনই, উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরাও পড়ছে। উদেশী মামলায় মন্তব্য করা হয়েছে—দৈহিক মিলনের কোনও উল্লেখ থাকলেই যদি সেই লেখাকে অশ্লীল বলতে হয় তাহলে তো এদেশে শুধু ধর্মগ্রন্থ ছাড়া আর কিছুই লেখা চলে না। আর্ট ও সিনেমাতেও আজকাল এমনভাবে ছবি দেখানো হয় পঁচিশ বছর আগেও যা অনৈতিক বলে হয়েছে এবং দেখানো সম্ভব হয়নি। পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে আজ সবাই তাদের মেনে নিয়েছেন। আদালতকে দেখতে হবে কোনও একটি লোক বা সমাজের একটি শ্রেণী নয়, সমগ্র সমাজের উপর কোনও লেখার কুপ্রভাব পড়ছে কিনা? কোনও লেখা শুধুই কাম লালসায় ইন্ধন যোগাচ্ছে কিনা? অশ্লীলতার অভিযোগকে এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই বিচার করতে হবে। "

অভিযুক্তর কৌঁসুলি অজিত দত্ত হাইকোর্টে সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে সমরেশ বসুদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। বিচারপতি অমরেশ রায় ওই উদ্ধৃতির উল্লেখ করে বলেছেন : এতেই দেখা যাচ্ছে কোনও রচনার বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ এলে কীভাবে কোন নিরিখে তার বিচার করতে হবে দেশের সর্বোচ্চ আদালত তার নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পর অশ্লীলতার বিচারের জন্য নির্দিষ্ট -ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ধারা সংশোধিতও হয়। লোকসভা ১৯৬৯ সালের ৩৯ নং আইনে এই সংশোধন করেন। মূল ২৯২ ধারাটি রেখে আর একটি নতুন ধারা সংযোজিত হয়েছে। পুরনো ধারাটি ২৯২ (২) এবং সংশোধিত সংযোজনটি ২৯২ (১) উপধারা হিসাবে।

সংশোধিত আইনের এই উপধারাটি ২৯২ (১) হল : কোনও বই, প্রচারপত্র, লেখা, ছবি বা কাগজে প্রকাশিত কোনও কিছুর সামগ্রিক বিচারে যদি দেখা যায় যে তা পাঠকের মনে কাম লালসা জাগায় এবং তাদের হাতে ওই প্রকাশনা পড়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে তাকে অশ্লীল বলে গণ্য করতে হবে।

সামাজিক মঙ্গলের জন্য কোনও কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে এটা প্রমাণ করতে পারলে তাকে অশ্লীলতার দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। একথাও আইনে বলা হয়েছে।

এখন তাহলে সুপ্রিম কোর্টের ওই রায় এবং সংশোধিত আইনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে আলোচ্য উপন্যাস (প্রজাপতি)টিকে সামগ্রিকভাবে দেখলে তা কদাচার প্রবণ বলে প্রতীয়মান হয় কিনা। এই উপন্যাসে কামনার ইন্ধন যোগানো হয়েছে কিনা? এবং তা পাঠকের মনে লালসা জাগিয়ে তাকে নীতিহীন করে কিনা?

যদি বইটির কোনও সাহিত্যমূল্য বা সামাজিক কল্যাণের দিক থাকে তাহলে অবশ্য উপন্যাসটি ওই দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে যাবে।

আমার মনে হয়, লেখকরা নিশ্চয়ই সমাজের বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলবেন। সমাজের সমস্যা ও নোংরা দিকগুলিও নিশ্চয়ই তাঁদের রচনার বিষয়বস্তু হবে। কিন্তু এখানেই এইসব শক্তিশালী মানুষের কাছে সমাজ একটি দায়িত্বজ্ঞানও আশা করবে। তাঁরা এমন কদর্য ভাষায় ও ভাবে নিশ্চয়ই কিছু বর্ণনা করবেন না যাতে সমাজের যে অংশে এখনও ঘুণ ধরেনি সেখানেও তাঁরা ওই নোংরা কামনা-লালসার বীজ ছড়িয়ে দেবেন। তাহলে তো তাঁর লেখার

সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। যে ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি লিখছেন বলছেন তার ফল হবে ঠিক উল্টো। এখানে তাই হয়েছে। ভালভাবে উপন্যাসটি পড়ে আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে এখানে সাহিত্য রস কিছু নেই। নেই কোনও মঙ্গলচিন্তা ! এ নিছক একটি আদিরসাত্মক রচনা। কুৎসিত স্ল্যাং শব্দে ভরা।

উপন্যাসটি যত্নের সঙ্গে পড়ে এবং অভিযুক্তের পক্ষে অজিত দত্ত ও রাজ্য সরকারের পক্ষে জে এম ব্যানার্জির বক্তব্য শুনে এই আমার সিদ্ধান্ত যে লেখক এই উপন্যাসের বিভিন্ন অংশে এমনভাবে ঘটনার বর্ণনা, বিভিন্ন কাহিনীর অবতারণা ও ভাষার ব্যবহার করেছেন যে পাঠকের মনে কামনা-লালসা জাগানোই তাঁর উদ্দেশ্য। উঠতি বয়সের যেসব ছেলেমেয়ে এই বই পড়বে তারা সবাই যে খারাপ হয়ে যাবে একথা অবশ্যই বলা যায় না। তবে একথা ঠিক যেসব মনে সহজেই কামনা বাসনা ছাপ পড়ে এ উপন্যাস তাদের গোল্লায় যেতে সাহায্য করবে।

সুপ্রিম কোর্ট (১৯৬৮) বলেই দিয়েছেন—অনুভব শক্তিহীন এইসব মনে কী প্রভাব পড়ল না পড়ল শুধু তাই অশ্লীলতা পরীক্ষার একমাত্র মাপকাঠি নয়। আমার মতে এই উপন্যাস সে পরীক্ষার গণ্ডীও অতিক্রম করে গিয়েছে। এবং সোজাসুজি ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ধারায় যাকে অশ্লীল বলা যায় সেইখানে পৌঁছেছে। অর্থাৎ অশ্লীলতার আইন ভঙ্গ করেছে। এ উপন্যাস অশ্লীল। আপিল অগ্রাহ্য করা হল।

হাইকোর্টেও হেরে গেলেন প্রজাপতির লেখক সমরেশ বসু। বিচারপতি রায় দিলেন ২৭ জুন ১৯৭২। ব্যাঙ্কশাল কোর্টে চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট রায় দিয়েছিলেন ১১ ডিসেম্বর ১৯৬৮। প্রায় চার বছর পেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যে প্রজাপতি উপন্যাস বই হয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। তার আটটি সংস্করণ নিঃশেষ।

হাইকোর্টের রায় বেরোনর পর পুলিশ এসে একদিন হানা দিল প্রজাপতি উপন্যাসের প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডে, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেনে কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলের বই পাড়ায়। দোতলায় উঠে প্রকাশনা সংস্থার গুদাম ও বইয়ের দোকানে তল্লাসী হল। জিজ্ঞাসাবাদ করা হল প্রজাপতি উপন্যাসের কোনও কপি আছে নাকি? কপি ছিল না। বাইরের দুজন সাক্ষী এনে সই সাবুদ নিয়ে পুলিশ ফিরে গেল। বন্ধ হল প্রজাপতি প্রকাশনা।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর প্রধান সম্পাদক অশোককুমার সরকার বললেন, সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাব।

সংবিধানে ১৩৪ (১) অনুচ্ছেদ অনুসারে সুপ্রিম কোর্টে যাবার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের অনুমতি চেয়ে সার্টিফিকেটের আবেদন পেশ করা হল ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩।

বিচারপতি অমরেশ রায় সুপ্রিম কোর্টে যাবার এই অনুমতি দিলেন না। ২৯ মার্চ ১৯৭৩ তিনি সেই আবেদন নাকচ করে দিলেন।

সুপ্রিম কোর্টে

তাতেও দমলেন না সমরেশ বসু ও দেশ পত্রিকা কর্তৃপক্ষ। তাঁরা ঠিক করলেন সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে সুপ্রিম কোর্টে বিশেষ অনুমতির (স্পেশাল লিভ) আবেদন পেশ করবেন। দেশ পত্রিকার প্রতিনিধিরা দিল্লি গেলেন। সুপ্রিম কোর্টে আপিল দায়ের করা সম্পর্কে অশোক সেনের সঙ্গে আলোচনা হল। আদ্যন্ত আলোচনার পর তিনি মামলা নিলেন। তাঁর সহযোগী হলেন সলিসিটর জে বি দাদাচাঁদজি অ্যান্ড কোং-র অ্যাডভোকেট শ্রীনারায়ণ। ৯ জুলাই ১৯৭৩ সুপ্রিম কোর্টে এই আবেদন দাখিল হল।

সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি এইচ আর খান্না এবং বিচারপতি আলগিরি স্বামীর আদালতে স্পেশাল লিভ আবেদনটি উঠলো ২৪ আগস্ট ১৯৭৩। এই আবেদন গ্রহণের আর্জি জানিয়ে সমরেশ বসুর পক্ষে সওয়াল করলেন অশোক সেন। তাঁর বক্তব্য শুনে বিচারপতিরা আবেদন মঞ্জুর করলেন। আদেশ দিলেন, 'আবেদনকারীরা আলোচ্য গল্পটির যথাযথ নির্ভুল অনুবাদে দাখিল করবেন।

অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট কলকাতা হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণ করলেন। ব্যাঙ্কশাল কোর্টে প্রথম অশ্লীল ঘোষণার পর ছয় বছর কেটে গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে আপিল নম্বর হল ১৭৪/১৯৭৩।

সমরেশ বসু ও সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
বনাম
অমল মিত্র ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পরবর্তী পর্যায়ে আপিলের শুনানির সময় সমরেশ বসুদের পক্ষে দাঁড়ালেন জি এল সংঘী। তাঁর সঙ্গে শ্রীমতী কাউর। চূড়ান্ত পর্যায়ে শুনানির তালিকায় মামলাটি গেল বিচারপতি মুতার্জা আলির এজলাসে। যেদিন তাঁর কোর্টে শুনানির কথা সেদিনই তিনি মারা যান। এরপর মামলাটি গেল বিচারপতি এ এন সেন এবং বিচারপতি আর এস পাঠকের এজলাসে।

আবার তারিখের জন্য অপেক্ষা। এর আগে সুপ্রিম কোর্টের একটি ঘরে আগুন লাগে। এরপর সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার সলিসিটর জে বি দাদাচানজি অ্যাণ্ড কোং-র কাছে চিঠি দেন ওই অগ্নিকাণ্ডে আপনাদের মামলার কিছু রেকর্ড হয় নষ্ট হয়ে গিয়েছে, নয় তো কোথাও অগোছালো হয়ে পড়ে আছে। মূল বইটির ইংরেজি অনুবাদ দিন।

১৯৭৯ সালে মামলাটি প্রথম সুপ্রিম কোর্টে ওঠে। দিন পড়ে। ১৯৮০ সালে আদালত প্রজাপতির অনুবাদ চাইলেন। আবার দিন পড়ল। অনুবাদ পেশ হল। এভাবে এল ১৯৮২। আগুনে সেই অনুবাদটি নষ্ট হয়েছে বলে আবার অনুবাদ পেশ হল। এভাবে এল ১৯৮৫। যে বছর ফেব্রুয়ারিতে মামলাটি এল সুপ্রিম কোর্টের তালিকায়। শুনানির দিন কী অভিযোগকারী কী রাজ্য সরকার কারও পক্ষেই কেউ হাজির হলেন না। শুনানি হল না। আবার দিন পড়ল।

সুপ্রিম কোর্ট একজন সিনিয়র কৌঁসুলি ইউ আর ললিতকে 'অ্যামিকাস কিউরি' হিসাবে অভিযোগকারীর পক্ষে দাঁড়াতে অনুরোধ করলেন। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কেউ আইনজীবী না দিলে আদালতই এভাবে কাউকে দাঁড়াতে বলেন, আদালতের বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসাবে। যাতে কোনও মামলা একতরফা না হয়। মিঃ ললিত সম্মত হলেন। পরবর্তী তারিখে তিনি এলেন আদালতকে সাহায্য করতে। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে প্রজাপতির মামলার শুনানি শুরু হল। তারিখটা ২০ আগস্ট ১৯৮৫। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে দাঁড়ালেন ডি এন মুখার্জি। এঁদের উভয়েরই বক্তব্য হল প্রজাপতি উপন্যাস অশ্লীল। কলকাতা হাইকোর্টের রায়ই বহাল রাখা হোক। আপিল খারিজ করা হোক। শুনানি চলল তিন দিন– ২০, ২২ ও ২৩ আগস্ট ১৯৮৫।

মিঃ ললিত বললেন, অশ্লীলতার জন্য কোনও লেখার বিচার করতে, আলাদা

আলাদাভাবে প্রতি কেসের বিষয়বস্তুকে খতিয়ে দেখতে হবে। আইনের স্বীকৃত নীতিগুলির পরিপ্রেক্ষিতেই অভিযুক্ত লেখাকে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে সেটি অশ্লীল কি না?

প্রজাপতি উপন্যাসের বিভিন্ন অংশ তুলে ধরে তিনি সুপ্রিম কোর্টকে দেখালেন। বললেন, এই সব অংশ কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত এবং হাইকোর্ট অশ্লীল বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত সঠিক। এখন এই আদালতেকেও সমগ্র বিষয়টি বিচার করে দেখতে হবে। এই কোর্ট নিশ্চয়ই দেখবেন গোটা উপন্যাস বা তার কোনও অংশকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ধারা মতে অশ্লীল বলা চলে কি না। চূড়ান্তভাবে এই উপন্যাসটির মূল্যায়ন এই আদালতই করবেন।

সমরেশ বসুদের পক্ষে কৌঁসুলি সংঘভী বললেন, প্রজাপতি উপন্যাসকে সামগ্রিক বা আংশিক কোনভাবেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ধারা অনুযায়ী অশ্লীল বলা যাবে না। এই বই ওই আইন ভঙ্গ করেনি। এই উপন্যাসের লাল কালি দিয়ে দাগানো অংশগুলিতে কিছু স্ল্যাং শব্দ আছে। মেয়েদের শরীরের কিছু অংশের বর্ণনাও করা হয়েছে। সেগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে বিশ্রী বলে মনে হতে পারে। রুচিসম্পন্ন মনের মানুষের কাছে এসব ভাল নাও লাগতে পারে। কিন্তু এসব কিছুতেই অশ্লীল নয়। কারণ ছোট বড় কাউকেই এসব অংশ নীতিভ্রষ্ট করবে না।

সমাজের নীতিহীনতাকে সুখেনের জবানীতে বলা হয়েছে বলেই মস্তানদের ভাষা লেখক তাঁর নায়কের মুখে বসিয়েছেন—এই যুক্তি দিয়ে সংঘী বলেন, এটাও অশ্লীলতা নয়। কেননা সুখেনের কথা সুখেনের ভাষাতেই তো বলতে হবে। সুখেনের মুখে যদি মার্জিত ভাষা বসানো হোত তাহলে তা তার চরিত্রের বাস্তবতাই নষ্ট করে দিত। চরিত্রটিই অর্থহীন হয়ে পড়ত। সাহিত্য ও শিল্পকে বাস্তবসম্মত করার জন্য এসব শব্দ ও ঘটনা কখনই কোনও রচনাকে আইনের চোখে অশ্লীল করে না।

অশালীনতা ও অশ্লীলতার মধ্যে সীমারেখা টেনে তিনি বললেন, বাস্তবে কোনও চরিত্র সমাজের যে নোংরা পরিবেশে বেড়ে ওঠে উপন্যাসে অনেক সময় তাদের সেই পরিবেশ, ভাষা ও আচার-আচরণ যথাযথ বর্ণনার চেষ্টা করা হয়। বাস্তবতা ও সত্যতা, ও সাহিত্যিক সততার জন্যই এটা দরকার। এসব অংশ কারও কারও কাছে হয়তো নোংরা মনে হতে পারে কিন্তু তাই বলে তাদের অশ্লীল আখ্যা দেওয়া যাবে না।

তিনি বলেন, সাহিত্যের মতো জীবনেও শালীনতা ও অশ্লীলতা দুটিই আছে। শালীনতাবর্জিত নোংরা ঘটনা বাস্তবসম্মত হলেও রুচিবান মানুষের কাছে তা অপ্রীতিকর মনে হয়। কিন্তু তা অশ্লীল নয়। আইনের চোখে সেই সাহিত্যই শুধু অশ্লীল যা ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ধারা ভঙ্গ করেছে।

সেই অশ্লীলতা কি? এ প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন আইনে কিন্তু তার সংজ্ঞা বলে দেওয়া হয়নি। সুপ্রিম কোর্ট এবং অন্যান্য বিভিন্ন আদালত বিভিন্ন সময়ে যেভাবে তার ব্যাখ্যা করেছেন সেই নিরিখেই বিচার চলছে। সে বিচারে এ উপন্যাস (প্রজাপতি) কাউকে বিপথে নিয়ে যাবে না—সুতরাং একে অশ্লীল বলা ভুল হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের রায় তুলেই তিনি দেখান, তাঁর বক্তব্য যথার্থ। তা ছাড়া বুদ্ধদেব বসু এবং ডঃ নরেশ গুহর মতো প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক ও সাহিত্যের অধ্যাপকও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের সাক্ষ্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সেটাও ঠিক নয়।

জবাবে পশ্চিমবঙ্গ পরকারের কৌঁসুলি মিঃ মুখার্জি বলেন, কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট এবং হাইকোর্ট ঠিক কাজই করেছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত সঠিক। দুজনই উপন্যাসটি মন দিয়ে পড়েছেন। অভিযুক্তদের পক্ষের বক্তব্যও শুনেছেন। সামাজিক ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপটেও বিচার করে দেখেছেন। তারপর নিজেদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে উপন্যাসটির মূল্যায়ন করেছেন। সিদ্ধান্তে এসেছেন—আইনের চোখে বইটি নিশ্চয়ই অশ্লীল। এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোনও কারণ ঘটেনি। সুতরাং অভিযুক্তদের আপিল খারিজ করে দেওয়া

হোক। ২৩ আগস্ট ১৯৮৫ শুনানি শেষ হল। রায় বেরোল ঠিক এক মাস পর ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫।

সুপ্রিম কোর্ট রায় দিলেন, প্রজাপতি উপন্যাস অশ্লীল নয়। অভিযুক্তদের অভিযোগমুক্ত করা হল।

সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি ছিল বারো বছর। প্রজাপতি ছাড়া পেতে সেদিনই দেশ পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক সাগরময় ঘোষ বললেন – বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এর আগেও বেশ কিছু বাংলা বই নিষিদ্ধ হয়েছে, বাজেয়াপ্ত হয়েছে। আবার কিছু বই ছাড়াও পেয়েছে কলকাতাতেই মামলা মোকদ্দমা করে। কিন্তু ১৭ বছর ধরে আইনের লড়াই লড়ে কোনও বাংলা উপন্যাসকে সুপ্রিম কোর্ট থেকে ছাড়িয়ে আনা, অশ্লীলতার দায়মুক্ত করে আবার প্রকাশনার ব্যবস্থা করা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আগে কখনও হয়েছে বলে আমার জানা নেই। সে হিসেবেই এ ঐতিহাসিক ঘটনা।

সুপ্রিম কোর্টের রায়

সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের রায়ে বললেন, এ উপন্যাসে মেয়েদের শরীরের বর্ণনা আছে, দৈহিক স্ল্যাং শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, বিষয় এসেছে বলেই প্রজাপতিকে অশ্লীল বলা যাবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে লেখক তাঁর উপন্যাসটি লিখেছেন শারদীয় দেশে (১৩৭৪)। সর্বশ্রেণীর সব বয়সের লোকের জন্য। লেখককে সব সময় উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের কথা ভেবেই লিখতে হবে তার কী মানে আছে? তা ছাড়া উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা দৈহিক কামনার গন্ধ পায় এরকম কিছু লেখা চলবে না—এই নীতি বলবৎ করাও ঠিক নয়। কোনও বইয়ে দৈহিক সম্পর্কের কথা থাকলেই তাকে যদি অশ্লীল বলে পরিগণিত করতে হয় এবং উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের কাছে তা পাঠযোগ্য নয় বলে বিবেচিত হয় তাহলে তো ওইসব ছেলেমেয়ে বিশুদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ছাড়া আর কিছুই পড়তে পারবে না।

ওই মন্তব্য করে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয় : এই সিদ্ধান্ত করা হচ্ছে যে কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত এবং হাইকোর্ট এই উপন্যাসটিকে অশ্লীল বলে ঠিক করেননি। ওই দুই আদালত যে মত প্রকাশ করেছেন, আমরা তার সঙ্গে একমত হতে পারছি না, বাংলা সাহিত্যের দুই খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব (বুদ্ধদেব বসু ও ডঃ নরেশ গুহ) যে সাক্ষ্য দিয়েছেন আমরা তার দ্বারাও উপকৃত হয়েছি।

বিচারপতিরা বলেন, যদিও এই সুপ্রিম কোর্টেই এর আগে দুটি মামলায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, কোনও বই অশ্লীল কিনা তা নির্ণয়ে মৌখিক সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করতে হবে না। তবে কোনও ভাষা যদি আদালতের অজানা হয় তাহলে বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। তবুও এই মামলায় বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে দুজন কীর্তিমান পুরুষ তাঁদের সাক্ষ্যে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা আমাদের মতের সঙ্গে মিলেছে। এজন্য আমরা আনন্দিত।

বিচারপতি অমরেন্দ্রনাথ সেন এবং বিচারপতি আর এস পাঠক তাঁদের ৪৬ পৃষ্ঠা রায়ের শেষ দিকে বলেছেন---আমরা যদি নিজেদের এই লেখকের জায়গায় বসাই এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করি তাহলে দেখব তিনি এখানে সমাজকে দেখেছেন তাঁর চোখে। সমাজের চতুর্দিকে যেসব সমস্যা রয়েছে সেইসব অন্যায়, অপকর্মকে লেখক নিজের মনে করে সমালোচনা করেছেন। তিনি এজন্য তাঁর নিজের মনের মতন শব্দ বেছেছেন, ঘটনা সাজিয়েছেন। তিনি মনে করেছেন তাতেই তাঁর বক্তব্য ঠিক মতো বলা হবে।

বিচারপতিরা এরপর নিজেদেরকে পাঠকের আসনে বসিয়ে উপন্যাসটির বিচার করতে চেয়েছেন। বিচারপতিরা তাঁদের রায়ে বলেছেন— আমরা যদি পাঠকের চোখ দিয়ে দেখি তাহলে কি হবে? এই পাঠকের মধ্যে সবরকম রুচি, সবরকম বয়সের ছেলেমেয়ে সবাই থাকতে পারেন। ভুললে চলবে না এই পাঠক শ্রেণীর মধ্যে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরাও আছে।

বিচারপতিরা মন্তব্য করেন, আমরা মনে করি পাঠকরা বইটি পড়ে আবেগপ্রবণ হতে পারেন। আঘাত পেতে পারেন। তাঁরা বিরক্তও হবেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় না উপন্যাসটি তাদের মনে কামনার ভাব জাগাবে, বা তাঁরা নীতিহীন হয়ে পড়বেন। জীবনেও হয়তো তাঁরা অনেকেই এরকম ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন। বা হবেন। এসব ঘটনার কথা মনে রেখে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে উপন্যাসটি পড়ে আমরা একথা বলতে পারছি না যে, কিছু স্ল্যাং ও প্রথাবহির্ভূত শব্দের ব্যবহার, দৈহিক সম্পর্কের উপর জোর দেওয়া বা নারী দেহের বর্ণনার জন্যই উপন্যাসটি অশ্লীল।

বিচারপতিরা এও বলেছেন, উপন্যাসটির কোনও কোনও অংশ অশালীন মনে হতে পারে, রুচিমান পাঠক তাতে বীতশ্রদ্ধও হতে পারেন। কোনও কোনও জায়গার ভাষার ব্যবহারও সুরুচির পরিচয় দেয় না। অভিজ্ঞ এবং পরিনতবুদ্ধির পাঠকের কাছে এগুলি বিরক্তিকর কুরুচির পরিচায়ক হলেও এই উপন্যাস বা তার ওইসব অংশ উঠতি বয়সের ছেলেদের উচ্ছন্নে দেবে এ সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারছি না।

বিচারপতিরা তাঁদের রায়ে বলেছেন, মনে রাখতে হবে শারদীয় দেশ একটি অতি জনপ্রিয় পত্রিকা। ভারতের সর্বত্র সব বয়সের বাঙালী পাঠক-পাঠিকা এই পত্রিকা পড়েন। উপন্যাসটি (প্রজাপতি) সেই দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত। এই উপন্যাস নিশ্চয়ই উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা পড়বে। পড়বেন বয়স্করাও। আমরাও পড়েছি। খুব ভালভাবে খোলা মন নিয়েই পড়েছি। পড়ে এ উপন্যাস যে অশ্লীল সে বিষয়ে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারিনি। চুম্বন বা নারী দেহের বর্ণনা বা দৈহিক মিলনের ইঙ্গিত কাউকে কামার্ত করবে বলে আমরা মনে করি না। সুতরাং আইনত এই অপরাধে উপন্যাসটি অপরাধী নয়। তাই অশ্লীলও নয়।

এ কথা অবশ্য সত্য যে উপন্যাসটিতে প্রত্যক্ষ দৈহিক মিলনের বর্ণনা নেই কিন্তু তা আভাসে আছে। সমাজের নানা স্তরের মানুষের নানা কাহিনীতে এসব ঘটনা এমনভাবে বলা হয়েছে যে তাতে বইটিতে দৈহিক সম্পর্কের দিকটির উপর বেশ জোরই দেওয়া হয়েছে। দৈহিক মিলনের কথা বলতে গিয়ে লেখক যেসব স্ল্যাং ও কুরুচিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করেছেন তা যে বিরক্তি উৎপাদন করবে তাও অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু সেজন্যই কোনও বই অশ্লীল হয়ে যায় না।

বিচারপতিরা তাঁদের রায়ে আরও বলেছেন, দেখা যাচ্ছে সুখেনের স্ল্যাং শব্দগুলি এর আগে দুই আদালতকে খুব প্রভাবিত করেছে। তাঁদের মন্তব্য থেকে মনে হচ্ছে তাঁরা অশালীন ও অশ্লীলতার মধ্যে ভেদরেখা টানতে পারেননি। অশালীন বা কুরুচিপূর্ণ হলেই কোনও লেখা অশ্লীল হয়ে যায় না। এখানে দেখা যাচ্ছে, সুখেন শিখা এসব চরিত্র শুধুই লেখকের কল্পনাপ্রসূত নয়। প্রায়ই আমরা এরকম চরিত্রের সংস্পর্শে আসি। এই শক্তিশালী ঔপন্যাসিক তাঁর লেখার মাধ্যমে এসব চরিত্রকেই বাস্তবসম্মত করে ফুটিয়ে তুলেছেন। সেজন্যই সুখেন তার নিজের ভাষায় কথা বলেছে। এখানে আসল জোরটা হল সমসাময়িক সামাজিক সমস্যার উপর।

সুখেন কে? যার বাবা এক অর্থলোভী মানুষ। যাঁর নীতির বালাই নেই—একমাত্র টাকা রোজগারই যাঁর ধ্যান-জ্ঞান। সুখেনের মা সুন্দরী। কিন্তু তিনিও স্বামীর বন্ধুদের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করতে, তাদের দেহ দিতেও পিছপা হন না। সুখেনের দুই দাদা এমন চরিত্রের লোক, যারা একদিকে রাজনীতি করে টাকা কামায়, অন্যদিকে ঝিয়ের মেয়ে বা পার্টির মেয়ে ও পরস্ত্রী সংসর্গ করে বেড়ায়। এই পারিবারিক সম্পর্ক আজকের সমাজের অঙ্গ। এহেন স্নেহ-ভালবাসাহীন বাড়িতে তবুও সুখেন তার মাকে ভালবেসেছিল। মার মৃত্যুতে সে সম্পূর্ণই আওড়া হয়ে যায়। রূঢ় নিষ্ঠুর এক মস্তান সুখেন। কলেজের রাজনীতিতে অনশন করতে গিয়ে শিখার সংস্পর্শে আসে। শিখার কাছে সে আসে কিন্তু কলেজের ওই রাজনীতি তাকে প্রভাবিত করে না।

শিখার ঘরে প্রজাপতি মারা দিয়ে উপন্যাসের শুরু। শিখা বিছানায় শুয়ে হাতে আহত প্রজাপতিটি ধরে তার বিচ্ছিন্ন ডানা লাগানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে। আর সুখেন দেখছে শিখার পরনে শুধুই একটি ঢিলেঢালা ব্লাউজ। তার নিচে কিছুই নেই। এবং তার শরীরের অনেকটাই দেখা যাচ্ছে। এখানে সুখেনের জবানীতে শিখার দেহের বর্ণনা আছে।

আহত প্রজাপতিকে দেখেই সুখেনের মনে পড়েছে ১৪ বছরের তার থেকে বয়সে অনেক বড় কাকু সম্পর্কের লোকেরা কথা। যে জিনার শরীরটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। যাকে ওদের হাত থেকে উদ্ধার করে সুখেন টেনে নিয়ে গিয়েছিল এক নির্জন আখ ক্ষেতে। এবং সেখানে তাদের মধ্যে কিছু ঘটেছিল।—এই জায়গাটিকেই খুব বেশি অশ্লীল বলে সোরগোল তোলা হয়েছে।

সুখেনের শিখাকে চুম্বন করা বা বন্ধুর বোন মঞ্জুরীর সঙ্গে শুতে যাওয়া কিম্বা সুখেনের মেজদার ঝিয়ের মেয়ের ব্যাপার-স্যাপারও অত্যন্ত অশ্লীল—এ অভিযোগ আবেদনকারীরা এনেছেন।

আমরা উপন্যাসটি খুব যত্নের সঙ্গে পড়ে এসব জায়গায় অশ্লীলতা পাইনি, পেয়েছি সমাজ চেতনা। সমাজকে যথাযথ তুলে ধরা ও তার আসল রূপটিকে উদঘাটিত করার

প্রয়াস। যেহেতু গোটা উপন্যাসটিকেই আনা হয়েছে নায়ক সুখেনের স্বগতোক্তির মাধ্যমে তাই তার ভাষাই (রকবাজদের ভাষা) ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে সুখেনের মধ্য দিয়ে এমন একটি চিত্র ফুটে উঠেছে যা আজ সমাজে বহু পরিবারে দেখা যাবে।

ওইভাবে প্রজাপতি উপন্যাসকে বিশ্লেষণ করে বিচারপতিরা বুদ্ধদেব বসুর সাক্ষ্যের অনেকাংশই রায়ে উদ্ধৃত করেছেন। বিচারপতিরা বলেছেন, এই সাক্ষী (বুদ্ধদেববাবু)কে দীর্ঘ জেরা করা হয়। এই বই অশ্লীল কি না জানতে চাইলে সাক্ষী বলেন—না, অশ্লীল নয়।

বিচারপতি সেন এবং বিচারপতি পাঠক তাঁদের রায়ে এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর একটি উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল প্রজাপতি উপন্যাসের কোনও নৈতিক দিক আছে কিনা, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আমার মতে এর খুব বড় রকমের নৈতিক ও সামাজিক মূল্য আছে।"

বুদ্ধদেব বসু ও ডঃ নরেশ গুহর সাক্ষ্য সম্পর্কেই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা তাঁদের রায়ের শেষ দিকে ৪৫ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করেছেন : বাংলা সাহিত্যের দুই দিকপালের অভিমতের সঙ্গে তাঁদের নিজেদের সিদ্ধান্তও যে একরকম তাতে তাঁরা সন্তুষ্ট। বিশেষজ্ঞদের সাক্ষ্য প্রসঙ্গে বিচারপতিরা আরও বলেছেন—আদালত নিজের প্রয়োজনে ইচ্ছা করলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত চাইতে পারেন।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে আরও বলা হয়েছে, কোনও বই অশ্লীল কিনা তা বিচার করতে বসে আদালত নিশ্চয়ই বইটির বস্তুনিষ্ঠ বিচার করবেন। বিচারকের নিজের মনের ভাব অথবা তার আলোকে অশ্লীলতার বিচার করতে বসবেন না। যে বই অশ্লীল বলে অভিযুক্ত তার সমস্ত গল্প, চরিত্র সব কিছুকে বস্তুনিষ্ঠ হয়ে বিচার করে দেখতে হবে যে, তাতে অশ্লীল বিষয়ই প্রধান হয়ে উঠেছে কিনা? রচনার যে অংশ অশ্লীল বলে অভিযোগ আসবে সেগুলিকেও পরীক্ষা করতে হবে ঠিক একই বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে। এখানে বিচারকের নিজের মনের মানসিক গঠনের কোনও ভূমিকা নেই। থাকা উচিত নয়। যদিও এভাবে খোলা মন নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ বিচারেই আদালতের অশ্লীলতার পরীক্ষা হওয়া উচিত কিন্তু তবু বিচারকের মানসিক গঠন সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া যায় না। বিচারকের অজান্তেও তাঁর নিজের মানসিক গঠন একটা ছাপ ফেলতে পারে। খুব রক্ষণশীল মনের একজন বিচারকের কাছে যে বই অশ্লীল বলে গণ্য হল, তাই হয়ত আর একজন খুব আধুনিকমনা বিচারক অশ্লীল মনে করলেন না।

বিচারপতিরা এরপর মন্তব্য করেন, বিচারকদের একবার পাঠকের দৃষ্টিতে আর একবার লেখকের দৃষ্টিতে বইটিকে বিচার করতে হবে। কিন্তু যত নিরপেক্ষ এবং বস্তুনিষ্ঠ হবার চেষ্টাই তাঁরা করুক না কেন, কখন যে অজান্তে মনের অবচেতন মন তাঁদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে তা তাঁরা বুঝতেই পারবেন না। এজন্যই সব দিক দেখে বিচারপতিরা অভিমত দিচ্ছেন : এই ভুলের সম্ভাবনা এড়াতে বিশেষজ্ঞের দরকার। বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের মতামত থেকে যাচাই সাক্ষ্য নেওয়া হবে যে আদালত কোনও লেখা সম্পর্কে যে ধারণা করতে যাচ্ছেন তা সঠিক না। অন্যভাবে বলা যায় বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের অভিমত আদালতের নিজস্ব মতামত গঠনে সহায়ক হতে পারে।

বিচারপতিরা বলেন, অশ্লীলতার কোনও সংজ্ঞা আজও দেওয়া হয়নি। অসুবিধাটা এখানেই। রণজিৎ ডি উদ্দেশী বনাম মহারাষ্ট্র সরকার মামলায় অশ্লীলতা রোধের জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির যে ২৯২ ধারা আছে তার সাংবিধানিক বৈধতাকেই চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট তা নাকচ করে দিয়ে এই আইনকে বৈধ ঘোষণা করেছে।

অশ্লীল তাহলে কী? এটি একটি বড় প্রশ্ন। অশ্লীলতা কাকে বলা হবে—সুপ্রিম কোর্ট তারও একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে।

বিচারপতিরা বলেছেন, ভারতীয় দণ্ডবিধিতে অশ্লীলতা কথাটা ব্রিটিশ আইন থেকে ধার করা হয়েছে। ইংলন্ডেও সাধারণ আইনে অশ্লীলতার বিচার শুরু হয় তিন'শ বছর আগে। যখন স্যার চার্লস সিডলি এক পানশালার ব্যালকনিতে সকলের চোখের সামনে নিজেকে খোলাখুলি দেখিয়েছিলেন। ১৭০৮ সালের আগে পর্যন্ত বইপত্তরে অশ্লীলতার বিচার হত

ধর্মীয় আদালতে। ১৭০৮ সালে রানী বনাম রীড কেস হল। তারপর ১৭১৭ সালে ইংলণ্ডে প্রথম সিদ্ধান্ত হল যে, অশ্লীলতার বিচার সাধারণ আদালতে হবে, ধর্মীয় আদালতে নয়। এরপর ১৮৬৮ সনে বিখ্যাত হিকলিনস মামলায় অশ্লীলতার যে ব্যাখ্যা এবং অশ্লীল বই বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ করার যে বিধান রচিত হল, ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ধারা মোটামুটি তারই আদলে রচিত।

তারপর থেকে ভারতের সুপ্রিম কোর্টও এ সম্পর্কে বহু সিদ্ধান্তে এসেছে। কিন্তু অশ্লীলতার বিচারের মাপকাঠি হিসাবে হিকলিনস মামলায় নির্ধারিত নিয়ম এখনও বাতিল করা হয়নি। তাতে জোর দেওয়া হয়েছে— কোনও রচনা যদি সহজ অনুভূতিপ্রবণ মনকে কলুষিত করে ও নৈতিক অধঃপাতে নিয়ে যায় তবে তাকে অশ্লীল বলতে হবে।

সুপ্রিম কোর্ট ওই আলোকেই প্রতিটি অশ্লীলতার মামলাকে নিজস্ব পারিপার্শ্বিকে বিচার করবে। অবশ্যই এই বিচারের সময় মনোভাবটি ইংলন্ডের সেই মহিলার মতো হলে চলবে না। যিনি ডঃ জনসনকে তাঁর ডিকশনারিতে অশ্লীল শব্দ বসানো হয়েছে বলে চার্জ করেছিলেন। ডঃ জনসন তাঁকে ভর্ৎসনা করে বলেন—'ম্যাডাম, আপনি নিশ্চয়ই ওগুলিই খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন, অশ্লীলতার বিচারের সময় এ ধরনের মনোভাব নিলে আদালতগুলি সেন্সর বোর্ড হয়ে উঠবে। অবশ্যই আদালতগুলির তা হয়ে ওঠা উচিত নয়। তবে সামাজিক মঙ্গলের দিকটিও তাঁরা মনে রাখবেন।

এই প্রসঙ্গে লেডি চ্যাটার্লিজ লাভারের কথা এনে সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন, এ উপন্যাসটি অশ্লীল কিনা তা বিচারের জন্য এই আদালতে এসেছিল। সুপ্রিম কোর্ট বইটিকে অশ্লীল বলে ঘোষণা করে। সুপ্রিম কোর্ট বলে—এই বইয়ে যদি সমাজের প্রতি কোনও বক্তব্য থাকত তাহলে আপত্তির কোনও কারণ ছিল না। দৈহিক মিলনের বাস্তবতার পক্ষে সব কিছু বলার পরও দেখা যাচ্ছে লেডি চ্যাটার্লিজ লাভারের বহু অংশ এবং গোটা বই সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। যেহেতু এই বইয়ে আমাদের সমাজের মঙ্গলের দিকটি প্রাধান্য পায়নি সুতরাং এই বই অশ্লীলতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না। লেডি চ্যাটার্লিজ লাভারকে সেজন্যই অশ্লীল বলা হয়।

বিচারপতিরা এভাবে দেশবিদেশের বিভিন্ন উপন্যাসের কথা আলোচনা করে বলেছেন, ইংলন্ডে কেন্দ্রীয় ফৌজদারি আদালত লেডি চ্যাটার্লিজ লাভারকে অশ্লীল ঘোষণা করেনি। সেখানে জুরীর বিচার। ভারতে সুপ্রিম কোর্ট ওই বইকে অশ্লীল ঘোষণা করেছে। এভাবেই প্রতি দেশের পারিপার্শ্বিকে অশ্লীলতার মূল প্রশ্নটিকে বিচার করতে হবে।

বিচারপতিরা তাঁদের রায়ে বললেন : ওই দিকে লক্ষ্য রেখেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ধারা বলবৎ হয়েছে। এই আইনে বিচারের মাপকাঠি কী হবে তাও আগেই বলা হয়েছে। প্রয়োজনে বিচারকরা নিজেদের জন্য সন্তুষ্টির জন্য বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের সাক্ষ্য এবং অভিমতও নেবেন। অভিযুক্ত রচনাটিকে দেখবেন সামগ্রিক দৃষ্টিতে। দেখতে হবে আলোচ্য উপন্যাসটির কোনও সাহিত্যিক ও সামাজিক মূল্য আছে কি না? প্রজাপতি উপন্যাসের ক্ষেত্রে এসব প্রশ্ন সঠিকভাবে বিবেচিত হয়নি। তাই তাঁরা আপিল মঞ্জুর করলেন। প্রজাপতি উপন্যাসকে অশ্লীলতার দায় থেকে মুক্তি দিলেন। আদেশ দিলেন, অভিযুক্তরা যদি ইতিমধ্যেই জরিমানার টাকা জমা দিয়ে থাকেন তবে তা ফেরত দেওয়া হোক। অভিযুক্তদেরও অশ্লীলতার দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল।

শেষ হল সাহিত্যের বিচার সভা। দায়মুক্ত হলেন দেশ পত্রিকার প্রকাশক ও মুদ্রাকর সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত। সাহিত্যিক সমরেশ বসু। ১৭ বছর পর মুক্তি পেল তাঁর প্রজাপতি।

প্রজাপতি মামলার ইতিবৃত্তর নানা তথ্য সংগ্রহে

সাহায্য করেছেন বিজিৎকুমার বসু।